কবীরা গুনাহ

ইমাম আয্‌যাহাবী

কবীরা গুনাহ

ইমাম আয্‌যাহাবী

কবীরা গুনাহ

ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন উসমান আয্‌যাহাবী (র)

অনুবাদ

হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক এম.এ.

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-31-0608-3

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৬
বিংশতি প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৩৪
আশ্বিন ১৪২০
সেপ্টেম্বর ২০১৩

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : পঁচাশি টাকা

Kabeera Gunah Written by Imam Adh-Dahabi Translated by Akram Farooque Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition July 1996 20th Edition September 2013 Price Taka 85.00 only.

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহর প্রতি অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আমাকে ইমাম যাহাবীর এই অমূল্য গ্রন্থ "কিতাবুল কাবায়ের"— এর অনুবাদ করার তৌফিক দান করেছেন। এই সাথে এই গ্রন্থটিকে পর্যায়ক্রমে মাসিক পৃথিবীতে প্রকাশ করা ও অবশেষে পুস্তক আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

কিতাবুল কাবায়ের গ্রন্থের অনুবাদ সরাসরি মূল আরবী গ্রন্থ থেকেই করা হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের যদি এ গ্রন্থ দ্বারা কিছুমাত্র উপকার হয়, তবে এর কল্যাণে মহান আল্লাহ্ অধমের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিন— দয়াময় আল্লাহর দরবারে এটাই আমার আন্তরিক দোয়া।

"কবীরা গুনাহ" আল্লামা যাহাবীর কিতাবুল কাবায়ের গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ হলেও এতে সামান্য কিছু সম্পাদনার কাজ এই সাথেই করতে হয়েছে। যেমন, একই হাদীস ও আয়াতের বারবার পুনরাবৃত্তি অনুবাদে এড়িয়ে যাওয়া, কোন বুযুর্গ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও স্বপ্ন দেখাজনিত ঘটনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাদ দেয়া, লেখকের সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত উপদেশমূলক গদ্য ও পদ্য কোথাও সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা এবং কোথাও নিষ্প্রয়োজন মনে হওয়ায় বাদ দেয়া, পর্যাপ্ত আয়াত ও সহীহ হাদীস প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত হওয়ায় দুর্বল হাদীসকে ও মনীষীদের বক্তব্যকে বাদ দেয়া এবং দু'একটি ক্ষেত্রে মূল বিবরণের সাথে সংগতি রেখে শিরোনাম পাল্টানো ইত্যাদি।

এই সামান্য সম্পাদনার কাজটুকু করা হয়েছে দুইটি উদ্দেশ্যে; প্রথমতঃ বাংলাভাষী পাঠককে নিষ্প্রয়োজন দীর্ঘ বিবরণ পাঠের ঝামেলা থেকে মুক্তি দেয়া, দ্বিতীয়তঃ পুস্তকের কলেবর যাতে আকারে বৃদ্ধি না পায় তা নিশ্চিত করা।

আশা করি, পুস্তকখানি সকল মহলে সমাদৃত হবে এবং সমাজের ইসলামী ও নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

আকরাম ফারুক,
ঢাকা
১-১১-১৯৯৫

গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন কাইমায তুর্কমেনী, ফারেকী, দামেস্কী আযযাহাবী ৬৭৩ হিঃ মুতাবিক ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান তুর্কমেনিস্তানের 'মিয়াফারেকীন'। তিনি সিরিয়া, মিসর ও হেজাজের বড় বড় মুসলিম মনীষীদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও এ উদ্দেশ্যে বহু দেশ সফর করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখায় বিশেষত আল কুরআন ও আল হাদীস সংক্রান্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। হাদীসের হাফেয হিসাবে তিনি কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হলেও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার ও পরখের দক্ষতা তাঁর পান্ডিত্য ও মনীষাকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করায়। তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ৯০টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো হাদীস, ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থ "তারীখুল ইসলাম" (ইসলামের ইতিহাস) ছাড়াও "সিয়ারুন্‌নুবালা" (মুসলিম বিদ্বানদের জীবনী) এবং হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি পরখ সংক্রান্ত তিনখানা গ্রন্থ "মীযানুল ইতিদাল", "আল মুশতাবাহ ফী আসমায়ির রিজাল" এবং "তাজরীদুল উসুল ফী আহাদীমির রাসূল" সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাছাড়া ১৩০০ মনীষীর নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত তাঁর এক বিশাল বিশ্বকোষও রয়েছে। এসব মনীষীর মধ্যে অনেকে তাঁর শিষ্য কিংবা উস্তাদ।

তাঁর "কিতাবুল কাবায়ের" শীর্ষক গ্রন্থখানি ৭০টি কবীরা গুনাহর বিবরণ সম্বলিত। সাধারণ মুসলমানগণকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এটি লিখিত।

ইমাম যাহাবী দামেস্কে একাধিক শিক্ষা বিভাগীয় সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন এবং চাকুরীর পাশাপাশি তিনি ঐসব গ্রন্থ রচনা করেন। ৭৪১ হিজরীতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ায় লেখার কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও ৭৪৮ হিঃ মুতাবিক ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করার সময় পর্যন্ত শিক্ষকতা অব্যাহত রাখেন। দামেস্কেই তাঁর কবর রয়েছে।

কবীরা গুনাহ্ কী?

আল্লাহর কিতাব, রাসূলের (সা) সুন্নাহ ও অতীতের পুণ্যবান মনীষীদের বর্ণনা থেকে যেসব জিনিস আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায়। সেগুলিই কবীরা (বড়) গুনাহ। কবীরা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকলে সগীরা (ছোট) গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে বলে আল্লাহ্ কুরআনে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা যদি বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে আমি তোমাদের (অন্যান্য) গুনাহ্ মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।" (সূরা আন্ নিসা)

আল্লাহ্ তায়ালা এই অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দ্বারা কবীরা বা বড় বড় গুনাহ্ থেকে যারা সংযত থাকে তাদের জন্য স্পষ্টতই জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

সূরা আশ্ শূরাতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আর সেই সব ব্যক্তি, যারা বড় বড় গুনাহ্ ও অশ্লীল কাজ থেকে সংযত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে।" এবং সূরা আন নাজমে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আর যারা বড় বড় গুনাহ্ ও অশ্লীল কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা খুবই প্রশস্ত। অবশ্য ছোটখাটো গুনাহর কথা আলাদা।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রতিদিন পাঁচবার নামায, জুময়ার নামায পরবর্তী জুময়া না আসা পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহ্ সমূহের ক্ষমার নিশ্চয়তা দেয়- যদি 'কবীরা গুনাহ' সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।"

এই কয়টি আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য কবীরা গুনাহসমূহ কি কি তা অনুসন্ধান করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমরা আলেম সমাজের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখতে পাই। কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ সাতটি। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা সাতটি সর্বনাশা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকো। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়াতের বিধিসম্মতভাবে ছাড়া কোন অবৈধ হত্যাকান্ড ঘটানো, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো, এবং সরলমতি সতীসাধ্বী মুমিন মহিলাদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ। (সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এর সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি।

হাদীসে কবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়না। তবে এতটুকু বুঝা যায় এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত বড় বড় গুনাহের জন্য দুনিয়ায় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমন হত্যা, চুরি, ও ব্যভিচার, কিংবা আখিরাতে ভীষণ আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে অথবা রাসূলের (সা) ভাষায় সেই অপরাধ সংঘটককে অভিসম্পাত করা হয়েছে, অথবা সেই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান নেই, বা সে মুসলিম উম্মাহর ভেতরে গণ্য নয়- এরূপ বলা হয়েছে সেগুলি কবীরা গুনাহ।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলেছিল ঃ কবীরা গুনাহ তো সাতটি। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ বরঞ্চ সাতশোটির কাছাকাছি। তবে ক্ষমা চাইলে ও তওবা করলে কোন কবীরা গুনাহই কবীরা থাকেনা। অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়। আর ক্রমাগত করতে থাকলে সগীরা গুনাহও সগীরা থাকেনা, বরং কবীরা হয়ে যায়। অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ প্রায় ৭০টি। অধিকাংশ আলেম গণনা করে ৭০টিই পেয়েছেন বা তার সামান্য কিছু বেশী পেয়েছেন।

এ কথাও সত্য যে, কবীরা গুনাহর ভেতরেও তারতম্য আছে। একটি অপরটির চেয়ে গুরুতর বা হালকা আছে। যেমন শিরককেও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। অথচ এই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চির জাহান্নামী এবং তার গুনাহ অমার্জনীয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা আন নিসায় বলেছেন ঃ "আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। এর নিচে যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন।" অবশ্য শিরক পরিত্যাগ করলে ভিন্ন কথা। [নিম্নে ৭০টি কবীরা গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।]

১. শিরক

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। এই শিরক দুই প্রকারের ঃ (১) আকীদাগত শিরক ঃ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এবং তার ইবাদাত করা। গাছ, পাথর, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ফিরিশতা, নবী, ওলী ইত্যাদি যাই হোক না কেন, তাকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা ও তার ইবাদাত করা শিরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে কাউকে শরীক করার গুনাহ মাফ করেন না। এর চেয়ে ছোট যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন।" (সূরা আন নিসা)

"নিশ্চয় শিরক একটা বিরাট জুলুম।" (সূরা লুকমান)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে, আল্লাহ্ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" (সূরা আল মায়েদা)

এ বিষয়ে আরো বহু আয়াত রয়েছে।

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে বা কোন বস্তুকে শরীক করবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে নির্ঘাত জাহান্নামে যাবে। যেমন কেউ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলে এবং ঈমানদার অবস্থায় মারা গেলে জান্নাতবাসী হবে, চাই সে জাহান্নামে যতই আযাব ভোগ করুক না কেন। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) একদিন তিনবার বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবোনা? সবাই বললো ঃ "জ্বি হাঁ, হে রসূল"! তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়া। অতঃপর তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন ঃ "মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া থেকে সাবধান!" এই শেষোক্ত কথাটা তিনি এতবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন যে, হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা মনে মনে বলছিলাম, রাসূল (সা) যদি চুপ করতেন তবে ভালো হতো।

বুখারী ও আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক ও সর্বনাশা গুনাহ থেকে বিরত থাক। অতঃপর শিরকের উল্লেখ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে (অর্থাৎ ইসলামকে ত্যাগ করে) তাকে হত্যা কর।"

দ্বিতীয় প্রকারের শিরক হচ্ছে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা। আল্লাহ বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে তার সৎ কাজ করা উচিত এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদাতে আর কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" অর্থাৎ নিজের সৎ কাজ কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করা উচিত নয়। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ছোট শিরক থেকে দূরে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন; ছোট শিরক কী? তিনি বললেন ঃ রিয়া অর্থাৎ লোক দেখিয়ে সৎ কাজ করা। যেদিন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কর্মফল দেবেন সেদিন তাদেরকে বলবেন, যাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে দুনিয়ায় তোমরা নেক আমল করতে, তাদের কাছে চলে যাও। দেখ, তারা তোমাদেরকে কোন প্রতিদান দেয় কিনা।" (আহমাদ, বায়হাকী, তাবরানী)

অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাজ করে এবং তাতে আমি ব্যতীত অন্য কাউকে শরীক করে, তার কাজ

যাকে শরীক করেছে তার। সে কাজের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" (মুসলিম, ইবনে মাজাহ) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে শুনায়, আল্লাহও তার বেলায় মানুষকে শুনান, আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখায়, আল্লাহও তার সাথে লোক দেখানো আচরণ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম) রাসূল (সা) বলেন, "অনেক রোযাদার এমন আছে, যার রোযা থেকে ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয়না। আর অনেক রাত জেগে নামায পড়া লোক আছে, যাদের রাত জাগাই সার হয়।" অর্থাৎ নামায ও রোযা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না করা হলে তার কোন সওয়াব হবেনা। (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবরানী) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ "তাদের কৃতকর্মের কাছে আমি উপস্থিত হব এবং তাকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণা বানিয়ে দেব।" অর্থাৎ আল্লাহর সন্তোষ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মানুষ যে কাজ করবে, আল্লাহ তার সওয়াব নষ্ট করে দেবেন।

আদী বিন হাতেম বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কিছু সংখ্যক লোককে কেয়ামতের দিন জান্নাতে পাঠানোর আদেশ দেয়া হবে। তারা যখন জান্নাতের খুব কাছাকাছি চলে যাবে, তার ঘ্রাণও পাবে, এবং তার ভেতরের প্রাসাদগুলো ও অন্যান্য অনুপম নিয়ামতগুলো দেখবে, তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে যে, "ওদেরকে ওখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা জান্নাতের ঐ সব নিয়ামতে ওদের কোন অধিকার নেই।" অতপর তারা চরম হতাশা ও অনুশোচনা নিয়ে ফিরে যাবে। তারপর তারা বলবে ঃ "হে আল্লাহ! তোমার প্রিয়জনদের জন্য যে নিয়ামত নির্দিষ্ট করে রেখেছ, তা দেখানোর আগে যদি আমাদেরকে জাহান্নামে পাঠাতে, তাহলে তা আমাদের জন্য অনেকটা সহজ হতো।" আল্লাহ বলবেন ঃ "আমি তোমাদের সাথে এই আচরণই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম। তোমরা যখন একাকী থাকতে, আমার প্রতি চরম অবাধ্যতার আচরণ করতে। আর যখন মানুষের সাথে মেলামেশা করতে, তখন তাদের সাথে খোদাভীরু লোকদের মত আচরণ করতে। নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মানুষের কাছে যে মানসিকতা তোমরা প্রকাশ করতে, আমার প্রতি তোমরা আন্তরিকতার সাথে সেই মানসিকতা পোষণ করতেনা। তোমরা মানুষকে ভয় করতে, আমাকে ভয় করতেনা। তোমরা মানুষকে গুরুত্ব দিতে, আমাকে গুরুত্ব দিতেনা। মানুষের জন্য তোমরা ত্যাগ স্বীকার করতে, আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেনা। তাই আজ আমি তোমাদেরকে আমার অগাধ প্রতিদান থেকে বঞ্চিতও করবো, আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও দেবো।"

অপর এক হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে,

মুক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে! তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে যদি ধোকা না দাও তাহলে মুক্তি পাবে। লোকটি বললো ঃ আল্লাহকে ধোকা দেয়ার অর্থ কী? তিনি বললেন ঃ যে কাজ তোমাকে আল্লাহ ও তার রাসূল করতে বলেছেন, সে কাজ যদি তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করার জন্য কর, তাহলে সেটাই হবে আল্লাহকে ধোকা দেয়ার শামিল। রাসূল (সা) আরো বললেন ঃ তুমি রিয়াকারী (লোক দেখানো কাজ) থেকে বিরত থাক। কেননা রিয়া হচ্ছে ছোট শিরক। যে ব্যক্তি রিয়াকারীতে লিপ্ত থাকবে, কিয়ামতের দিন সমবেত জনতার সামনে তাকে চারটে বিশেষণে ভূষিত করে ডাকা হবে, যথা ঃ হে রিয়াকার, হে বিশ্বাসঘাতক, হে অবাধ্য, হে ক্ষতিগ্রস্ত! তোমার আমল বাতিল হয়ে গেছে, তোমার প্রতিদান নষ্ট হয়ে গেছে, আমার কাছে তোমার কোন পারিশ্রমিক পাওনা নেই। হে ধোকাবাজ, তুমি যার জন্য কাজ করেছ তার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নাও গে।"

কথিত আছে যে, জনৈক মুসলিম মনীষীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা (ইখলাস) কাকে বলে? তিনি জবাব দিলেন ঃ মানুষ নিজের পাপ কাজকে যেমন লুকায়, তেমনি তার ভালো কাজকেও লুকাবে। এটাই নিষ্ঠা বা ইখলাস। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইখলাস বা আন্তরিকতার উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন ঃ লোকে তোমার প্রশংসা করুক- এটা কামনা না করা। হযরত ফযীল বিন ইয়ায বলেন ঃ লোকের ভয়ে খারাপ কাজ ত্যাগ করা রিয়াকারী, আর মানুষকে খুশী করার জন্য ভালো কাজ করা শিরক। আর ইখলাস হচ্ছে এই উভয় রোগ থেকে মুক্ত থাকার নাম।

২. হত্যা বা খুন করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার পরিণাম জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হন, অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়ংকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আন নিসা) "আর যারা বৈধ কারণ ছাড়া আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ প্রাণকে হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা, (তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা) আর যারা ওসব অপকর্ম করে তারা হয় মহাপাপী। তার জন্য আযাব দ্বিগুণ করা হবে এবং সে অপমানিত হয়ে সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করে ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তার কথা ভিন্ন।" সূরা আল মায়েদায় একটি হত্যাকান্ডকে গোটা মানব জাতির হত্যার শামিল বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ "এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলকে লিখে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন হত্যার বিনিময়ে ছাড়া কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করলো

আর যে একটা প্রাণকে বাঁচালো সে যেন গোটা মানবজাতিকে বাঁচালো।"

হাদীসে হত্যা ও হত্যার ইচ্ছাকেও সমান অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে, তখন হন্তা ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হত্যাকারীর কথা তো বুঝলাম। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কি? রাসূল (স) বললেন ঃ সে তার প্রতিপক্ষকে খুন করতে চেয়েছিল।" (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)

ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, কোন অবৈধ স্বার্থ, শত্রুতা বা বিদ্বেষবশতঃ পরস্পরে সংঘর্ষ হলেই এ হাদীস প্রযোজ্য। নচেত আত্মরক্ষা ও বৈধ ধনসম্পদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করলে এ হাদীস প্রযোজ্য হবেনা। কেননা আত্মরক্ষাকারীর উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে খুন করা হয়না বরং আক্রমণ প্রতিহত করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আক্রমণকারীকে হত্যা না করে যদি আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় তবে সেটা করাই শ্রেয়।

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ আমার পরে তোমরা পরস্পরকে হত্যাকারী কাফেরদের মত হয়ে যেওনা। তিনি আরো বলেছেন ঃ অবৈধ হত্যাকান্ড না ঘটানো পর্যন্ত বান্দার আর সকল গুনাহ্ মাফ হওয়ার অবকাশ থাকে। তিনি আরো বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সবার আগে হত্যার বিচার হবে। তিনি আরো বলেছেন ঃ আমার নিকট কোন মুমিনের হত্যাকান্ড সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ঘটনা। এক হাদীসে আল্লাহর সাথে শরীক করা, নরহত্যা ও মিথ্যা শপথ করাকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ বলা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে যত অন্যায় হত্যাকান্ড হবে, আদম (আ) এর প্রথম পুত্র তার অংশ পাবে। কারণ সে-ই সর্বপ্রথম এই অপরাধের প্রচলন করেছে। রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ কোন অমুসলিমকে হত্যাকারী জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ বেহেস্তের ঘ্রাণ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

৩. জাদু করা

জাদুর কবীরা গুনাহ হওয়ার কারণ এই যে, এ কাজ করতে হলে কাফের না হয়ে করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "শয়তানরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত।" বস্তুত: অভিশপ্ত শয়তানের মানুষকে জাদু শিক্ষা দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সথে শিরক করা। হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফিরিশতার কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তারা উভয়ে কাউকে জাদু শিক্ষা দেয়ার আগে এ কথা বলে দিত যে, আমরা

পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়োনা। তারপর তাদের কাছ থেকে লোকেরা এমন জাদু শিখতো, যা দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। অথচ তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। তারা যে জাদু শিখতো তা তাদের শুধু ক্ষতি করতো, উপকার করতোনা। আর তারা এ কথাও জানতো যে, যে ব্যক্তি জাদু আয়ত্ব করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ প্রাপ্য নেই।" (সূরা বাকারা)

এ জন্য বহু গুমরাহ্ মানুষকে জাদুর আশ্রয় নিতে দেখা যায়। কেননা তারা একে শুধু একটা হারাম কাজ মনে করে। অথচ আসলে তা যে কুফরীও তা তারা জানেনা। স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানো, বেগানা পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে প্রেম প্রণয় সৃষ্টির কাজে এমন সব মন্ত্র পড়ে জাদু করা হয়, যার বেশীর ভাগ শিরক ও কুফরীতে পরিপূর্ণ।

জাদুকরের শরীয়ত বিহিত শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। কেননা তা আল্লাহর সাথে কুফরী অথবা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। রসূল (সা) যে হাদীসে "সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ" পরিহার করতে বলেছেন, তাতে জাদুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় ক্ষতিকর এমন কাজের ধারে কাছে যাওয়া চাইনা। হাদীসে আছে ঃ "জাদুকরের শাস্তি তরবারীর আঘাতে তাকে খতম করে দেয়া।" (আল জামে আত্ তিরমিযী) বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "ইবনে আবদা বলেছেন ঃ হযরত উমরের (রা) ইন্তিকালের এক বছর আগে আমাদের কাছে এই মর্মে চিঠি আসে যে, জাদুকর স্ত্রী বা পুরুষ যে-ই হোক, তাকে হত্যা কর।" এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। যে জাদু করে, যার জন্য জাদু করা হয়, যে ভবিষ্যদ্বাণী করে, যার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, যে শুভ বা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে বা কাউকে বিশ্বাস করতে উপদেশ দেয়, তারা কেউ আমার পছন্দনীয় নয়।" হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ "তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবেনা ঃ (১) মদ্যপায়ী, (২) রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্নকারী ও (৩) জাদুতে আস্থা স্থাপনকারী।" (মুসনাদে আহমাদ) হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ তাবীজ ও ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করা শিরক। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ছাড়া এসবের কোন উপকারিতা নেই এরূপ বিশ্বাস করলে তাবীজ তুমার ও ঝাড়ফুঁকে দোষ নেই, যদি তা অনৈসলামিক ভাষায় লিখিত না হয়। ইমাম খত্তাবী বলেছেন ঃ কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম লেখা তাবীজ বৈধ। কেননা রসূল (সা) স্বয়ং হাসান ও হুসাইনকে (রা) তাবীজ লিখে দিয়েছিলেন।

৪. নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "অতঃপর (সেই সব নবীর পর) এমন উত্তরাধিকারীরা এল, যারা নামাযকে নষ্ট করলো ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা অনুসারে কাজ করলো। তারা অবশ্যই "গায়" তে পতিত হবে। তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের কথা স্বতন্ত্র।" (মারিয়াম)

হযরত ঈবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "নামাযকে নষ্ট করার অর্থ পুরোপুরি তরক করা বা বর্জন করা নয়, এর অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময়ের পরে পড়া বা কাযা করা। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন ঃ এর অর্থ পরবর্তী নামাযের সময় না এসে পড়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করা। এটা করতে যে অভ্যস্থ হয়ে যায় এবং এই অভ্যাসের ওপর তওবা না করেই মারা যায় আল্লাহ্ তাকে 'গায়" নামক স্থানে নিক্ষেপের হুমকি দিয়েছেন। এটি দোজখের অত্যন্ত নিচ ও নোংরা একটি গহ্বরের নাম।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ সেই সকল নামাযীর জন্য 'ওয়েল', যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে শিথিল। অর্থাৎ আলসেমী ও গড়িমসি করে। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বলেন ঃ আমি রসূলকে (সা) জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এই শিথিলতা কি? তিনি বললেন ঃ নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করা। তাদেরকে নামাযী বলা হয়েছে। কিন্তু উদাসীনতা ও বিলম্বের কারণে তাদেরকে "ওয়েল" এর হুমকি দেয়া হয়েছে। ওয়েল অর্থ আযাবের কঠোরতা। কারো কারো মতে ওয়েল হচ্ছে জাহান্নামের এমন উত্তপ্ত একটি জায়গা, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত পাহাড় পর্বত ফেলে দিলেও তা তীব্র দহনে গলে যাবে। তওবা ও অনুতাপসহকারে ক্ষমা না চাইলে নামায কাযাকারী ও নামাযে আলস্যকারীর জন্য এই জায়গা বাসস্থান হিসাবে নির্ধারিত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্তুতি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয়। যে ব্যক্তি তা করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" তাফসীরকারগণ বলেছেন ঃ উক্ত আয়াতে "আল্লাহর স্মরণ" দ্বারা পাঁচ ওয়াক্তের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই কেউ যদি নিজের অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত কর্মকান্ডে যথা ব্যবসায় বাণিজ্যে ও সন্তানাদি সংক্রান্ত ব্যস্ততায় সময় মত নামায না পড়ে তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রসূল (সা) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন বান্দার যে কাজ সম্পর্কে সর্বপ্রথম হিসাব নিকাশ নেয়া হবে তা হচ্ছে নামায। হিসাব দিতে সক্ষম হলে মুক্তি নচেত ব্যর্থতা অবধারিত।"

জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ "জান্নাতবাসী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ কারণে তোমরা দোজখে গেলে? তারা জবাব দেবে ঃ আমরা নামায আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,......"

রসূল (সা) বলেছেন ঃ "অমুসলিমদের ও আমাদের মাঝে যে অংগীকার, তা হচ্ছে নামায সংক্রান্ত। নামাযকে যে ত্যাগ করলো, সে কাফের।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "বান্দার ও তার কাফের হওয়ার মাঝে কেবল নামায তরকের ব্যবধান।"

সহীহ্ বুখারীতে আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "যার আসরের নামায ছুটে যায়, তার সমস্ত সৎ কাজ বৃথা হয়ে যায়।" অপর হাদীসে রসূল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, আল্লাহ্ তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত।" সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রসূল (সা) বলেন ঃ "মানুষ যতক্ষণ এক আল্লাহকে মা'বুদ হিসাবে মেনে না নেবে, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় না করবে, ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট। এ কাজগুলো যারা করবে, তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার হাত থেকে নিরাপদ। তবে ন্যায়সংগত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্ তায়ালার।" এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে উমর (রা) বলেন ঃ "নামায ত্যাগকারী ইসলামের প্রদত্ত কোন সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করতে পারবেনা।"

রসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি যথারীতি নামায আদায় করবে, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য মুক্তির ওসীলা, আলোকবর্তিকা ও যুক্তিপ্রমাণ হবে। আর যে যথারীতি নামায আদায় করবে না, তার জন্য তা আলোকবর্তিকাও হবে না, যুক্তিপ্রমাণও হবেনা, মুক্তির ওসীলাও হবেনা। অধিকন্তু সে কিয়ামতের দিন ফিরাউন, কারূন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সংগী হবে।"

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন মুসলিম মনীষী বলেছেন যে, উল্লেখিত চারজন কুখ্যাত কাফেরের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার কারণ এই যে, নামায তরকের কারণ চার রকমের হয়ে থাকে। অর্থসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততা, প্রশাসনিক ব্যস্ততা ও বাণিজ্যিক ব্যস্ততা। নামায পরিত্যাগের কারণ প্রথমটি হলে কারূনের সাথে, দ্বিতীয়টি হলে ফেরাউনের সাথে, তৃতীয়টি হলে হামানের সাথে এবং চতুর্থটি হলে মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উবাই বিন খালাফের সাথে তার হাশর হবে।

বায়হাকী কর্তৃক উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রসূল (সা) এর নিকট এসে বললো ঃ "হে রসূল! ইসলামের কোন্ কাজ আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়?

রসূল (সা) বললেন ঃ যথা সময়ে নামায পড়া। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল তার ধর্ম নেই। নামায ইসলামের খুঁটি।"

উমর (রা) যখন আততায়ীর আঘাতে আহত হলেন, তখন তাঁকে জানানো হলো যে, "হে আমীরুল মুমিনীন! নামাযের সময় উপস্থিত।" তিনি বললেন ঃ "হাঁ, আমি নামায পড়বো। নামায যে ছেড়ে দেয় ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।" অতঃপর তিনি নামায পড়লেন, তখনো তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী [যিনি রসূলকে (সা) দেখেননি, কিন্তু সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন তাকে তাবেয়ী বলা হয়] আব্দুল্লাহ বিন শাকীফ (রহ) বলেন ঃ রসূল (সা) এর সাহাবীগণ নামায ছাড়া আর কোন কাজকে ছেড়ে দিলে মানুষ কাফের হয়ে যায় বলে মনে করতেন না। আলী (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) বেনামাযীকে সুস্পষ্টভাবে যথাক্রমে কাফের ও বেদ্বীন বলেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায তরক করলেও আল্লাহর সাথে যখন সাক্ষাত হবে তিনি ক্রুদ্ধ থাকবেন।

রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বেনামাযী হয়ে আল্লাহর কাছে যাবে, তার অন্যান্য সৎ কাজকে আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। (তাবরানী) ইমাম ইবনে হাযম বলেছেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা ও অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করার পরেই সবচেয়ে বড় গুনাহর কাজ হলো নামায তরক করা। রসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ কোন বান্দা যখন প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ে তখন সেই নামায একটি আলোকরশ্মি ছুড়তে ছুড়তে আরশ পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে যে, তুমি যেমন আমাকে রক্ষা করেছ, আল্লাহ তেমন তোমাকে রক্ষা করুন! (তাবরানী)

রসূল (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না ঃ (১) যাকে জনগণ অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাদের নেতা হয়ে জেঁকে বসে, (২) যে কোন স্বাধীন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করে (৩) যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ার পর নামায পড়ে।" (আবু দাউদ) রসূল (সা) আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি বিনা ওযরে দুই নামায একত্রে পড়ে সে এক মস্ত বড় কবীরা গুনাহ করে।" (হাকেম)

আবু দাউদে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন বালকের সাত বছর বয়স হলেই তাকে নামায পড়তে আদেশ দাও। আর দশ বছর হলে তাকে সে জন্য প্রহার কর ও বিছানা আলাদা করে দাও।"

ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, প্রাপ্ত বয়স্কের নামায তরকের জন্য আরো কঠোর শাস্তি প্রযোজ্য। শাফেয়ী মাযহাবের কারো কারো মতে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরককারী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ মৃত্যুদন্ড দেয়া যাবে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদের মতে সে হত্যাযোগ্য।

ইবরাহীম নাখয়ী, আইয়ুব সাখতিয়ানী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক বিন রাহওয়েয়ের মতে বিনা ওযরে স্বেচ্ছায় নামায তরককারীকে নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর কাফের গণ্য করতে হবে।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যথারীতি আদায় করবে, আল্লাহ তাকে পাঁচটি মর্যাদা দান করবেন। প্রথমঃ তার দারিদ্র দূর করবেন, দ্বিতীয়তঃ তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন, তৃতীয়তঃ তার আমলনামা ডান হাতে দেবেন, চতুর্থতঃ বিদ্যুতবেগে তাকে পুলসিরাত পার করাবেন, পঞ্চমতঃ তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাবে, আল্লাহ তাকে ১৪টি শাস্তি দেবেন। এর মধ্যে পাঁচটি দুনিয়ার জীবনে, ৩টি মৃত্যুর সময়ে, তিনটি কবরে, এবং তিনটি কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সময়ে। দুনিয়ার পাঁচটি হলো, তার জীবন থেকে বরকত উঠে যাবে, তার মুখমন্ডল থেকে সৎ লোকসুলভ ঔজ্জ্বল্য দূর হয়ে যাবে। তার কোন নেক আমলের প্রতিদান দেয়া হবেনা।

তার কোন দোয়া কবুল হবেনা এবং নেককার লোকদের দোয়া থেকে সে বঞ্চিত হবে। আর মৃত্যুর সময়ের তিনটি শাস্তি হলো, সে অপমানিত হয়ে মারা যাবে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাবে, এত পিপাসিত অবস্থায় মারা যাবে যে, সারা দুনিয়ার সমুদ্রের পানি পান করলেও তার পিপাসা মিটবেনা। কবরে থাকাকালে যে তিনটি শাস্তি সে ভোগ করবে, তাহলো তার কবর সংকুচিত হয়ে তাকে এত জোরে পিষ্ট করবে যে, এক পাশের পাঁজরের হাড় ভেংগে অপর পার্শ্বে চলে যাবে, তার কবর এমনভাবে আগুন দিয়ে ভরে দেয়া হবে যে, রাত দিন তা জ্বলতে থাকবে, এবং তাকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি বিষধর সাপ দংশন করতে থাকবে। আর কবর থেকে বেরুবার সময় যে তিনটি শাস্তি সে ভোগ করবে তা হলো, তার হিসাব কঠিন হবে, আল্লাহকে সে ক্রুদ্ধ দেখতে পাবে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, কিয়ামতের দিন তার কপালে তিনটে কথা অংকিত থাকবে। একটি কথা হবে ঃ "হে আল্লাহর হক বিনষ্টকারী", দ্বিতীয় কথাটি হবে ঃ "হে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত ব্যক্তি"। তৃতীয় কথাটি হবে ঃ "তুমি পৃথিবীতে যেমন আল্লাহর অধিকার দাওনি, আজ তেমনি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।"

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে জাহান্নামে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে। সে জিজ্ঞাসা করবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! কি কারণে? আল্লাহ বলবেন ঃ নামায নির্ধারিত সময়ের পরে পড়া ও আমার নামে মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণে।

একবার রসূল (সা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কাউকে বঞ্চিত হতভাগা বানিওনা, তারপর উপস্থিত সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি জান বঞ্চিত হতভাগা কে? সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল? কে? তিনি বললেনঃ নামায তরককারী।

অপর এক হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের মুখ কালো হবে, তারা হলো নামায তরককারী। জাহান্নামে 'মালহাম' নামক একটা অঞ্চল আছে। সেখানে বহু সাপ থাকে। তার প্রতিটি সাপ উটের ঘাড়ের মত মোটা এবং প্রায় এক মাসের পথের সমান লম্বা। এই সাপ নামায তরককারীকে দংশন করবে। তর বিষ তার শরীরে ৭০ বছর ধরে যন্ত্রণা দিতে থাকবে অবশেষে তার গোশত খসে খসে পড়বে।

বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাইলের এক মহিলা একবার মূসার (আ) কাছে এল। সে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি একটি ভীষণ পাপের কাজ করেছি। পরে তওবাও করেছি। আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন। মূসা (আ) বললেন ঃ তুমি কী গুনাহ করেছ? সে বললো ঃ আমি ব্যভিচার করেছিলাম। অতঃপর একটি অবৈধ সন্তান প্রসব করি এবং তাকে হত্যা করে ফেলি। মূসা (আ) বললেন ঃ "হে মহাপাতকিনী! এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। আমার আশংকা, আকাশ থেকে এক্ষুণি আগুন নামবে এবং তাতে আমরা সবাই ভস্মীভূত হবো।" মহিলাটি ভগ্ন হৃদয়ে বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই জিবরীল (আ) এলেন। তিনি বললেন ঃ "হে মূসা! আল্লাহ্ আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কী কারণে এই তওবাকারিনীকে তাড়িয়ে দিলেন? তার চেয়েও কি কোন অধম মানুষকে আপনি দেখেননি?" মূসা বললেন ঃ "হে জিবরীল! এর চেয়ে পাপিষ্ঠ কে আছে!" জিবরীল (আ) বললেন ঃ "ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরককারী।"

অপর একটি ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার বোনের দাফন কাফন সম্পন্ন করে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখলো, তার মানিব্যাগটি নেই। পরে তার মনে হলো, ওটা কবরের ভেতরে পড়ে গেছে। তাই সে ফিরে গিয়ে কবর খুড়লো। দেখলো, সমস্ত কবর জুড়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সে পুনরায় মাটি চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গেল। তার মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা জানালে তিনি

বললেন, মেয়েটি নামাযের ব্যাপারে আলসেমী করতো এবং সময় গড়িয়ে গেলে নামায পড়তো। বিনা ওজরে নামায কাযা করলে যদি এরূপ পরিণতি হতে পারে, তাহলে বেনামাযীর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

শুধু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নামায পড়াই যথেষ্ট নয়, নামাযকে সুষ্ঠুভাবে ও বিশুদ্ধভাবে পড়াও জরুরী। নচেত অশুদ্ধ নামায পড়া নামায না পড়ারই সমতুল্য। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, "একদিন এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলো। রসূল (সা) তখন মসজিদেই বসে ছিলেন। লোকটি নামায পড়লো। অতঃপর রসূল (সা) এর কাছে এসে সালাম করলো। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং নামায পড়। কারণ তুমি নামায পড়নি। সে চলে গেল এবং আগের মত আবার নামায পড়ে রসূল (সা) এর কাছে এসে সালাম করলো। তিনি সালামের জবাব দিয়ে আবার বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। এরূপ তিনবার নামায পড়ার পর লোকটি বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি এর চেয়ে ভালোভাবে নামায পড়তে পারিনা। আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ প্রথমে নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর বল। অতঃপর যতটুকু পার কুরআন পাঠ কর। অতঃপর রুকু কর এবং রুকুতে গিয়ে স্থির হও। অতঃপর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর সিজদা দাও এবং সিজদায় গিয়ে স্থির হও। তারপর স্থির হয়ে বস। অতঃপর আবার সিজদা দাও এবং সিজদায় স্থির হও। এভাবে নামায শেষ কর।"

পবিত্র কুরআনে আছে ঃ "সেই সব নামাযীর জন্য 'ওয়েল' নির্ধারিত, যারা নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন করে।" এর তাফসীরে হাদীসে আছে যে, যারা রুকু ও সিজদা ঠিকমত করেনা এবং কেবল ঠোকাঠুকি করে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

একটি হাদীসে আছে যে, সবচেয়ে বড় চোর হলো সেই ব্যক্তি যে নামাযে চুরি করে। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কীভাবে নামাযে চুরি করা হয়? রসূল (সা) বললেনঃ যথাযথভাবে রুকু সিজদা না করা ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন না পড়া। (আহমাদ) রসূল (সা) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদার মধ্যবর্তী স্থানে পিঠটান করে দাঁড়ায়না, আল্লাহ তাঁর দিকে দৃষ্টি দেবেন না। (আহমাদ) রসূল (সা) আরো বলেন ঃ সেই ব্যক্তির নামায মুনাফিকের নামায, যে বসে বসে সূর্যকে প্রত্যক্ষ করতে থাকে, আর যেই সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝে পৌঁছে যায় (অর্থাৎ অস্ত যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে) অমনি উঠে দাঁড়ায় এবং চার বার মাথা ঠোকে। ঐ

সময়ে আল্লাহকে সে খুব কমই স্মরণ করতে পারে। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রসূল (সা) তাঁর সংগীদের নিয়ে নামায পড়ে বসলেন। এই সময়ে এক ব্যক্তি এসে তাড়াতাড়ি রুকু সিজদা করে নামায পড়লো। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা ওই ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছো? সে যদি এই অবস্থায় মারা যায় তবে মুহাম্মদ (সা) এর উম্মাতের বহির্ভূত অবস্থায় মারা যাবে। কাক যেমন তার চঞ্চু দিয়ে রক্তে ঠোকর মারে, সে সেই রকম ঠোকর মেরে নামায সারলো। (সহীহে আবু বকর বিন খুযাইমা)

"রসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ যখনই কেউ নামায পড়ে তখন একজন ফিরিশতা তার ডানে এবং একজন ফিরিশতা তার বামে থাকে। সে যদি সুষ্ঠুভাবে নামায শেষ করে তবে তারা উভয়ে সেই নামাযকে নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছায়। নচেত তারা তা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারে।" (দারকুত্নী)

রসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে ওযু করে, অতঃপর নামাযে দাঁড়ায়, সুষ্ঠুভাবে রুকু সিজদা ও কুরআন পাঠ দ্বারা নামায সম্পন্ন করে, তার নামায তাকে বলে ঃ তুমি যেমন আমাকে সংরক্ষণ করেছ, তেমনি আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন। অতঃপর তা আলোকরশ্মি ছড়াতে ছড়াতে আকাশের দিকে উঠে যায়। অতঃপর তার জন্য আকাশের দুয়ার খুলে যায় এবং আল্লাহর নিকট পৌছে গিয়ে উক্ত নামাযীর পক্ষে সুপারিশ করে। আর যখন রুকু সিজদা ও কুরআন পাঠ সুষ্ঠুভাবে করেনা তখন নামায তাকে বলে ঃ তুমি যেমন আমাকে নষ্ট করলে, আল্লাহও তেমনি তোমাকে নষ্ট করুক। অতঃপর তা অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় আকাশে উঠে যায়। তার জন্য আকাশের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তাকে পুরানো কাপড়ের মত গুটিয়ে নামাযীর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হয়।

রসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ নামায একটি দাঁড়িপাল্লা স্বরূপ। যে ব্যক্তি এই দাঁড়িপাল্লা পুরোপুরিভাবে মেপে দেয়, তাকে তার পুরস্কারও পুরোপুরিভাবে দেয়া হবে। আর যে কম মেপে দেবে, তার সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য 'ওয়েল' নির্দিষ্ট রয়েছে। মাপে কম দেয়া যেমন অন্যান্য জিনিসে হতে পারে, তেমনি নামাযেও হতে পারে। আর 'ওয়েল' হচ্ছে জাহান্নামের এমন উত্তপ্ত জায়গা, যার উত্তাপ থেকে জাহান্নাম নিজেও আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। (মুসনাদে আহমাদ)

রসূল (সা) বলেছেন ঃ সিজদার সময় তোমরা মুখমন্ডল, নাক ও দুই হাত মাটিতে রাখবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাতটি অংগ দিয়ে সিজদা

করতে আদেশ দিয়েছেন ঃ কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাটু ও দুই পায়ের পিঠ। সিজদার সময়ে কাপড় ও চুল সামলাতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি প্রতিটি অংগপ্রত্যংগকে তার অধিকার না দিয়ে নামায পড়ে, তাকে সংশ্লিষ্ট অংগ পুরো নামাযের সময়টা ধরে অভিশাপ দিতে থাকে। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হযরত হুযায়ফা এক ব্যক্তিকে দেখলেন ভালোভাবে রুকু সিজদা না করে নামায পড়ছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এভাবে কতদিন যাবত নামায পড়ছ? সে বললোঃ চল্লিশ বছর। তিনি বললেন ঃ তুমি চল্লিশ বছর যাবত কোন নামাযই পড়নি। এ অবস্থায় মারা গেলে তুমি অমুসলিম অবস্থায় মারা যাবে।

ইমাম হাসান বরসী বলতেন ঃ "হে আদম সন্তান! নামায যদি তোমার কাছে গুরুত্বহীন কাজ হয়, তাহলে ইসলামের আর কোন্ কাজটি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবে? অথচ রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দা সর্বপ্রথম নামায সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে। যদি সঠিকভাবে নামায পড়ে থাকে তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি নামায সুষ্ঠুভাবে না পড়ে থাকে তাহলে সে ব্যর্থকাম ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যদি ফরয নামাযে অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে, তবে আল্লাহ বলবেন, "দেখতো, আমার বান্দার কোন নফল কাজ আছে কিনা। যদি থাকে. তবে তা দিয়ে ফরযের ত্রুটি পূর্ণ করা হবে। অনুরূপভাবে সকল কাজের বিচার অনুষ্ঠিত হবে।" (তিরমিযী)

অতএব প্রত্যেক মুমিনের উচিত যতটা বেশী সম্ভব নফল আদায় করা, যাতে ফরযের ক্ষতি পূরণ করা যায়।

জামায়াতে নামায না পড়ার শাস্তি প্রসংগে

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে, এবং লোকদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, তখন তারা সিজদা করতে পারবেনা। তাদের দৃষ্টি নিচু হবে, লাঞ্ছনা-অপমান তাদের ওপর চেপে বসবে। তারা যখন সুস্থ ও নিরাপদ ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হচ্ছিল।" (কিন্তু তারা তা অস্বীকার করতো।) (সূরা) আল-কলম) এ আয়াতের প্রথমাংশে কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তাদের ওপর অবমাননার ছাপ থাকবে। অথচ দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে সিজদা করতে ডাকা হতো। ইবরাহীম তাইমী এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ অর্থাৎ আযান ও ইকামাত দ্বারা তাদেরকে ফরয নামাযের দিকে ডাকা হতো। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন ঃ তারা আযান শুনতো, অথচ সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও জামায়াতে হাজির হতোনা।

কা'ব আল আহবার (রা) বলেন ঃ এ আয়াত কেবলমাত্র নামাযের জামায়াতে অনুপস্থিত থাকা লোকদের প্রসংগে নাযিল হয়েছিল। এ থেকে বিনা ওযরে জামায়াতে উপস্থিত না হওয়ার কী ভয়ংকর পরিণাম, তা জানা যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রসূল (সা) বলেন ঃ "আমার ইচ্ছা হয়, নামাজের জামায়াত অনুষ্ঠিত হোক, তাতে আমি একজন ইমাম নিয়োগ করি, অতঃপর শুখনো কাঠ বহনকারী একদল লোক সাথে নিয়ে যারা জামায়াতে আসেনি তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের বাড়ী জ্বালিয়ে দিই।"

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি রসূল (সা) এর কাছে এসে বললো ঃ হে রসূল, আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে পারে এমন কেউ নেই। আমাকে বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি দিন। রসূল (সা) তাকে অনুমতি দিলেন। সে চলে যেতে উদ্যত হলে তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বললো ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে মসজিদে যাবে। এই হাদীসটি আবু দাউদ শরীফে এভাবে এসেছে যে, "আমর ইবনে উম্মে মাকতুম রসূল (সা) এর কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ হে রসূল! মদীনা অনেক হিংস্র জীবজন্তুতে পূর্ণ শহর। আমি চোখে দেখিনা। বাড়ীও অনেক দূরে। আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে পারে এমন একজন আছে বটে। তবে সে আমার উপযুক্ত নয়। আমি কি বাড়ীতে নামায পড়তে পারি? রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন ঃ হাঁ, পাই। রসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তুমি মসজিদে যাবে। আমি তোমাকে বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি দিতে পারিনা।"

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে জামায়াতে হাজির না হওয়া কোন ক্রমেই বৈধ হতে পারে না। কেননা রসূল (সা) একজন অন্ধ ব্যক্তিকেও বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি দেননি। এজন্য ইবনে আব্বাসকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এক ব্যক্তি সব সময় দিনে রোযা রাখে ও রাতে নামায পড়ে, কিন্তু জামায়াতে নামায পড়ে না। তার কি হবে? তিনি বললেন ঃ এরূপ করতে থাকা অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে যাবে। (তিরমিযী)

রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের ডাক শুনলো কিন্তু কোন ওজর না থাকা সত্ত্বেও জামায়াতে হাজির হলোনা, তার একাকী পড়া নামায কবুল হবেনা। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কি ধরনের ওযর? রসূল (সা) বললেন ঃ রোগ অথবা বিপদের আশংকা। (আবু দাউদ)

রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন ঃ (১) যে

ব্যক্তি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের নেতা হয়। (২) যে নারীর ওপর স্বামী অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় রাত অতিবাহিত হয়ে যায়। (৩) যে আযান শুনেও জামায়াতে যায়না।

আলী (রা) বলেন ঃ "মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদে ছাড়া জায়েজ নয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মসজিদের প্রতিবেশী কে? তিনি বললেন ঃ যে বাড়ীতে বসে আযান শুনতে পায়।"

বুখারী শরীফের এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ "আমরা নামাযের জামায়াতে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে মুনাফিক অথবা রোগী ছাড়া আর কিছু ভাবতামনা।"

ইবনে উমর (রা) জানান যে, একবার উমর (রা) তাঁর খেজুরের বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। এসে দেখেন আসরের জামায়াত শেষ হয়ে গেছে। তিনি তৎক্ষনাত ঐ খেজুরের বাগান দরিদ্র লোকদের নামে সদকা করে দিলেন, যাতে তা জামায়াত ছুটে যাওয়ার ক্ষতি পূরণ করে দেয়।

জামায়াত নামায পড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত ইশা ও ফজরের নামাযকে। কেননা রসূল (সা) বলেছেন ঃ এই দুটি নামায অর্থাৎ ফজর ও ঈশা মুনাফিকের জন্য সবচেয়ে কঠিন। এ দুটি নামায জামায়াতে পড়ার সওয়াব কত তা জানলে লোকেরা কিছুতেই তা ত্যাগ করতোনা। (সহীহ আল বুখারী)

ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ যখন কেউ ফজর ও ইশার জামায়াতে অনুপস্থিত থাকতো, তখন আমরা মনে করতাম সে মুনাফিক হয়ে গেছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ উবাইদুল্লাহ বিন উমার কাওয়ারীরী বলেন যে, আমি কখনো ইশার নামায জামায়াতে পড়তে ভুলতাম না। কিন্তু একদিন আমার বাড়ীতে এক মেহমান আসায় তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কারণে ইশার জামায়াত ধরতে পারলামনা। পরে ইশার নামায ২৭ বার পড়লাম। কারণ হাদীসে আছে, জামায়াতে নামাযের সওয়াব ২৭ গুণ বেশী। কিন্তু রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক দল ঘোড় সওয়ারের সাথে দৌড়ে পাল্লা দিচ্ছি। কিন্তু আমি পেছনে পড়ে যাচ্ছি। যারা আগে ছিল তারা বললো, তুমি কখনো আমাদেরকে ধরতে পারবেনা। কারণ আমরা ইশার নামায জামায়াতে পড়েছি আর তুমি পড়েছ একাকী।

৫. যাকাত না দেয়া

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "যারা আল্লাহর দেয়া সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করে, তাদের এই কাজকে তাদের জন্য কল্যাণজনক মনে করনা। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যে সম্পদ নিয়ে তারা কার্পণ্য করতো তা কিয়ামাতের দিন তাদের গলায় ঝুলানো হবে।" (আল-ইমরান)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন ঃ "সেই মুশরিকদের জন্য ধ্বংস যারা যাকাত দেয়না।" এখানে আল্লাহ্ তাদেরকে মুশরিক নামে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন ঃ "যারা সোনা রূপাকে গোলাজাত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। যেদিন এই সোনারূপা দোজখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপালে, পিঠে ও পার্শে সেক দেয়া হবে আর বলা হবে, এই হলো তোমরা যা নিজেদের জন্য গোলাজাত করে রাখতে সেই সম্পদ। অতএব তোমরা তোমাদের গোলাজাত করা সম্পদের মজা ভোগ কর।" (আত্ তাওবাহ্)

সহীহ্ আল-বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পর্যাপ্ত সোনা রূপার মালিক, অথচ তা থেকে শরিয়ত সম্মত প্রাপ্য দেয়না তাকে কিয়ামাতের দিন আগুনে উত্তপ্ত লোহার পাত দিয়ে কপালে, পিঠে ও দুই পার্শে ছাপ দেয়া হবে। যখনই ঐ স্থানগুলো ঠান্ডা হবে, অমনি পুনরায় ছাপ দেয়া হবে। এভাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ এক এক দিন পর্যন্ত তার দহনক্রিয়া চলবে। বিচার অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে ছাপ দেয়া চলতে থাকবে। তারপর সে বেহেশ্ত অথবা দোজখে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করেন, "হে রাসূল! উট, গরু, ছাগল, প্রভৃতির যাকাত না দিলেও কি এরূপ আযাব হবে?" রাসূল (সা) জবাব দিলেন ঃ "হাঁ।"

হযরত আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ সর্ব প্রথম যে তিন ব্যক্তি দোজখে প্রবেশ করবে, তারা হচ্ছে ঃ গায়ের জোরে ক্ষমতা দখলকারী (অর্থাৎ স্বৈরাচারী) শাসক, যাকাত দেয়না এমন ধনী ব্যক্তি এবং অহংকারী দরিদ্র। (সহীহ্ ইবনে খুযাইমা ও সহীহ্ ইবনে হাব্বান)

হযরত ইবেন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যার হজ্জ করার মত সম্পদ আছে কিন্তু হজ্জ করলোনা কিংবা যাকাত দেয়ার মত সম্পদ আছে কিন্তু যাকাত দিলনা, সে মৃত্যুর সময় আরো একটু দীর্ঘ আয়ু পেলে আল্লাহর হক দিতে পারতো বলে আফসোস করবে। এ সময় জনৈক শ্রোতা বললো ঃ হে ইবনে আব্বাস ! আল্লাহকে ভয়

করুন। মৃত্যুর সময় এরূপ আফসোস তো কেবল কাফিররা করবে। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ আমি যা বলেছি তার প্রমাণ হিসাবে আমি এক্ষুনি তোমাকে আল কুরআনের আয়াত পড়ে শোনাচ্ছি। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার দেয়া সম্পদ থেকে সৎপথে ব্যয় কর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার আগে, যখন তোমাদের মরনোম্মুখ ব্যক্তি বলবে, হে আমার প্রভু! আমার মৃত্যু যদি সামান্য একটু বিলম্বিত করতেন, তাহলে আমি 'সদকা দিতাম'। এবং 'সৎ কর্মশীল হতাম।' (আল-মুনাফিকুন) এখানে 'সদকা দিতাম' অর্থ হজ্জ করতাম। এরপর হযরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ যাকাত কখন ফরয হয়? তিনি বললেন ঃ যখন দুইশো দিরহাম পরিমাণ সম্পদ জমা হয়। (আনুমানিক দশ হাজার টাকার সমপরিমাণ) অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হজ্জ কিসে ফরয হয়? তিনি জবাব দিলেন ঃ পাথেয় ও পরিবহন খরচ সংগৃহীত হলে।

ব্যবহারের জন্য বানানো বৈধ গহনা পত্রে যাকাত দিতে হয়না। তবে সঞ্চয়ের জন্য বা ভাড়া দেয়ার জন্য বানানো গহনার যাকাত দিতে হবে। বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্যের জন্য যাকাত দিতে হবে।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তার যাকাত দিলনা, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ একটি বিষধর সাপে পরিণত হয়ে গলা পেঁচিয়ে থাকবে এবং তার দুই চোয়ালে কামড়িয়ে ধরে বলবে "আমি তোর সম্পদ, আমি তোর পুঁজি।" অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "আল্লাহর দেয়া সম্পদ নিয়ে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন ঐ কৃপণতাকে নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। ওটা বরঞ্চ তাদের জন্য অকল্যাণকর। যে সম্পদকে কেন্দ্র করে তারা কৃপণতা করতো, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পেঁচিয়ে থাকবে।" (সহীহ আল-বুখারী)

তাবারানীতে বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ "কিয়ামতের দিন সোনা রূপাকে আগুনে পুড়িয়ে তাদের কপালে, পিঠে ও পার্শে সেঁক দেয়া হবে" -আল কুরআনের এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত ইবনে মাসউদ বলেন যে, তার দিনার ও দিরহামগুলো পুড়িয়ে একটার ওপর অপরটি সেঁক দেয়া হবেনা, বরং মানুষটির দেহের চামড়া এত সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে প্রত্যেকটি দিনার ও দিরহামকে (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট যুগের প্রচলিত মুদ্রা) পুড়িয়ে আলাদা আলাদাভাবে সেঁক দেয়া সম্ভব হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, সেঁক দেয়ার জন্য পিঠ, কপাল ও পার্শ্বদেশকে নির্দিষ্ট করা

হয়েছে কেন? এর জবাব এই যে কৃপণ বিত্তশালীরা দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখলে বিরক্তির সাথে কপাল কুঁচকে ফেলে ও মুখ কালো করে। অতঃপর পার্শ-দেশ ঘুরিয়ে দেহ বাঁকা করে দাঁড়ায়। তারপর দরিদ্র লোকটি কোন কিছু চাইতে কাছে এলে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে স্থান ত্যাগ করে। তাই এই অংগগুলোতে সেঁক দিয়ে কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শাস্তি দেয়া হবে।

তাবারানীতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (রা) বলেন ঃ পাঁচটি পাপের পাঁচটি শাস্তি। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ পাঁচটি অপরাধের কোন্ পাঁচটি শাস্তি? রাসূল (সা) বললেন ঃ যখনই কোন জাতি অংগীকার ভংগ করবে, আল্লাহ তাদের শত্রুকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। যখনই কোন জাতি আল্লাহর নাযিল করা বিধান ছাড়া অন্য কিছু অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাদের ভেতরে দারিদ্রকে সর্বব্যাপী করে দেবেন। যখনই কোন জাতির ভেতর অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও ব্যভিচারের প্রচলন ঘটবে, আল্লাহ তাদের মধ্যে মৃত্যু (অর্থাৎ অস্বাভাবিক ও অপরিণত বয়সে মৃত্যু) ব্যাপক করে দেবেন। (কোন কোন বর্ণনায় মৃত্যুর পরিবর্তে 'মস্তিষ্ক বিকৃতি'র উল্লেখ আছে) যখনই কোন জাতি মাপে ও ওজনে কমবেশী করবে আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও অজন্মার কবলে ফেলবেন। যখনই কোন জাতি যাকাত দেয়া বন্ধ করবে আল্লাহ তাদেরকে অনাবৃষ্টির কবলিত করবেন।"

উপদেশ ঃ সম্পদের গর্বে যারা গর্বিত, তাদের মনে রাখা উচিত যে, অচিরেই তাদের এ দুনিয়া ও তার সকল সহায় সম্পদ ছেড়ে চলে যেতে হবে। যখন সঞ্চিত সম্পদকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কপালে, পিঠে ও পার্শে সেঁক দেয়া হবে, তখন তা তাদের কোন উপকারে আসবেনা। এ আয়াতটি কখনো ভুলে যাওয়া চাইনা। দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের দেখে বিরক্তি প্রকাশ করা উচিত নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে দরিদ্র লোককে ধনী বানিয়ে দিতে পারেন এবং ধনীকে এক মুহূর্তে দরিদ্রে পরিণত করতে পারেন। কাউকে দরিদ্র বানানো ও কাউকে বিত্তশালী বানানোর পেছনে আল্লাহর যে গভীর ও মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

বিশিষ্ট তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরিয়াবী বলেন ঃ একবার আমি ও আমার সংগীরা হযরত আবু সিনান (র) এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। কিছুক্ষণ পর হযরত আবু সিনান (র) আমাদেরকে সাথে নিয়ে তাঁর এক প্রতিবেশীকে দেখতে গেলেন। ঐ প্রতিবেশীর এক ভাই সম্প্রতি মারা গেছে। তাই তাকে সান্ত্বনা দেয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি খুবই অস্থিরভাবে কান্নাকাটি করছেন। আমাদের কোন সান্ত্বনা বাক্যই তাঁকে শান্ত

করতে পারছিলনা। অবশেষে আমরা বললাম ঃ আপনি কি জানেন না যে, মৃত্যু একটা অবধারিত ব্যাপার? তিনি বললেন ঃ তাতো জানি ভাই, কিন্তু আমি কাঁদছি শুধু এজন্য যে, আমার ভাই কবরে ভয়ংকর আযাব ভোগ করছে। আমরা বললামঃ আল্লাহ্ কি আপনাকে অদৃশ্যের খবর জানিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ দাফন সম্পন্ন করার পর যখন সবাই চলে গেল, তখন আমি কবরের কাছে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। সহসা কবর থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম ঃ "আহ্, আমাকে একা থাকতে দাও। আমি আযাব ভোগ করতে থাকি। আমি নামাযও পড়তাম, রোযাও রাখতাম।" তার এই কথায় আমার কান্না আসতে লাগলো। আমি তার অবস্থা দেখার জন্য কবর খুঁড়লাম। দেখলাম, কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং আমার ভাই এর গলায় আগুনের শেকল লটকানো রয়েছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম আপনার ভাই দুনিয়ায় থাকাকালে কি করতো? তিনি বললেন ঃ সে যাকাত দিতনা। আমরা তখন বললাম ঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদে কার্পণ্য করে, তাদের এ কাজকে তোমরা ভালো মনে করনা। এটা তাদের জন্য অশুভ। যে সম্পদ নিয়ে তারা কার্পণ্য করতো তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।" আপনার ভাইকে হয়তো এ আযাব আগাম দেয়া হচ্ছে। অতঃপর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে জনৈক সাহাবীর নিকট গেলাম, যিনি তখনো জীবিত। আমরা তাঁকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বললাম ঃ "কত ইহুদী ও খৃস্টান মারা যায়। তাদের তো এমনটি হতে দেখিনা।" তিনি বললেন ঃ তারা নিঃসন্দেহে দোজখে যাবে। তবে আল্লাহ মুমিনদের ভেতরেই দৃষ্টান্ত দেখান, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৬. বিনা ওজরে রমযানের রোযা ভংগ করা

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তীদের ওপরে ফরয করা হয়েছিল। আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হবে। কতিপয় দিন, এ সময় যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় কিংবা প্রবাসে থাকে, তা হলে অন্য দিনগুলোতে রোযা রাখবে।"

সহী আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিস ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রাসূল এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা ও রমযানের রোযা রাখা।"

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা ওজরে রমযানের একটি রোযাও পরিত্যাগ করবে, সে যদি এরপর সারা জীবন রোযা রাখে তথাপি তার ক্ষতিপূরণ

হবেনা।" (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

বস্তুত কাফফারা দ্বারা রোযা ভাংগার গুনাহ মাফ হলেও রমযানের রোযার সওয়াব ও মর্যাদা লাভ করা সম্ভব হবেনা।

৭. সামর্থ থাকা সত্বেও হজ্জ না করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "যে ব্যক্তি হজ্জ করার সামর্থ রাখে, তার ওপর হজ্জ করা ফরয।" রাসূল (সা) বলেন ঃ "আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছে হজ্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় বাহন ও পাথেয় যার রয়েছে, সে যদি হজ্জ না করে, তবে সে ইহুদী হয়ে মরুক কিংবা খৃষ্টান হয়ে, তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায়না।"

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ যারা ক্ষমতা থাকা সত্বেও হজ্জ করেনা, আমার ইচ্ছা হয় তাদের ওপর জিযিয়া বসিয়ে দেই। কারণ তারা মুসলমান নয়।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ সামর্থ থাকা সত্বেও যাকাত দেয়না ও হজ্জ করেনা, এমন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় নিজের আয়ু বৃদ্ধির জন্য আক্ষেপ করবে। তাকে প্রশ্ন করা হলো যে, এরূপ আক্ষেপ তো কাফিরদের করার কথা।" তিনি বললেনঃ আমি যে কথা বলেছি তা কুরআনে রয়েছে। এই বলে তিনি নিম্নের আয়াত কয়টি পড়লেন ঃ

"হে মুমিনগণ ঃ তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয়। আর যারা উদাসীন হবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমরা সেই সময়টি ঘনিয়ে আসার আগে আমার দেয়া সম্পদ থেকে দান কর, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু এসে যাবে তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি কেন আমাকে আর অল্প কিছু সময় বাড়িয়ে দিলেনা, তাহলে আমি সদকা করতাম (অর্থাৎ যাকাত দিতাম) এবং সৎকর্মশীলদের (অর্থাৎ হজ্জ আদায়কারীদের) অন্তর্ভুক্ত হতাম।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যাকাত কিসে ফরয হয়? তিনি বললেন ঃ দুইশত দিরহাম অথবা অনুরূপ মূল্যের স্বর্ণ থাকলে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ হজ্জ কিসে ফরয হয়? তিনি বললেন, আসা যাওয়ার পথ খরচ ও যানবাহন সংগৃহীত হলেই হজ্জ ফরয হয়। হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা) বলেন ঃ "আমার এক ধনী প্রতিবেশী হজ্জ না করে মারা গেলে আমি তার জানাযার নামায পড়িনি।"

৮. আত্মহত্যা করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়ালু। আর যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি ও জুলমের মাধ্যমে এ কাজ

করবে, তাকে আমি আগুনে পোড়াবো। এ কাজ আল্লাহর পক্ষে সহজ।" (সূরা আন নিসা)

ইমাম ওয়াহেদী ও ইবনে আব্বাস প্রমুখ এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেছেন যে, এর অর্থ তোমরা একে অপরকে হত্যা করোনা। কেননা তোমরা একই ধর্মের অনুসারী। তাই তোমরা যেন একই ব্যক্তি। কিন্তু অন্যরা বলেছেন যে, এ আয়াতে আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই শেষোক্ত মতটিই সঠিক। কেননা অন্য মানুষকে হত্যার ব্যাপারে আল কুরআন ও হাদীসে আরো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া আবু দাউদ শরীফে উদ্ধৃত হযরত আমর ইবনুল আসের বর্ণিত হাদীসও এই মতের বিশুদ্ধতার অন্যতম প্রমাণ। হযরত আমর ইবনুল আ'স বলেন ঃ রাসূল (সা) এর নেতৃত্বে পরিচালিত যাতুস সালাসিল যুদ্ধ চলাকালে এক হিমেল রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। সেই রাতে গোসল করলে ঠান্ডায় আমার মারা যাওয়ার আশংকা ছিল। তাই আমি তায়াম্মুম করলাম এবং আমার সংগীদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লাম। পরে রাসূলকে (সা) ঘটনাটা জানালাম। তিনি বললেন ঃ "ওহে আমর। তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে নাপাক শরীরে নামায পড়লে? আমি কী কারণে গোসল করিনি তা তাঁকে অবহিত করলাম। সেই সাথে বললাম ঃ আমি কুরআনে আল্লাহর এই বানী পড়েছি যে, "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর দয়ালু।" এ কথা শুনে রাসূল (সা) হেসে দিলেন এবং আর কিছুই বললেন না। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আমর এই আয়াত দ্বারা আত্মহত্যা বুঝেছেন, অন্যকে হত্যা করা নয়। অথচ রাসূল (সা) তাঁর এই ব্যাখ্যায় আপত্তি করেননি।

অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আহত হয়ে কষ্ট পাচ্ছিল। তাই সে একখানা ছুরি দ্বারা নিজের দেহে আঘাত করলো। ফলে রক্তপাত হয়ে সে মারা গেল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বললেন। "আমার বান্দা আমাকে ডিংগিয়ে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।" (সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে বসে অনন্তকাল ধরে সেই অস্ত্র দিয়েই নিজেকে কোপাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের মধ্যে বসেও সে অনন্তকাল ধরে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে, দোযখে বসেও সে

অনবরত উচ্চ স্থান থেকে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। এভাবে অনন্তকাল ধরে সে নিজেকে কষ্ট দিতে থাকবে। (সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

অপর হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "কোন মুমিনকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার শামিল। কোন মুমিনকে মিথ্যামিথ্যি কাফির বলা তাকে হত্যা করার শামিল। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস দ্বারা নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিনও তাকে সেই জিনিস দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে।" (সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী)

অপর একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নিজের ক্ষত স্থানের যন্ত্রণা সইতে না পেরে নিজ তরবারী দ্বারা আত্মহত্যা করে। রাসূল (সা) তার কথা শুনে বলেন, সে জাহান্নামী।

বস্তুত আল্লাহর দেয়া প্রাণ ও আয়ুষ্কাল একটি মস্ত বড় নিয়ামত এবং আখিরাতের জন্য নেক কাজ করার সীমিত অবকাশ। একে যারা স্বহস্তে খতম করে, তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্ আমাদেরকে এই ভয়ংকর কবীরা গুনাহ্ থেকে রক্ষা করুন।

৯. পিতামাতার অবাধ্য হওয়া ও তাদের কষ্ট দেয়া

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা বনী ইসরাইলে এরশাদ করেন ঃ "তোমার প্রতিপালক ফায়সালা করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবেনা এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" অর্থাৎ তাদের উভয়ের সেবাযত্ন করবে ও তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করবে। "তোমার কাছে তাদের দু'জনের কেউ বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উহ্ বলোনা এবং ধমক দিওনা।" অর্থাৎ কোন রূঢ় ও কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করোনা। বস্তুত তারা উভয়ে যখন তোমার সেবাযত্ন করেছে, তখন তোমারও তাদের সেবাযত্ন করা উচিত। স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা প্রথমে তোমার সেবাযত্ন করে চরম নিঃস্বার্থতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে এবং তুমি সেবাযত্ন করলেও তাদের সমকক্ষ হতে পারবেনা। পরিতাপের বিষয় যে, শৈশবে পিতামাতা সন্তানের কাছ থেকে কষ্ট পেয়েও সেবাযত্ন করে সন্তানের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করতো। আর সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতার কাছ থেকে একটু কষ্ট পেলেই তার তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করে। এরপর আল্লাহ্ বলেন ঃ "তাদের উভয়ের সাথে কোমল ভাষায় কথা বল।" অর্থাৎ বিনয়ের সাথে ও আন্তরিক সহানুভূতির সাথে কথা বল। তাদের ওপর মমতাপূর্ণ ডানা বিস্তার করে দাও এবং বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার

পিতামাতা শৈশবে আমাকে যেরূপ স্নেহ মমতা সহকারে লালন পালন করেছেন, আপনিও তাদেরকে তদ্রূপ করুণা ও দয়া সহকারে লালন পালন করুন।"

সূরা লুকমানে আল্লাহ্ বলেন ঃ "তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার কাছেও কৃতজ্ঞ হও।" লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা কীভাবে নিজের প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে যুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ তিনটি আয়াত তিনটি জিনিসের সাথে যুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছে। এর একটি বাদে অপরটি কবুল হয়না। প্রথমটিতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর।" যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানবে ও রাসূলকে মানবেনা, তার আল্লাহকে মানা কবুল হবেনা। দ্বিতীয়টিতে আল্লাহ্ বলেন ঃ "তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও।" যে ব্যক্তি নামায পড়বে ও যাকাত দেবেনা, তার নামায কবুল হবেনা। তৃতীয়টিতে আল্লাহ্ বলেন ঃ 'তুমি আমার প্রতি কতৃজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হবেনা, তার আল্লাহর কৃতজ্ঞতা অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য। এ জন্যই রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'পিতামাতার সন্তোষে আল্লাহর সন্তোষ নিহিত এবং পিতামাতার অসন্তোষে আল্লাহর অসন্তোষ নিহিত।" (আল জামে' আত্ মিরমিযী)

হযরত ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূল (সা) এর সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তোমার পিতামাতা কি বেঁচে আছেন? সে বললো ঃ জ্বি। রাসূল (সা) বললেন ঃ "তাহলে তাদেরকে নিয়েই তুমি জিহাদ কর।" অর্থাৎ তাদের সেবাই তোমার জন্য জিহাদ। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) লক্ষণীয় যে, পিতামাতার সেবাকে জিহাদের ওপর অগ্রগণ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অপর হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ কী, তা কি আমি তোমাদেরকে জানাবো? তা হচ্ছে ঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পিতামাতার সাথে অসদাচরণ।" এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার, অযত্ন ও অবহেলাকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সমান্তরালে রাখা হয়েছে। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অপর হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ পিতামাতার সাথে অসদাচরণকারী, দান করে খোটা দানকারী ও মদ পানকারী জান্নাতে যাবে না।" রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ উহ্ করার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন কষ্টদায়ক আচরণ যদি থাকতো,

তবে আল্লাহ তাও নিষিদ্ধ করতেন। সুতরাং পিতামাতার সাথে অসদাচরণকারী যা ইচ্ছে তাই করুক। সে জান্নাতে কখনো যাবেনা। আর সদাচরণকারী যা খুশী করুক। সে কখনো জাহান্নামে যাবেনা।" (দায়লামী) তিনি আরো বলেছেন ঃ পিতামাতার সাথে অসদাচরণকারীকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তার পিতাকে গাল দেয় ও তিরস্কার করে তাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যে ব্যক্তি তার মাতাকে গাল দেয় ও তিরস্কার করে, আল্লাহ তাকেও অভিসম্পাত করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ সকল গুনাহের শাস্তি যত দিন ইচ্ছা বিলম্বে কার্যকর করেন, এমনকি তা কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করে থাকেন। কেবল পিতামাতার প্রতি অসদাচরণ এর ব্যতিক্রম। আল্লাহ এর শাস্তি অবিলম্বেই কার্যকর করেন।" অর্থাৎ কিয়ামতের আগে দুনিয়ার জীবনেই সে শাস্তি পায়।

হযরত কা'ব আল-আহ্‌বার (র) বলেন ঃ কোন বান্দা যখন তার পিতামাতার প্রতি অসদাচরণ করে, তখন তার শাস্তি ত্বরান্বিত করার জন্য আল্লাহ তার আয়ু কমিয়ে দেন। আর যখন কোন বান্দা তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করে, তখন আল্লাহ তার আয়ু বাড়িয়ে দেন, যাতে সে আরো সৎ কাজ করতে পারে এবং সুখশান্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পারে। পিতামাতার সাথে সদাচরণ এভাবেও করা যায় যে, তারা যখন কোন জিনিসের অভাব অনুভব করেন, তখন সন্তান তা পূরণ করবে। এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর কাছে এসে বললো ঃ হে রাসূল! আমার পিতা আমার ধনসম্পদ নষ্ট করে দিতে চান। রাসূল (সা) বললেন ঃ "তুমি ও তোমার ধনসম্পদ তোমার পিতার।" হযরত কা'ব আল-আহ্‌বারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, পিতামাতার সাথে অসদাচরণ বলতে কি বুঝায়? তিনি জবাব দিলেন ঃ পিতামাতা যদি সন্তানের জন্য কোন কসম খায় বা মানত মানে, তবে সন্তান কর্তৃক তা পুরা না করা, তারা কোন আদেশ দিলে তা না মানা, তারা কোন কিছু চাইলে তা না দেয়া (ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) এবং তারা সন্তানের কাছে কোন জিনিস গচ্ছিত রাখলে সন্তান কর্তৃক তা আত্মসাত করা। (ইবনে মাজাহ)

ইবনে মাজাহসহ একাধিক হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আ'রাফ কী এবং কারা তাতে বাস করবে? হযরত ইবনে আব্বাস জবাব দিলেন যে, আ'রাফ হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত একটি পাহাড়। এই পাহাড় থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখা যায় এবং এর ওপর

বহু ফলবান গাছপালা ও ঝর্ণা রয়েছে বলে এর নাম আ'রাফ রাখা হয়েছে। যারা পিতামাতার সম্মতি ছাড়া জিহাদে গিয়ে শহীদ হয় তারা সাময়িকভাবে এইখানে থাকবে। কেননা আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভ তাদের জাহান্নামে প্রবেশের পথ বন্ধ করবে। আর পিতামাতার অসন্তুষ্টি তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ আগলে রাখবে। কিছুকাল এখানে থাকার পর আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন।

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, হে রাসূলুল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী? তিনি বললেন ঃ তোমার মাতা। সে বললো ঃ তার পর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মাতা। সে পুনরায় বললো ঃ তারপর কে? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার মাতা। সে বললো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তোমার সর্বাধিক আপন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ।" এভাবে তিনি মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারে তিনবার এবং পিতার সাথে সদ্ব্যবহারে একবার তাকিদ দিলেন। এর একমাত্র কারণ এই যে, মাতা সন্তানের জন্য সর্বাধিক উদ্বিগ্ন থাকে এবং তাকে সর্বাধিক স্নেহ ও আদর যত্ন করে। সন্তান ধারণ, দুধ খাওয়ানো, লালন-পালন এবং রাত জেগে তত্ত্বাবধান - এই কষ্টকর কাজগুলো একমাত্র মা-ই সন্তানের জন্য করে থাকেন।

একবার হযরত ইবনে উমার (রা) দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি নিজের মাকে কাঁধের ওপর বহন করে কা'বা শরীফের তওয়াফ করছে। সে বললো ঃ ওহে ইবনে উমার, আপনি কি মনে করেন যে, এভাবে আমি নিজের মাকে কাঁধে বহন করে তওয়াফ করার মাধ্যমে তাঁর কিছু ঋণ পরিশোধ করতে পেয়েছি? ইবনে উমার বললেন ঃ কখখনো না। এমনকি তোমাকে পেটে বহন করে যতগুলো দিন তিনি কষ্ট সহ্য করেছেন, তার একটি দিনেরও ঋণ শোধ করতে পারনি। তবে তুমি যেটুকু করেছ, ভালই করেছ। আল্লাহ তোমাকে এই অল্প কাজে বেশী প্রতিদান দেবেন।"

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ যে, চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করতেও দেবেন না, তার নিয়ামতসমূহের স্বাদ গ্রহণেরও সুযোগ দেবেননা; মদ্য পানকারী, সুদখোর, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাত্কারী এবং পিতামাতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারী। অবশ্য এরা তাওবাহ করলে সে কথা স্বতন্ত্র।" (হাকেম) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে অবস্থিত।" (ইবনে মাজাহ, নাসায়ী) এক ব্যক্তি হযরত আবুদ্ দারদার (রা) কাছে এসে বললো ঃ "আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। কিন্তু আমার মা তাকে তালাক দিতে বলছেন।" হযরত

আবুদ্ দারদা বললেন ঃ "মা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। তুমি ইচ্ছা করলে ওটা নষ্ট করে দাও, অথবা রক্ষা কর।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন জনের দোয়া যে কবুল হয়, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রবাসী বা পথিকের দোয়া, উৎপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের দোয়া এবং সন্তানের জন্য পিতামাতার দোয়া। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ খালা মায়ের মর্যাদা সম্পন্ন। অর্থাৎ তাঁর সাথে মায়ের মতই সদ্ব্যবহার, সম্মানজনক আচরণ ও উপঢৌকনাদি প্রদান করা কর্তব্য। হযরত ওহব বিন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আ) এর নিকট এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছিলেন যে, হে মূসা! তুমি তোমার পিতামাতাকে সম্মান কর। কেননা যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে সম্মান করে, আমি তাকে দীর্ঘজীবী করি এবং তাকে এমন সন্তান দেই, যে তাকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমি তার আয়ু কমিয়ে দেই এবং তাকে বেআদব ও অবাধ্য সন্তান দান করি।

হযরত আবু বকর বিন আবু মরিয়ম (রা) বলেন ঃ "আমি তাওরাতে পড়েছি , যে ব্যক্তি তার পিতাকে প্রহার করে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।" হযরত ওহব বলেন ঃ "আমি তাওরাতে পড়েছি যে, যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে চপেটাঘাত করে, তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে।"

হযরত আমর বিন মুররা আল জুহানী (রা) বলেন ঃ "এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর নিকট এসে বললো ঃ হে রাসূল, আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, রমযানের রোযা রাখি, যাকাত দেই এবং হজ্জ করি, তাহলে আমার কী লাভ হবে? তিনি বললেন ঃ এসব কাজ যে ব্যক্তি ঠিকমত সম্পন্ন করবে, সে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীল বান্দাহগণের সংগী হবে। তবে পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করলে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।" (আহমাদ, তাবারানী, ইবনে হাব্বান, ইবনে খুযাইমা) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "পিতামাতার প্রতি অসদাচরণকারীকে আল্লাহ অভিসম্পাত দিয়েছেন।" রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি কিছু লোককে আগুনের স্তম্ভে ঝুলন্ত দেখেছি। জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এরা কারা? তিনি জবাব দিলেন ঃ যারা দুনিয়ায় নিজেদের পিতামাতাকে তিরস্কার করতো।"

বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে এও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে বকাঝকা করে, তার কবরে জাহান্নাম থেকে এত বিপুল সংখ্যক আগুনের জ্বলন্ত

অংগার নেমে আসবে, যত বারিবিন্দু আকাশ থেকে নেমে থাকে। আরো বর্ণিত আছে যে, পিতামাতার সাথে অসদাচরণকারী সমাহিত হওয়ার পর তার কবর তাকে এত জোরে চাপ দেয় যে, তার পাজরের হাড়গোড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগকারী হচ্ছে মুশরিক, ব্যভিচারী ও পিতামাতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারী।

হযরত বিশর (রা) বলেন ঃ মায়ের গলার আওয়ায় শোনা যায় এত নিকটে যে ব্যক্তি অবস্থান করে, সে তরবারী নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর চেয়ে উত্তম। মায়ের প্রতি ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি দানের চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু নেই।

ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ বর্ণিত হাদীসে আছে যে, জনৈক পুরুষ ও জনৈক মহিলা তাদের সন্তান সম্পর্কে ঝগড়া করতে রাসূল (সা) এর দরবারে হাজির হলো। পুরুষটি বললো ঃ হে রাসূল, আমি এই সন্তানের জনক। মহিলাটি বললোঃ হে রাসূল! এই সন্তানের বীজ বহনে ওর কোনই কষ্ট হয়নি, উপরন্তু একে জন্ম দিতে গিয়ে সে কেবল আনন্দই উপভোগ করেছে। আর আমি সন্তানটিকে গর্ভে ধারণও করেছি কষ্টের মধ্য দিয়ে, প্রসবও করেছি কষ্টের মধ্য দিয়ে, আর তাকে দু'বছর ব্যাপী দুধও খাইয়েছি।' এ কথা শোনার পর রাসূল (সা) রায় দিলেন যে, শিশুটি তার মায়ের কাছেই থাকবে।

ইমাম তাবারানী ও ইমাম আহমাদ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) এর যুগে আলকামা নামে মদীনায় এক যুবক বাস করতো। সে নামায, রোযা ও সদকার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত বন্দেগীতে অতিশয় অধ্যবসায় সহকারে লিপ্ত থাকতো। একবার সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। তার স্ত্রী রাসূল (সা)-এর কাছে খবর পাঠালো যে, "আমার স্বামী আলকামা মুমূর্ষ অবস্থায় আছে। হে রাসূল, আমি আপনাকে তার অবস্থা জানানো জরুরী মনে করছি।" রাসূল (সা) তৎক্ষণাত হযরত আম্মার, সুহাইব ও বিলাল (রা) কে তার কাছে পাঠালেন। তাদেরকে বলে দিলেন যে, "তোমরা তার কাছে গিয়ে তাকে কলেমায়ে শাহাদাত পড়াও।" তারা গিয়ে দেখলেন, আলকামা মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে। তাই তাঁরা তাকে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়াতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে কোনমতেই কলেমা উচ্চারণ করতে পারছিলনা। অগত্যা তাঁরা রাসূলকে (সা) খবর পাঠালেন যে, আলকামার মুখে কলেমা উচ্চারিত হচ্ছেনা। যে ব্যক্তি এই সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল। তার কাছে রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আলকামার পিতামাতার মধ্যেই কেউ কি জীবিত আছে? সে বললো ঃ "হে রাসূল, তার কেবল বৃদ্ধা মা বেঁচে আছে।" রাসূল (সা) তৎক্ষণাত তাকে

আলকামার মায়ের কাছে পাঠালেন এবং বললেন ঃ "তাকে গিয়ে বল যে, তুমি যদি রাসূল (সা) এর কাছে যেতে পার তবে চল, নচেত অপেক্ষা কর। তিনি তোমার সাথে সাক্ষাত করতে আসছেন।" দূত আলকামার মায়ের কাছে উপস্থি হ'য়ে রাসূল (সা) যা বলেছিলেন তা জানালো। আলকামার মা বললেন ঃ "রাসূল (সা) এর জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক। তাঁর কাছে বরং আমিই যাবো।" বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে রাসূল (সা) এর কাছে এসে সালাম করলেন। রাসূল (সা) সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ ওহে আলকামার মা, আমাকে আপনি সত্য কথা বলবেন। আর যদি মিথ্যা বলেন, তবে আল্লাহর কাছ থেকে আমার কাছে ওহী আসবে। বলুন তো, আপনার ছেলে আলকামার স্বভাব চরিত্র কেমন ছিল? বৃদ্ধা বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, সে প্রচুর পরিমাণে নামায, রোযা ও সদকা আদায় করতো।" রাসূল (সা) বললেন ঃ তার প্রতি আপনার মনোভাব কী? বৃদ্ধা বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট।" রাসূল (সা) বললেন ঃ কেন? বৃদ্ধা বললেন ঃ "সে তার স্ত্রীকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দিত এবং আমার আদেশ অমান্য করতো।" রাসূল (সা) বললেন ঃ "আলকামার মায়ের অসন্তোষ হেতু কলেমা উচ্চারণে আলকামার জিহবা আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে।" তারপর রাসূল (সা) বললেন ঃ 'হে বিলাল, যাও, আমার জন্য প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ যোগাড় করে নিয়ে আস।"

বৃদ্ধা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, কাষ্ঠ দিয়ে কী করবেন? রাসূল (সা) বললেনঃ "আমি ওকে আপনার সামনেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেব।" বৃদ্ধা বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, আমার সামনেই আমার ছেলেকে আগুন দিয়ে পোড়াবেন তা আমি সহ্য করতে পারবোনা।" রাসূল (সা) বললেনঃ "ওহে আলকামার মা, আল্লাহর আযাব এর চেয়েও কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী। এখন আপনি যদি চান যে, আল্লাহ আপনার ছেলেকে মাফ করে দিক, তা হলে তাকে আপনি মাফ করে দিন এবং তার ওপর সন্তুষ্ট হ'য়ে যান। নচেত যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তার কসম, যতক্ষণ আপনি তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন, ততক্ষণ নামায রোযা ও সদকা দিয়ে আলকামার কোন লাভ হবেনা।" এ কথা শুনে আলকামার মা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহকে, আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে এবং এখানে যে সকল মুসলমান উপস্থিত, তাদের সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার ছেলে আলকামার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি।" রাসূল (সা) বললেনঃ "ওহে বিলাল, এবার আলকামার কাছে যাও। দেখ, সে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে পারে কিনা। কেননা আমার মনে হয়, আলকামার মা আমার কাছে কোন

লাজলজ্জা না রেখে যথার্থ কথাই বলেছে।" হযরত বিলাল (রা) তৎক্ষণাত গেলেন। শুনতে পেলেন, ঘরের ভেতর থেকে আলকামা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করছে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।" অতঃপর বিলাল গৃহে প্রবেশ করে উপস্থিত জনতাকে বললেন ঃ শুনে রাখ, আলকামার মা অসন্তুষ্ট থাকার কারণে সে প্রথমে কলেমা উচ্চারণ করতে পারেনি। পরে তিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় তার জিহ্বা কলেমা উচ্চারণে সক্ষম হয়েছে। অতঃপর আলকামা সেই দিনই মারা যায় এবং রাসূল (সা) নিজে উপস্থিত হ'য়ে তার গোসল ও কাফনের নির্দেশ দেন, জানাজার নামায পড়ান এবং দাফনে শরীক হন। অতঃপর তার কবরে দাঁড়িয়ে রাসূল (সা) বলেন ঃ হে আনসার ও মুহাজিরগণ! যে ব্যক্তি মায়ের ওপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয়, তার ওপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের অভিসম্পাত! আল্লাহ তার পক্ষে কোন সুপারিশ কবুল করবেন না। কেবল তাওবাহ করে ও মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করলেই নিস্তার পাওয়া যাবে। মনে রাখবে, মায়ের সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তোষ এবং মায়ের অসন্তোষেই আল্লাহর অসন্তোষ।"

১০. রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করা

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সম্পর্কে সতর্ক হও।" অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করোনা। (সূরা আননিসা) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ "তোমরা রাসূলের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তাগুলোকে ছিন্ন করতে চাও নাকি? এসব অপকর্ম যারা করে, তাদের ওপরই তো আল্লাহ তা'য়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে বধির ও অন্ধ করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ "আর যারা আল্লাহর অংগীকার পূরণ করে এবং প্রতিশ্রুতি ভংগ করেনা এবং আল্লাহ যেসব সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলিকে রক্ষা করে, তাদের প্রভুকে ভয় করে এবং খারাপ প্রতিফলকে ভয় করে, (তারাই বুদ্ধিমান)। (সূরা আর-রা'দ)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ "আল্লাহ এ দ্বারা (অর্থাৎ কুরআন দ্বারা) অনেককে বিভ্রান্ত করেন এবং অনেককে সুপথগামী করেন। তিনি বিপথগামী করেন কেবল সেই সব অন্ধ লোককে, যারা আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভংগ করে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ককে রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বস্তুত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

বস্তত আল্লাহ যেসব সম্পর্ককে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।" যে ব্যক্তি নিজের দুর্বল ও দরিদ্র নিকট-আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদেরকে ত্যাগ করে, তাদের ওপর অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ করে, নিজে ধনী এবং তারা দরিদ্র এরূপ ক্ষেত্রে তাদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য ও অনুগ্রহ দ্বারা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করেনা, উপরোক্ত হুমকি ও হুশিয়ারী তার ওপর প্রযোজ্য এবং সে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার পাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে তাওবাহ ও উক্ত আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণ করা দ্বারাই এ পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

তারাবানীতে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'দরিদ্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন থাকতে যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করেনা এবং নিজের দান সদকা তাদেরকে না দিয়ে অন্যদেরকে দেয়, আল্লাহ তা'য়ালা তার সদকা কবুল করেননা এবং কিয়ামাতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।" আর যদি সে নিজে দরিদ্র হয়, তবে তাদের কাছে বেড়াতে এবং তাদের অবস্থা পরিদর্শন করতে যাওয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "নিকট আত্মীয়দের সাথে সালাম দেয়ার মাধ্যমে হলেও আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ কর।"

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষা করে।" (সহীহ আল বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী) অন্য হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ প্রতিশোধ গ্রহণকারী সম্পর্ক রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেনা। সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তা ছিন্নকারীর সাথে আত্মীয়তা রক্ষা বা বহাল করে।

এক হাদীসে কুদসীতে রাসূল (সা) বলেন ঃ "আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন যে, আমি পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষা করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করে তার সাথে আমিও সম্পর্ক ছিন্ন করি।" হযরত আলী (রা) তার ছেলেকে বলেছিলেন ঃ "হে বৎস! কখনো রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারীর সহচর হয়োনা। কেননা আমি আল্লাহর কিতাবে তিন জায়গায় এরূপ ব্যক্তিকে অভিশপ্ত আখ্যায়িত হতে দেখেছি।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) একবার এক বৈঠকে রাসূল (সা) এর হাদীস বর্ণনা করার সময় বললেন ঃ কোন রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্নকারীর সাথে একত্রে বসতে আমি বিরক্ত বোধ করি, যতক্ষণ সে উঠে না যায়।" এ কথা শুনে বৈঠকের শেষ প্রান্ত থেকে এক যুবক উঠে গেল। সে তার ফুফুর কাছে গেল। এই ফুফুর

সাথে সে বহু বছর যাবত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। পরে আবার সম্পর্ক বহাল করে। তার ফুফু জিজ্ঞাসা করলো ঃ তুমি কেন এসেছ? সে বললো ঃ আমি রাসূল (সা) এর সহচর আবু হুরাইরার কাছে বসেছিলাম। তিনি বললেন ঃ রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে বসতে আমি বিরক্ত বোধ করি, যতক্ষণ না সে উঠে যায়।" তার ফুফু বললো ঃ ওহে ভাতিজা, তুমি আবু হুরাইরার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর যে, এর কারণ কি? সে আবু হুরাইরার কাছে ফিরে গিয়ে তার ফুফুর বক্তব্য তাকে জানালো এবং জিজ্ঞাসা করলো আপনার কাছে কোন আত্মীয়তা ছিন্নকারী বসতে পারেনা কেন? হযরত আবু হুরাইরা বললেন ঃ "আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি যে, কোন দলের ভেতর রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী কোন ব্যক্তি থাকলে তাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়না।" (তারগীব ও তারহীব)

কথিত আছে যে, একবার এক ধনাঢ্য ব্যক্তি হজ্জ করতে গিয়েছিল। মক্কায় পৌঁছে সে নিজের এক হাজার দীনার খুবই সৎ ও আমানতদার বলে পরিচিত এক ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রাখলো। পরে আরাফাত থেকে ফিরে এসে দেখলো লোকটি মারা গেছে। সে মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে, তারা ঐ এক হাজার দীনার সম্পর্কে কিছুই জানেনা। অতঃপর সে মক্কার বিশিষ্ট আলেমগণের কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইল। তাঁরা তাকে বললেন যে, তুমি রাত দুপুরের সময় যমযম কুপের নিকট গিয়ে তাঁর নাম ধরে ডাক দিও। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে, তাহলে সে তোমার প্রথম ডাকেই সাড়া দেবে এবং তোমার টাকার কথা জানাবে। লোকটি রাত দুপুরে যমযম কুয়ার কাছে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করলো। কিন্তু কোন সাড়া পেলনা। অবশেষে উক্ত আলেমগণের নিকট ফিরে গেল। তাঁরা বললেন ঃ আমাদের আশংকা, তোমার বন্ধু হয়তো জাহান্নামবাসী হয়েছে। তুমি ইয়ামানে যাও। সেখানে বারহুত নামে একটি কুয়া আছে। জনশ্রুতি আছে যে, ঐ কুয়াটা জাহান্নামের সাথে সংযুক্ত এবং ওতে পাপী লোকদের আত্মা অবস্থান করে। তুমি গভীর রাতে ওখানে গিয়ে তার নাম ধরে ডাক দিও। সে জাহান্নামী হয়ে থাকলে তোমার ডাকে সাড়া দেবে।

অতঃপর লোকটি ইয়ামানের উল্লেখিত কুয়াটির কাছে গেল এবং মৃত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকলো। মৃত ব্যক্তি তৎক্ষণাত সাড়া দিল। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমার এক হাজার দীনার কোথায় রেখেছ? সে বললো ঃ ওটা আমার বাড়ীর অমুক স্থানে মাটিতে পোতা আছে। আমার ছেলে বিশ্বস্ত নয় বলে তার কাছে রাখিনি। তুমি আমার রাড়ীতে গিয়ে মাটি খুড়ে তোমার দীনারগুলো নিয়ে নাও।" সে বললো ঃ আমরা তো তোমাকে সৎলোক মনে করতাম। কিন্তু তোমার এখানে আসার

কারণ কি? সে বললো ঃ আমার এক দরিদ্র বোন ছিল। তার কোন খোঁজখবর নিতামনা। তাই আল্লাহ্ আমাকে এহ্ শাস্তি দিয়েছেন।

দ্রষ্টব্যঃ এই কাহিনীর বিশদ বিবরণ হুবহু গ্রহণযোগ্য কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে এবং ইমাম ইবনে কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ "আর-রূহ"তে যমযম কূপে মুমিনদের আত্মা এবং বারহুত বা যাবিয়ার কূপে পাপীদের আত্মা থাকার বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। (গ্রন্থকারের টীকা) কিন্তু "রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবেনা" এহ্ মর্মে রাসূল (সা) এর যে বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে, তার দ্বারা এ কাহিনীর মূল শিক্ষাটি সমর্থিত। — অনুবাদক

১১. ব্যভিচার

অবস্থা ও পাত্রভেদে ব্যভিচারের গুরুত্বের তারতম্য আছে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়োনা। ওটা একটা অশ্লীল কাজ এবং খারাপ পন্থা।" (বনী ইসরাইল) "আর যারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহের ইবাদাত করেনা, আল্লাহ্র নিষিদ্ধকৃত প্রাণী সংগত কারণ ছাড়া হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা (তারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা।) আর যে ব্যক্তি এসব কাজ করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় চিরস্থায়ী হবে। কেবল তওবাকারী ব্যতীত।" (সূরা আল ফুরকান) "ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিনী নারী - উভয়কে একশো ঘা করে বেত মার। আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা আন নূর)

আলেমগণ বলেছেন ঃ এ হচ্ছে অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর ইহকালীন শাস্তি। তবে তারা যদি বিবাহিত হয়ে থাকে অথবা জীবনে একবার হলেও বিবাহিত হয়েছিল এমন হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। এটা হাদীস থেকে প্রমাণিত। এই মৃত্যুদন্ডেও যদি তাদের পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত না হয় এবং তারা উভয়ে বিনা তওবায় মারা যায় তাহলে তাদেরকে দোজখে আগুনে পোড়ানো লৌহদন্ড দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে।

আল্লাহর কিতাব যবূর শরীফে লিখিত ছিল ঃ "ব্যভিচারীদেরকে নগ্ন করে দোজখে ঝুলানো হবে এবং লোহার ছড়ি বা লাঠি দিয়ে তাদের জননেন্দ্রিয়ে পেটানো হবে।

পিটুনি খেয়ে তারা যখন চিৎকার করবে, তখন দোজখের ফেরেশতারা বলবে ঃ দুনিয়াতে যখন তোমরা আনন্দ ফুর্তি করতে, হাসতে এবং আল্লাহর কথা ধ্যান করতে না এবং তাঁকে লজ্জা পেতেনা, তখন এই চিৎকার কোথায় ছিল?

সহীহ্ আল্-বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন ব্যভিচারী ব্যভিচারের সময়ে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করেনা। কোন চোর চুরির সময়ে মুমিন অবস্থায় চুরি করেনা, কোন মদখোর মদ খাওয়ার সময় মুমিন অবস্থায় মদ পান করেনা, কোন লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠন করার সময় মুমিন অবস্থায় লুণ্ঠন করেনা।" আবু দাউদ, তিরমিযী ও বায়হাকীর বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দা যখন ব্যভিচার করে, তখন তার ভেতর থেকে ঈমান বেরিয়ে যায়, অতঃপর তা তার মাথার ওপর মেঘের মত ভাসতে থাকে। অতঃপর সে যখন তওবা করে তখন ঈমান পুনরায় তার কাছে ফিরে আসে।"

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ব্যভিচার করে বা মদ খায়, আল্লাহ্ তার কাছ থেকে ঈমান ঠিক সেইভাবে কেড়ে নেন, যেভাবে কোন মানুষ তার মাথার ওপর দিয়ে জামা খুলে ফেলে। মুসলিম ও নাসায়ীর অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত থাকবে। তারা হলো ঃ ব্যভিচারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী শাসক এবং অহংকারী দরিদ্র।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি বলেছিলাম ঃ হে রাসূল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কী? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মনে করা, অথচ তিনি প্রত্যেক প্রাণীর স্রষ্টা। আমি বললাম ঃ এটা নিশ্চয়ই ভীষণ গুনাহ্। এরপর কী ? তিনি বললেন ঃ তোমার সন্তান তোমার সাথে আহার করবে- এই আশংকায় তাকে হত্যা করা। আমি বললাম ঃ এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা। (সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করাকে কিভাবে আল্লাহর সাথে শরীক করা ও নিষিদ্ধ প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার সাথে একত্রে স্থান দেয়া হয়েছে।

রাসূলের (সা) স্বপ্নের বিবরণ সম্বলিত যে হাদীসটি হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা) থেকে সহীহ আল-বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে তাতে রাসূল (সা) বলেন !

"জিবরীল ও মীকাইল (আ) আমার কাছে এল এবং আমি তাদের সাথে রওনা হলাম। যেতে যেতে আমরা বড় একটা চুল্লীর কাছে এসে পৌঁছলাম। সেই চুল্লীর উপরিভাগ সংকীর্ণ ও নিম্নভাগ প্রশস্ত। ভেতরে বিরাট চিৎকার ও হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল। আমরা চুল্লীটার ভেতরে উলংগ নারী ও পুরুষদেরকে দেখতে পেলাম। তাদের নিচ থেকে কিছুক্ষণ পর পর আগুনের এক একটা হলকা আসছিল আর তার সাথে সাথে আগুনের তীব্র দহনে তারা জোরে জোরে চিৎকার করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ওহে জিবরীল, এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ।" (সুহীহ আল বুখারী)

"দোজখের সাতটি দরজা থাকবে"- পবিত্র কুরআনের সূরা হিজরের এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আতা (রহ) বলেন ঃ "উক্ত সাতটি দরজার মধ্যে সবচেয়ে বেশী উত্তাপময়, সবচেয়ে বেশী দুঃখ বিষাদে পরিপূর্ণ ও সবচেয়ে দুর্গন্ধময় দরজা হবে যারা জেনেশুনে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদের দরজা।"

মাকহুল দামাস্কী বলেন ঃ দোজখবাসীদের নাকে একটা উৎকট দুর্গন্ধ ভেসে আসবে। তারা বলবে, এমন সাংঘাতিক দুর্গন্ধ আমরা ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, ব্যভিচারীদের জননেন্দ্রিয় থেকে এ দুর্গন্ধ আসছে। তাফসীরের বিশিষ্ট ইমাম ইবনে যায়েদ বলেন ঃ ব্যভিচারীদের জননেন্দ্রিয়ের দুর্গন্ধ দোজখবাসীর জন্য বাড়তি কষ্ট বয়ে আনবে। আল্লাহ হযরত মূসাকে (আ) সর্বপ্রথম যে দশটি আয়াত দিয়েছিলেন তার একটি ছিল এরূপ ঃ "তুমি চুরি করোনা এবং ব্যভিচার করোনা। যদি কর তবে তোমার কাছ থেকে আমার চেহারা ঢেকে ফেলবো। আল্লাহর নবী মূসাকে (আ) যদি এরূপ কথা বলা হয়, তাহলে অন্যদের কী বলা হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ইবলীস তার বাহিনীকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়ার সময় বলে যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে সবচেয়ে বেশী গোমরাহ করতে পারবে, তার মাথায় আমি মুকুট পরাবো এবং তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেব। দিন শেষে এক একজন করে এসে ইবলীসের কাছে নিজের কৃতিত্বের বর্ণনা দিতে থাকে। কেউ বলে ঃ আমি অমুককে কুপ্ররোচনা দিয়ে দিয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে উদ্বুদ্ধ করেছি এবং সে তালাক দিয়েছে। ইবলীস বলে ঃ "তুমি তেমন কিছু করনি। সে আর এক মহিলাকে বিয়ে করবে।" অতঃপর অপরজন এসে বলে ঃ আমি অমুককে ক্রমাগত কুপ্ররোচনা দিয়ে দিয়ে তার সাথে তার ভাই-এর শত্রুতা বাধিয়ে দিয়েছি। ইবলীস বলে ঃ "তুমি তেমন কিছু করনি। ওদের ভেতরে অচিরেই আপোষ হয়ে যাবে।" অতঃপর আর একজন এসে বলে ঃ আমি

অমুককে এক নাগাড়ে প্ররোচনা দিতে দিতে ব্যভিচার করিয়ে ছেড়েছি। এ কথা শুনে ইবলীস তাকে অভিনন্দন জানায় এবং বলে ঃ তুমি একটা কাজের মত কাজ করেছ বটে। অতঃপর তাকে কাছে ডেকে নিয়ে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তান ও তার চেলা চামুন্ডার কবল থেকে রক্ষা করুন!

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূল (সা) বলেন ঃ ঈমান একটি উত্তম পোশাক, যা আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন পরিধান করান। কিন্তু কোন বান্দা ব্যভিচার করলে তার কাছ থেকে তিনি ঈমানের পোশাক কেড়ে নেন। অতঃপর তওবা করলে তাকে ঐ পোশাক ফিরিয়ে দেন। (বায়হাকী, তিরমিযী, আবু দাউদ ও হাকেম)

অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা ব্যভিচার বর্জন কর। কেননা এর ছয়টি শাস্তি রয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি ইহকালে ও তিনটি পরকালে প্রকাশ পায়। যে তিনটি শাস্তি ইহকালে হয় তা হলো, তার চেহারার উজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়, তার আয়ুষ্কাল সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং তার দারিদ্র চিরস্থায়ী হয়। আর যে তিনটি আখেরাতে প্রকাশ পায় তা হলো, সে আল্লাহর অসন্তোষ, কঠিন হিসাব ও দোজখের আযাব ভোগ করবে। (বায়হাকী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদ খাওয়া অব্যাহত রাখতে রাখতে মারা যায় আল্লাহ তাকে গাওতা নামক ঝর্ণার পানি পান করাবেন। গাওতা হচ্ছে ব্যভিচারনী নারীদের যোনিদেশ থেকে নির্গত পুঁজ ও দূষিত তরল পদার্থের ঝর্ণা যা দোজখে প্রবাহিত থাকবে। (আহমাদ)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার পর নিষিদ্ধ নারীর সাথে সহবাস করার মত বড় গুনাহ আর নাই। (আহমদ, তাবারানী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ দোজখে একটা হ্রদ রয়েছে ।তাতে বহু সংখ্যক সাপ বাস করে। প্রতিটি সাপ উটের ঘাড়ের সমান মোটা। সেই সাপগুলো নামায তরককারীকে দংশন করবে। একবার দংশনেই তার দেহে সত্তর বছর পর্যন্ত বিষক্রিয়া থাকবে। অতঃপর তার গোশত ঝরে পড়বে। এ ছাড়া দোজখে আরো একটা হ্রদ আছে, যাকে 'দুঃখের হ্রদ' বলা হয়। তাতে বহু সাপ ও বিচ্ছু বাস করে। প্রতিটি বিচ্ছু এক একটা খচ্চরের সমান। তার সত্তরটা হুল রয়েছে। প্রত্যেক হুল বিষে পরিপূর্ণ। সেই বিচ্ছু ব্যভিচারীকে দংশন করবে এবং তার সমস্ত বিষ তার দেহে ঢেলে দেবে। ফলে সে এক হাজার বছর পর্যন্ত বিষের যন্ত্রণা ভোগ করবে। অতঃপর তার গোশত খসে পড়বে এবং তার জননেন্দ্রিয় থেকে পুঁজ নোংরা তরল পদার্থ নির্গত হবে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করবে সে ও উক্ত নারী কবরে সমগ্র মুসলিম উম্মাতের অর্ধেক আযাব ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তার স্বামীকে তার সৎ কর্মের বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন যে, তার স্ত্রী যে কুকর্ম করেছে, সেটা সে জানতো কিনা। যদি জেনে থাকে এবং ঐ কুকর্ম ঠেকাতে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতের দরজার ওপর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে রেখেছেন যে, দায়ূসের জন্য জান্নাত হারাম। দায়ূস হলো সেই ব্যক্তি, যার পরিবারে অশ্লীল কার্যকলাপ চলতে থাকে, অথচ সে তা জেনেও চুপ থাকে এবং বন্ধ করার কোন পদক্ষেপ নেয় না।

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন নিষিদ্ধ নারীকে খারাপ ইচ্ছা নিয়ে স্পর্শ করবে, কিয়ামাতের দিন সে এমনভাবে আসবে যে তার হাত তার ঘাড়ের সাথে যুক্ত থাকবে। সে যদি উক্ত নারীকে চুমু দিয়ে থাকে, তবে তার ঠোঁট দুটিকে আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হবে। আর যদি তার সাথে ব্যভিচার করে থাকে তবে তার দুই উরু সাক্ষ্য দেবে যে, আমি অবৈধ কাজের জন্য আরোহণ করেছিলাম। আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবেন। এতে সে অপমান বোধ করবে এবং গোয়ার্তুমি করে বলবে ঃ আমি করিনি। তখন তার জিহবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। জিহবা বলবে! "আমি অবৈধ বিষয়ে কথা বলেছিলাম।" তার হাত সাক্ষ্য দেবে যে, "আমি অবৈধ জিনিস ধরেছিলাম।" অতঃপর চক্ষু বলবে ঃ "আমি অবৈধ জিনিসের দিকে তাকাতাম।" তার পা দুখানা বলবে ঃ "আমি অবৈধ জিনিসের দিকে গমন করতাম।" তার লজ্জাস্থান বলবে ঃ "আমি ব্যভিচার করেছি।" প্রহরী ফেরেশতা বলবে ঃ "আমি শুনেছি।" অপর ফেরেশতা বলবে ঃ "আর আমি লিখেছি।" আর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন "আমি জেনেছি এবং লুকিয়ে রেখেছি।" অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন ঃ "হে ফেরেশতাগণ! ওকে পাকড়াও কর এবং আমার আযাব ভোগ করাও। কেননা যে ব্যক্তির লজ্জা কমে যায় তার ওপর আমার ক্রোধ বেড়ে যায়।"

উল্লেখিত হাদীসের সত্যতা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ

"যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহবা, হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে ঃ যে তারা দুনিয়ার জীবনে কী করতো।" (সূরা আন্ নূর)

সবচেয়ে জঘন্য ধরনের ব্যভিচার হলো মুহাররম অর্থাৎ চিরনিষিদ্ধ নারীদের সাথে সংগম করা। এদের মধ্যে রয়েছে মা, খালা, বোন, মেয়ে ইত্যাদি। রাসূল (সা)

বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মুহাররম নারীর সাথে ব্যভিচার করবে, তাকে তোমরা হত্যা কর।"

হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) হযরত বারার মামাকে এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে এস। কেননা সে নিজের সৎ মাকে বিয়ে করেছিল।" (হাকেম)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই ঘৃণ্য মহাপাপ থেকে রক্ষা করুন। আর যারা এই পাপে লিপ্ত, তাদেরকে তওবা করার তওফীক দিন ও তাদেরকে ক্ষমা করুন।

ব্যভিচার প্রতিরোধে শরীয়তের ব্যবস্থা

মানব সমাজকে মিশ্র প্রজাতি থেকে মুক্ত রেখে সুস্থ ও নির্ভেজাল বংশীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহ ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। আর এই ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামী শরীয়ত পর্দা নামক এক বিস্তারিত বিধান দিয়েছে। এই বিধান অনুসারে নারীদেরকে সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অনাবৃতভাবে ঘরের বাইরে বিচরণ, পুরুষদের সাথে বেপর্দাভাবে একত্রে শিক্ষা গ্রহণ ও কাজ করা, স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্য যে কোন দুজন বয়স্ক নারী ও পুরুষের একত্রে নির্জনে অবস্থান করা, নারীদের গলার আওয়াজ বিনা-প্রয়োজনে ভিন্ন পুরুষকে শুনতে দেয়া, অশ্লীল গান, বাজনা ও অশ্লীল সাহিত্য, নাটক ও সিনেমা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষতঃ পুরুষ ও নারী উভয়কে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি সংবরণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আন নূরে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। . . . মুমিন নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।"

এক হাদীসে আছে ঃ "কোন বেগানা স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দিলে কেয়ামতের দিন তার চোখে গলিত শীসা ঢালা হবে।" অপর হাদীসে আছে ঃ "দৃষ্টি দেয়া চোখের যিনা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা জিহবার যিনা, অবৈধভাবে কাউকে স্পর্শ করা হাতের যিনা, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া পায়ের যিনা, খারাপ কথা শোনা কানের যিনা এবং যিনার কল্পনা ও আকাংখা করা মনের যিনা। অতঃপর লজ্জাস্থান একে পূর্ণতা দেয়া অথবা অসম্পূর্ণ রেখে দেয়।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

হাদীসে আরো আছে ঃ দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের একটি বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি একে সংযত রাখবে, আল্লাহ তার মনকে ইবাদাতের প্রকৃত স্বাদ দান করবেন, যা সে

কিয়ামত পর্যন্ত ভোগ করতে থাকবে।

মোদ্দাকথা, যে সব জিনিস ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করে, সেগুলিও ব্যভিচারের ন্যায় কবীরা গুনাহ্। — অনুবাদক

১২. সমকাম ও যৌন বিকার

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় হযরত লুত (আ) এর জাতির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন সূরা হুদে বলেন ঃ

"অতঃপর যখন আমার সিদ্ধান্ত কার্যকর হলো তখন আমি তাদের দেশটির উপরিভাগ নিচে এবং নিম্নভাগ ওপরে ওঠালাম এবং তার ওপর পাকা পাথর (যা আগুনে পুড়ে ইটের মত হয়ে গেলো) অবিরাম ধারায় নিক্ষেপ করলাম। পাথরগুলি ছিল সুচিহ্নিত। (অর্থাৎ তাতে এমন আলামত ছিল যে, দেখলেই চেনা যেত যে, তা পৃথিবীর পাথর নয়।) ওগুলো তোমার প্রভুর কাছেই ছিল। (অর্থাৎ তাঁর সেই কোষাগারে ছিল, যার কোন কিছুই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ব্যবহৃত হয়না।) বস্তুতঃ এই শাস্তি অত্যাচারীদের কাছ থেকে দূরে নয়। (অর্থাৎ এই উম্মাতের লোকেরাও যদি অনুরূপ ঘৃণ্য কাজ করে তাহলে তাদের যে শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল তা এদেরও হবে।) ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের ওপর যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশী আশংকা করি, তা হচ্ছে লূত এর জাতির জঘন্য কাজ। অতঃপর তিনি এই কাজে লিপ্তদেরকে তিনবার নিম্নরূপ অভিশাপ দেন ঃ "লূতের জাতির কাজ যে করে তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত!" আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "যাদেরকে তোমরা লূতের জাতির কাজে লিপ্ত পাও, তাদের দু'জনকেই হত্যা কর।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এলাকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে তাদেরকে ফেলে দিতে হবে এবং ফেলে দেয়ার সংগে সংগে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে, যেমন হযরত লূতের জাতির ওপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

মুসলমানদের মধ্যে এই ব্যাপারে ইজমা অর্থাৎ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, সমকাম একটা হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"পৃথিবীতে তোমরা কেবল পুরুষদের কাছেই আস এবং তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক যে জোড়া সৃষ্টি করেছেন তা ত্যাগ কর? আসলে তোমরা সীমা অতিক্রমকারী (অর্থাৎ হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামের সীমায় প্রবেশকারী) সূরা আশ শুয়ারা)

আল্লাহ তায়ালা অপর এক আয়াতে স্বীয় নবী হযরত লূত (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ "আর আমি তাকে সেই জনপদ থেকে রক্ষা করেছি, যে জনপদ অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। ঐ জনপদবাসীরা দুরাচারী পাপিষ্ঠ ছিল।" (সূরা আল আম্বিয়া)

তাদের ঐ জনপদের নাম ছিল সদোম। জনপদের অধিবাসীরা যে সব অশ্লীল কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকতো, কুরআনে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা পুরুষদের মল দ্বারে সংগম করতো এবং প্রকাশ্য সমাবেশ স্থলে নানা রকম পাপাচারে লিপ্ত হতো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিম্নোক্ত কাজগুলিকে লূত জাতির কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন ঃ মহিলাদের পুরুষদের মত ছোট করে এবং পুরুষদের মহিলাদের মত বড় করে চুল রাখা, জামার বোতাম খুলে রাখা, বন্দুক চালানো, পাথর নিক্ষেপ করা, উড়ন্ত কবুতর নিয়ে খেলা করা, আংগুল মুখে দিয়ে শিষ দেয়া, পায়ের গিরে ফোটানো, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো, পোশাকের নিম্নাংশ ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা রাখা, মদ খাওয়া, পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর সংগম। (উল্লেখ্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস এ কাজগুলিকে লূত জাতির কাজ বলে এটাই বুঝিয়েছেন যে, তারাই এগুলির প্রথম উদগাতা। এগুলির মধ্যে বন্দুক চালানো ছাড়া আর সব কয়টি সর্বসম্মতভাবে অবৈধ কিংবা অশালীন কাজ। বন্দুক চালানোর কাজটিও নিয়মিত সরকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিশেষ আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত অনুমোদনযোগ্য নয়। - অনুবাদক)

তাবারানীতে উদ্ধৃত এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ নারীদের পারস্পরিক সংগম ব্যভিচারের শামিল। তাবারানী ও বাইহাকীতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেনঃ চার ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর গযব ও আক্রোশের আওতায় থাকে ঃ মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ব বেশভূষা গ্রহণকারী পুরুষ, পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা গ্রহণকারী মহিলা, জীবজন্তুর সাথে সংগমকারী এবং সমকামী। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "যখন কোন পুরুষ অপর পুরুষে উপগত হয়, তখন আল্লাহর গযবের ভয়ে আল্লাহর আরশ কাঁপতে থাকে এবং আকাশ পৃথিবীর ওপর ভেংগে পড়ার উপক্রম হয়। ফেরেশতারা আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হওয়া পর্যন্ত আকাশকে তার প্রান্তসীমায় ধরে রাখে এবং সূরা ইখলাস পড়তে থাকে।"

রাসূল (সা) বলেন ঃ সাত ব্যক্তির ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশের

আদেশ দেবেন ঃ সমকামীদের, জীবজন্তুর সাথে সংগমকারী, কোন মহিলা ও তার কন্যাকে এক সাথে বিবাহকারী, এবং হস্তমৈথুনকারী। তবে তওবা করলে তারা সবাই ক্ষমা পেতে পারে।"

আরো বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন এক শ্রেণীর লোক এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তাদের হাত ব্যভিচারের ফলে অন্তসত্তা থাকবে। দুনিয়ার জীবনে তারা হস্তমৈথুন করতো।" অপর এক হাদীসে আছে যে, দাবা ও পাশা জাতীয় খেলা, কবুতরের লড়াই, কুকুরের লড়াই, মেষ লড়াই, মোরগ লড়াই, পোশাক না নিয়ে গোসল খানায় প্রবেশ, এবং মাপে কম দেয়া-এ সব লূত এর জাতির কাজ। এ সব কাজ যারা করবে, তাদের কঠোর শাস্তি অবধরিত।"

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, কোন সমকামী বিনা তওবায় মারা গেলে কবরে শুকরের আকৃতি প্রাপ্ত হবে।

তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে আব্বাসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পুরুষ বা নারীর মল দ্বারে সংগম করবে, আল্লাহ তায়ালা তার দিকে তাকাবেন না।

কামভাবাপন্ন দৃষ্টিতে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বা কোন সুদর্শন যুবকের প্রতি তাকানোও একইভাবে ব্যভিচারের শামিল। কেননা ইতিপূর্বে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, কু-দৃষ্টি চোখের যিনা। জনৈক আরব কবি বলেছেন ঃ

"সকল ঘটনার সূচনা হয় দৃষ্টি থেকেই, যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিংগ থেকে বড় বড় অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকরের নির্দেশে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ জনৈক পেশাদার সমকামীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আরো বর্ণিত আছে যে, একবার আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল রাসূল (সা) এর নিকট এলো। তাদের ভেতরে এক দাড়ি গোঁপহীন কিশোরও ছিল। রাসূল (সা) কিশোরকে নিজের পেছনের দিকে বসালেন এবং বললেন ঃ দৃষ্টির কারণেই হযরত দাউদ (আ) দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন।

একবার হযরত সুফিয়ান সাওরীর নিকট এক কিশোর এলো। তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ একে আমার সামনে থেকে সরাও। কারণ আমি স্ত্রীলোকদের সাথে একজন করে শয়তান দেখি, আর কিশোরদের সাথে দেখি দশজনেরও বেশী সংখ্যক শয়তান।

একবার হযরত ঈসা (আ) কোথাও যাওয়ার সময় পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে আগুনে দগ্ধীভূত হতে দেখলেন। তা দেখে তিনি পানি এনে আগুন নেভাতেই

আগুন একটি কিশোরে পরিণত হলো। আর লোকটি পরিণত হলো আগুনে। হযরত ঈসা (আ) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! এদের উভয়কে আসল অবস্থায় ফিরিয়ে নাও আমি তাদেরকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করবো। আল্লাহ তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলে দেখা গেল, একজন এক বয়স্ক পুরুষ এবং অপরজন একটি কিশোর। হযরত ঈসা (আ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের কী হয়েছিল? লোকটি বললো ঃ হে রুহুল্লাহ! আমি এই কিশোরের প্রেমে পড়ে তার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিলাম। পরে আমাদের উভয়ের মৃত্যুর পর আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে শাস্তি দিচ্ছেন যে, আমি কিছুক্ষণ আগুন হয়ে ছেলেটাকে পোড়াই। আবার কিছুক্ষণ পর ছেলেটা আগুন হয়ে আমাকে পোড়ায়। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।"

উল্লেখ্য যে, নিজের স্ত্রীর সাথে মল দ্বারে সংগম করা অথবা ঋতুবতী অবস্থায় সংগম করাও হারাম ব্যভিচারের শামিল। কেননা, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে ঋতুবতী অবস্থায় সংগম করে অথবা পশ্চাদ দ্বারে সংগম করে সে অভিশপ্ত।"

আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে এই মহাপাপ থেকে রক্ষা করুন।

১৩. সুদের আদান প্রদান

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়না। আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করবে।" (সূরা আলে ইমরান) আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন ঃ "যারা সুদ খায় তারা কেবল সেই ব্যক্তির মত দাঁড়ায় যাকে শয়তান নিজের স্পর্শ দ্বারা উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছে।" (অর্থাৎ তারা কিয়ামতের দিন কবর থেকে উঠবার সময় শয়তানের স্পর্শে উন্মাদ হয়ে যাওয়া মানুষের মত উঠবে।)" এর কারণ এইযে, তারা বলতো ঃ ব্যবসা তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা)

অর্থাৎ আল্লাহ যে জিনিস হারাম করেছেন তাকে তারা হালাল মনে করে নিয়েছে। অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন মানব জাতিকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন সবাই কবর থেকে উঠে দ্রুত বেগে দৌড়াতে থাকবে। কিন্তু সুদখোররা তা পারবেনা। তারা মাতাল ব্যক্তির ন্যায় একবার উঠবে একবার পড়বে। যখনই উঠবে, অমনি পড়ে যাবে। কেননা তারা দুনিয়ায় নিষিদ্ধ সুদ খেয়েছিল। আর সেই হারাম খাদ্যকে আল্লাহ পেটের ভেতর বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে এত ভারী করে দেবেন যে, তারা যখনই উঠতে যাবে পড়ে যাবে। অন্য সবার সাথে তাল মিলিয়ে তারাও দৌড়াতে চাইবে

কিন্তু পারবেনা।

ইমাম কাতাদা (রহ) বলেন ঃ সুদখোর কিয়ামতের দিন উন্মাদ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। এই উন্মাদ অবস্থা সুদখুরীর আলামত হিসাবে কিয়ামতের মাঠে সকলের কাছে পরিচিত থাকবে।

ইমাম বায়হাকী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "মিরাজের রাত্রে আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের পেট এক একটি ঘরের মত প্রকান্ড। অত বড় পেট নিয়ে তারা ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারেনা। ফলে তারা চলতে গিয়ে নিজেদের পথ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। যে পথ দিয়ে ফেরাউন ও তার দলবলকে সকাল বিকাল দোজখের কাছে নেয়া হয়, ঐ লোকগুলি এক একবার সেই পথের ওপর চলে আসে এবং নির্বোধ ও শ্রবণশক্তিহীন বিপথগামী উটের মত চলতে থাকে। এই বড় ভুড়ি ওয়ালা লোকগুলো যখন টের পায় যে, ফিরআউন ও তার দলবলকে আনা হচ্ছে, তখন তারা উঠি পড়ি করে পালাতে চায়। কিন্তু পেট নিয়ে নড়তে না পারায় তারা রাস্তা ছেড়ে সরে যেতে পারেনা। ফলে ফিরআউন ও তার দলবল এসে তাদের ওপর চড়াও হয় এবং একবার পেছনের দিকে ও আরেকবার সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় ও নিয়ে আসে। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তারা এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। রাসূল (সা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে জিবরীল, এরা কারা? তিনি বললেন ঃ ওরা সুদখোর, যারা শয়তানের স্পর্শে উন্মাদ হয়ে যাওয়া লোকের মত চলে।"

ইমাম আহমাদ বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ মিরাজের রাত্রে আমি আমার মাথার ওপরে সপ্তম আকাশে প্রচন্ড তর্জন গর্জনের শব্দ শুনতে পেলাম। চোখ মেলে তাকালে দেখলাম, সেখানে কিছু লোক রয়েছে, যাদের ভুড়ি তাদের সামনে বেরিয়ে আছে। ভুড়িগুলো বড় বড় এক একটা ঘরের মত। সেই সব ঘরে হাজার হাজার সাপ ও বিচ্ছু। এ সব পেটের বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? জিবরীল বললেন ঃ ওরা সুদখোর।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু ইয়া'লা ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ কোন জাতি যখন ব্যভিচার ও সুদে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করার অনুমতি দেন। আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত যে, কোন জাতি যখন কৃপণতা করতে থাকে। সুদের ভিত্তিতে কায়কারবার চালাতে থাকে। ষাড়ের দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ

করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর এমন দুর্যোগ নামান যে, তারা দীনের পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত তা থেকে আর নিষ্কৃতি পায়না।

ইবনে মাজাহ, বাযায, বায়হাকী ও হাকেম বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "কোন সমাজে সুদের প্রচলন হলে সেখানে পাগলের সংখ্যা বেড়ে যাবে, ব্যভিচারের প্রচলন হলে মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে এবং মাপে কম দেয়ার প্রথা চালু হলে আল্লাহ্ তায়ালা সেখানে বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন। এটা অবধারিত।"

সহীহ আল-বুখারীতে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সুদখোর মৃত্যু পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত রক্তে পরিপূর্ণ লাল নদীতে সাঁতার কেটে আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং তাকে পাথর গেলানো হতে থাকবে। ঐ নদী হচ্ছে তার দুনিয়ায় উপার্জিত হারাম সম্পদ যার মধ্যে তাকে হাবুডুবু খেতে বাধ্য করা হবে। আর যে আগুনের পাথর তাকে গেলানো হবে তাহলো তার হারাম খাদ্য খাওয়ার শাস্তি। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এই শাস্তি দেয়া হবে এবং সেই সাথে তার ওপর অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে। অপর এক বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে না দেয়াকে আল্লাহ্ তায়ালা নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেন। তারা হলোঃ মদখোর, সুদখোর, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারী এবং পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলাকারী- যতক্ষণ না তারা তাওবাহ্ করে।"

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, একদল ইহুদী যেমন শনিবারে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও চক্রান্ত করে সমুদ্রের কিনারে বড় বড় গর্ত খুড়ে রাখতো, শনিবারে সেই গর্তে মাছ পড়ে থাকতো এবং রবিবারে তারা তা ধরে আনতো এবং এই চক্রান্তের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ যেমন তাদেরকে বাঁদর ও শুকর বানিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি সোজা পথে সুদ খেতে না পেরে যারা নানা রকমের ছলছুতো ও ধোকার মাধ্যমে সুদ খায়, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে কিয়ামতের দিন বাঁদর ও শুকর বানিয়ে ওঠাবেন। কেননা তাদের কোন ফন্দিফিকির ও ধোকাবাজী আল্লাহ্ তায়ালার কাছে গোপন থাকবেনা। বিশিষ্ট তাবেয়ী আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেছেন ঃ একটি শিশুকে যেমন ধোকা দেয়া হয়, সুদখোররা তেমনি আল্লাহ্ তায়ালাকে ধোকা দিতে চায়। তা না করে তারা যদি সোজা পথে সুদ খেত, তাহলে হয়তো তাদের আযাব কিছু হালকা হতো।

তাবরানী, ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সুদের ৭০টি গুনাহ। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো আপন মাকে বিয়ে করার গুনাহর সমান। আর সবচেয়ে জঘন্য সুদ হলো, সুদের পাওনা আদায় করতে

গিয়ে কোন মুসলমানের সম্ভ্রম নষ্ট করা বা তার সম্পত্তি জবর দখল করা।

বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন সুদখোর যদি এক দিরহাম পরিমাণও সুদ আদায় করে তবে তার গুনাহ ৩৬ বার ব্যভিচার করার সমান।

ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সুদের ৭০টি গুনাহ। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ্ হচ্ছে আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান।

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা) ৭টি গুনাহকে "সর্বনাশা গুনাহ" নামে আখ্যায়িত করেছেন ও তা থেকে আত্মরক্ষা করতে বলেছেন। এই সাতটির মধ্যে সুদ খাওয়া অন্যতম।

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক-সকলের ওপরই অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। (সহীহ্ মুসলিম ও সুনানুত্ তিরমিযী)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির কাছে যদি তোমার কোন ঋণ প্রাপ্য থেকে থাকে এবং সে যদি কোন উপহার পাঠায় তবে তা গ্রহণ করোনা। কেননা সেটা সুদ। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ তোমার কাছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে যদি তুমি কিছু খাও তবে তা সুদ।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ঋণ থেকে কোন লাভ পাওয়া যায় তা সুদ। সুনানু আবু দাউদে বর্ণিত যে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করলো, অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাকে কোন উপহার পাঠালো এবং সুপারিশকারী তা গ্রহণ করলো, সে একটি গুরুতর ধরনের সুদের কারবার করলো।

১৪. ইয়াতীমের (পিতৃহারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা) সম্পত্তি আত্মসাত করা ও তার ওপর জুলুম করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে খায়, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ঢুকায়না। অচিরেই তারা জাহান্নামে জ্বলবে।" আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ "তোমরা ইয়াতীমের সম্পত্তির কাছেও যেয়না। তবে সর্বোত্তম পন্থায় তাদের বয়োপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তদারকী করতে পার।"

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মিরাজের রাত্রে আমি এমন কিছু লোককে দেখলাম, যাদের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে অপর কতক লোক। যারা তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা ঐ

লোকদের মুখের চোয়াল খুলে হা করাচ্ছে, আর অপর কয়েকজন জাহান্নাম থেকে আস্ত আস্ত পাথরের টুকরো এনে তাদের গলায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সংগে সংগে পাথরগুলো তাদের মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে জিবরীল। এরা কারা? তিনি বললেন ঃ যারা ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাত করে তারা। তারা কেবল আগুনই খেয়ে থাকে।

হযরত আবু হুরাইরাহ বর্ণনা করেন যে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে এমন অবস্থায় কবর থেকে ওঠাবেন যে, তাদের পেট থেকে আগুন বেরুবে এবং তাদের মুখ থেকে আগুনের উদ্গীরন হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে রাসূল! ওরা কারা? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালার এ কথাটা তুমি পড়নি যে, "যারা ইয়াতীমদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাত করে তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ভক্ষণ করেনা?"

ইমাম সুদ্দী (রহ) বলেন ঃ অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাতকারী যখন কিয়ামতের মাঠে সমবেত হবে, তখন তার মুখ, নাক, কান ও চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে থাকবে। তাকে যে-ই দেখবে সে চিনবে যে, এ ব্যক্তি ইয়াতীমের সম্পত্তি গ্রাসকারী।

অভিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন ঃ ইয়াতীমের অভিভাবক যদি দরিদ্র হয় এবং সে তার স্বার্থ দেখাশুনা ও তার সম্পত্তি উন্নতি ও প্রকৃতির কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন এবং যে পরিমাণ গ্রহণ করা সমকালীন সমাজে প্রচলিত ও ন্যায়সংগত ততটুকু গ্রহণ করতে পারে। এর চেয়ে বেশী গ্রহণ করলেই তা অবৈধ ও হারাম হবে। আল্লাহ তায়ালা ইয়াতীমের অভিভাবক সম্পর্কে বলেন ঃ

"যে ধনী, সে যেন সংযত থাকে। আর যে দরিদ্র, সে যেন ন্যাসংগত পরিমাণে ভক্ষণ করে।"

এই ন্যায়সংগত পরিমাণটা কি, সে সম্পর্কে একাধিক মতামত রয়েছে। প্রথম মত এইযে, এটা ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় মত এইযে, যতটুকু তার জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজন ততটুকু ভক্ষণ করা যাবে এবং মোটেই অপচয় বা অপব্যয় করা চলবেনা। তৃতীয় মত এই যে, অভিভাবক শুধু তখনই পারিশ্রমিক নিতে পারবে যখন সে ইয়াতীমের জন্য কোন কাজ করে এবং ঐ কাজের পরিমাণের সাথে সংগতি রেখেই নিতে পারবে। চতুর্থ মত এই যে, সে যখন তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে কেবল তখনই নিতে পারবে। সচ্ছল হলে নেবে না। আর সচ্ছল না হলে নিতে পারবে। এই চারটি মত আল্লামা ইবনুল জাওযী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "আমি ও ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো।" এই বলে তিনি হাতের দুই আঙ্গুল একত্রিত করেন। সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "ইয়াতীম চাই সে আপন হোক বা পর হোক তার ভরণপোষণকারী ও আমি জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলের মত থাকবো।" এই বলে তিনি দুটি আঙ্গুল দেখান। ইয়াতীমের ভরণপোষণ বলতে বুঝায় তার দায়দায়িত্ব বহন করা, তার ধনসম্পদ থেকে থাকলে তা থেকে তার খাদ্য ও পোষাক ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং ঐ সম্পদ যাতে উত্তরোত্তর বাড়ে তার ব্যবস্থা করা। আর যদি তার কোন সম্পদ না থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদ থেকে তার ভরণপোষণ করা। হাদীসে যে "আপন ও পর" কথাটা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, সে আত্মীয় হোক কিংবা কোন অপরিচিত কেউ হোক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অভিভাবক তার দাদা, ভাই, মা, চাচা, মায়ের পরবর্তী স্বামী, মামা, অথবা অন্য কোন আত্মীয় হলে সে তার আপনজন। নচেত সে পর।

তিরমিযী শরীফে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ইয়াতীম শিশুকে নিজের পানাহারের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং উক্ত ইয়াতীমকে আল্লাহ সচ্ছল ও স্বাবলম্বী না করা পর্যন্ত এভাবে রাখে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবধারিত করবেন। তবে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ করলে তার কথা স্বতন্ত্র। মুসনাদে আহমাদে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ ছাড়া যে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানোর আর কেউ নেই, সেই ইয়াতীমের মাথায় যে হাত বুলায়, তার হাতের পরশ পাওয়া প্রতিটি চুলের বদলায় সে এক একটি পুণ্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, সে আর আমি এভাবে (একত্রে) জন্নাতে থাকবো।"

এক ব্যক্তি হযরত আবুদ্‌দারদাকে (রা) বললো ঃ আমাকে উপদেশ দিব। তিনি বললেন ঃ ইয়াতীমের প্রতি দয়ার্দ হও, তাকে কাছে টেনে নাও এবং নিজের খাদ্য থেকে তাকে খাওয়াও। কেননা একবার এক ব্যক্তি রাসূলকে (সা) জানালো যে, তার হৃদয় খুবই কঠিন। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি যদি চাও যে তোমার হৃদয় কোমল হোক, তাহলে ইয়াতীমকে নিজের নিকটবর্তী কর, তার মাথায় হাত বুলাও এবং নিজের খাদ্য থেকে তাকে খাওয়াও। এসব করলে তোমার হৃদয় কোমল হয়ে যাবে এবং তোমার সকল প্রয়োজন মিটে যাবে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের জনৈক মহাপুরুষ বলেন ঃ আমি প্রথম যৌবনে মদ্যপান ও নানা ধরনের পাপাচারে লিপ্ত ছিলাম। এই সময়ে একদিন পথিপার্শে

একটি অনাথ ইয়াতীম বালককে দেখতে পেয়ে তাকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম এবং তাকে পুত্রবৎ আদর যত্ন সহকারে গোছল করিয়ে ভালো পোশাক পরিয়ে আহার করালাম।

এরপর রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি যেন কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে এবং আমাকে হিসাব নিকাশের জন্য ডাকা হয়েছে। হিসাব নিকাশের পর আমাকে আমার পাপকর্মের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যখন জাহান্নামের ফেরেশতারা আমাকে চরম লাঞ্ছিত ও অসহায় অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য টানাহেচড়া শুরু করেছে, তখন সহসা দেখি, সেই ইয়াতীম ছেলেটি সামনে এসে আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। সে বললো ঃ হে ফেরেশতাগণ! ওঁকে ছেড়ে দাও। আমি আমার প্রভুর নিকট ওঁর জন্য সুপারিশ করবো। কারণ উনি আমার অনেক উপকার করেছেন। ফেরেশতারা বললেন ঃ আমাদেরকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি। এই সময় হঠাৎ একটি গায়েবী আওয়ায এলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলছেন ঃ ওহে ফেরেশতারা! তোমরা ওকে ছেড়ে দাও। কেননা সে ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার করার কারণে আমি উক্ত ইয়াতীমকে তার জন্য সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছি। তিনি বলেন ঃ এই সময় আমার ঘুম ভেংগে গেল। আমি যে সমস্ত পাপকাজে তখনো লিপ্ত ও অভ্যস্ত ছিলাম, সেই সমুদয় পাপাচার থেকে তাওবাহ করলাম। অতঃপর ইয়াতীমদের সেবায় আমার সর্বাত্মক চেষ্টা নিয়োজিত করলাম।

বস্তুতঃ এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আনাস (রা) মালেক বলেন ঃ যে বাড়ীতে ইয়াতীমের যত্ন নেয়া হয় তা সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়ী। আর যে বাড়ীতে কোন ইয়াতীমের ওপর উৎপীড়ন চলে, তা সবচেয়ে খারাপ বাড়ী। আর যে বান্দা কোন ইয়াতীম বা বিধবার উপকার ও সেবা করে সে আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম বান্দা।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদকে (আ) ওহির মারফত বলেছিলেন ঃ হে দাউদ! ইয়াতীমের জন্য দরদী পিতার মত হয়ে যাও। আর বিধবার জন্য স্নেহময় স্বামীর মত হয়ে যাও। আর জেনে রাখ যে, যেমন বীজ তুমি বপন করবে, তেমনই ফসল পাবে। অর্থাৎ তুমি অন্যের সাথে যেমন আচরণ করবে তোমার মৃত্যুর পর তোমার ইয়াতীম সন্তান ও বিধবা স্ত্রীর সাথেও তেমনি আচরণ করা হবে। দাউদ (আ) মুনাজাতে বলেছিলেন ঃ হে আমার মনিব! যে ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীম ও বিধবাকে সাহায্য করে, তার প্রতিদান কিরূপ? আল্লাহ তায়ালা জবাব দিলেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন আমার আরশের

ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবেনা, সেই দিন তাকে আরশের ছায়ার নিচে রাখবো।

ইয়াতীম ও বিধবার সেবার মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, একবার জনৈক অনারব মুসলমান সপরিবারে হিজরত করে বলখে উপনীত হন। তারা প্রথমে খুবই সচ্ছল ও সুখী ছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী ও ইয়াতীম ছেলেমেয়েরা দারিদ্রের কবলে পড়েন। বিধবা মহিলা নিজের দৈন্য দশা ঘুচানো ও শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশীদের ব্যংগবিদ্রূপ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য একটি শহরে চলে গেলেন। একটি পরিত্যক্ত মসজিদে ছেলেমেয়েদেরকে রেখে মহিলা তাদের জন্য খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। এই সময়ে দুইজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হয়। একজন ছিলেন স্থানীয় মুসলমান এবং শহরের মেয়র। অপরজন অগ্নি উপাসক এবং শহরের নিরাপত্তা কর্মকর্তা। তিনি প্রথমে শহরের মেয়রের কাছে নিজের দুর্দশার নিম্নরূপ বর্ণনা দিলেন ঃ আমি একজন মুসলিম বিধবা মহিলা। আমার কয়েকটি ইয়াতীম ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাদেরকে একটি পরিত্যক্ত মসজিদে রেখে এসেছি। আজকের রাতের জন্য তাদের খাদ্য অন্বেষণ করছি। মেয়র বললেন ঃ তুমি আগে প্রমাণ কর যে, তুমি একজন মুসলিম সতীসাধবী মহিলা। মহিলা বললেন ঃ আমি বিদেশিনী। এখানে আমাকে কেউ চেনেনা। এ কথা শুনে মেয়র তাকে উপেক্ষা করে চলে গেল। মহিলা তার কাছ থেকে ভগ্ন মনে বিদায় নিয়ে অগ্নি উপাসক নিরাপত্তা কর্মকর্তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাকে তার সমস্ত কথা খুলে বললেন। তিনি মুসলিম মেয়রের সাথে তার সাক্ষাতের বিবরণও তাকে শোনালেন। নিরাপত্তা কর্মকর্তা তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে বাড়ীর ভেতর গিয়ে এক মহিলাকে পাঠালেন এবং উক্ত মহিলার মাধ্যমে আগন্তুক মহিলা ও তার ছেলেমেয়েদেরকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। অতঃপর তাদেরকে পরম তৃপ্তি সহকারে আহার করালেন, উত্তম পোশাক পরালেন এবং রাত্রের জন্য সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করলেন।

রাত দুপুরের দিকে মুসলিম মেয়র স্বপ্নে দেখলেন যেন কিয়ামত শুরু হয়েছে এবং সবুজ যমরুদ পাথরের তৈরী একটি প্রাসাদোপম ভবনের সামনে পতাকা হাতে স্বয়ং রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়র জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে রাসূল! এই প্রাসাদটি কার? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী একজন মুসলিম নেতার। সে বললো ঃ আমি তো আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী একজন মুসলিম

নেতা। রাসূল (সা) বললেন ঃ আগে প্রমাণ দাও যে, তুমি একজন তাওহীদবাদী সত্যিকার মুসলমান। এ কথা শুনে সে হতচকিত হয়ে গেল। রাসূল (সা) পুনরায় বললেন ঃ রাত্রে জনৈকা মহিলা যখন নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে সাহায্য চেয়েছিল। তুমি বলেছিলে যে, আগে প্রমাণ দাও যে তুমি মুসলমান। তেমনি তোমাকেও এখন প্রমাণ দিতে হবে যে তুমি একজন মুসলমান।

এই স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠে মেয়র অস্থির হয়ে পড়লো এবং চারদিকে লোক পাঠিয়ে উক্ত মহিলার অনুসন্ধান চালাতে লাগলো। অবশেষে সে জানতে পারলো যে, মহিলা উক্ত অগ্নি উপাসক নিরাপত্তা কর্মকর্তার বাড়ীতে আছে। সে সেখানে গিয়ে তাকে বললো ঃ যে মুসলিম মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে তোমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে, তাকে পাঠাও। সে বললো ঃ আমি তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে বিপুল কল্যাণ ও বরকত লাভ করেছি। সুতরাং তাকে আমি বিদায় করতে পারবোনা। মেয়র বললো ঃ আমি এক হাজার দীনার দিচ্ছি। তুমি তাদেরকে আমার হাতে সোর্পদ কর। সে বললো ঃ না, সেটা আমার দ্বারা অসম্ভব। সে আরো বললো ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার জন্য বিরাট প্রাসাদ তৈরী হয়ে আছে আমরা তাই সপরিবারে এই মুসলিম মহিলার নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছি।

এই জন্য সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইয়াতীম ও বিধবাদের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট থাকে, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমার মনে হয়, রাসূল (সা) এ কথাও বলেছেন যে, সে ব্যক্তি অবিরাম নামায ও রোযা পালনকারীর সমতুল্য।

১৫. আল্লাহ ও রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা

সূরা আয্-যুমারে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে।" হাসান বাসরী বলেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপকারী হচ্ছে তারাই, যারা বলে ঃ আমরা ইচ্ছা হলে অমুক কাজ করবো, না হলে করবোনা। এতে আমাদের কোন শাস্তি হবেনা। আল্লামা ইবনুল জাওযী স্বীয় তাফসীরে বলেনঃ আলেমদের একটি দলের অভিমত এইযে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে তো মানুষ পুরোপুরি কাফের ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালাল এবং হালাল করা জিনিসকে হারাম ঠাওরানো নির্জলা কুফরী কাজ। তাকে নিছক কবীরা গুনাহ বলা চলেনা।

কাজেই আল্লাহ ও রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা নিশ্চয়ই এই জাতীয় অপবাদ আরোপ থেকে ভিন্ন ধরনের কিছু হবে।

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান করে নেয়। সহীহ মুসলিমের আরেকটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে তা মিথ্যা, সে একজন মিথ্যুক।

সহীহ মুসলিমের অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করা অন্যদের ওপর মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। আমার ওপর যে মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে নিজের বাসস্থান করে নেয়। রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উক্তি বলে কোন কথা প্রচার করে অথচ সেই কথাটা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়। রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ মুমিনের স্বভাবের মধ্যে আর যত দোষই থাক, থাকতে পারে। কিন্তু মিথ্যাচার ও খিয়ানত বিশ্বসঘাতকতা ও অন্যের গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাত করা তার মধ্যে থাকতে পারেনা।

১৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন

"শত্রুবাহিনী যখন মুসলিম বাহিনীর দ্বিগুণের চেয়ে বেশী না হয়, তখন তাদের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ। তবে রণকৌশল হিসাবে কিংবা মুজাহিদের কোন দল বা তাদের সমগ্র বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে পলায়ন করলে সেটা কবীরা গুনাহ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি যুদ্ধের দিন শত্রুদের মুকাবিলা থেকে পালাবে, সে আল্লাহর গযবে পতিত হবে এবং তার প্রত্যাবর্তন স্থল হবে জাহান্নাম। আর তা বড়ই জঘন্য জায়গা। তবে যদি কেউ রণকৌশল হিসাবে অথবা কোন সেনাদলের সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে পলায়ন করে তবে সেটা ভিন্ন কথা।" (আল আনফাল)

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুমলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে যে সাতটি সর্বনাশা কবীরা গুনাহর উল্লেখ করা হয়েছে, রণাংগন থেকে পলায়ন তার অন্যতম।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ যখন এই আয়াত নাযিল হলো যে, "তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি তৈরী হয়, তবে তারা দুইশো জনের ওপর বিজয়ী হবে" তখন আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন যে, মুসলিম বাহিনীতে যদি বিশজন থাকে এবং শত্রুবাহিনীতে দুইশো জন থাকে, তাহলে মুসলিম বাহিনীর

কেউ পালাতে পারবেনা। এরপর এ আয়াত নাযিল হলো যে, "এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দায়িত্বের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বল লোক রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি একশো জন ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকে, তবে তারা দুইশো জনের ওপর বিজয়ী হবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে। আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।" এই শেষোক্ত আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন যে, মুসলিম বাহিনীতে যখন একশো এবং শত্রু বাহিনীতে দুইশো যোদ্ধা থাকবে, তখন মুসলমানদের পলায়ন নিষিদ্ধ। (সহীহ আল বুখারী)

[এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, শত্রুদের শক্তি যেখানে মুসলমানদের দ্বিগুণেরও বেশী, সেখানে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া জরুরী নয় এবং কোন না কোন পন্থায় যুদ্ধ বিরতি বা সন্ধি করা জায়েজ। — অনুবাদক]

১৭. শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর যুলুম ও প্রতারণা এবং তার সমর্থন ও সহযোগিতা করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ 'একমাত্র সেই সব লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা আশ শুরা)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ "তুমি কখনো ভেবনা যে, আল্লাহ অত্যাচরীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন। তিনি তো তাদের বিচার শুধুমাত্র এমন একটি দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করছেন, যেদিন চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হবে, লোকেরা মাথা নত করে ছুটতে থাকবে, নিজেদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরবেনা এবং তাদের হৃদয়গুলো থাকবে শূন্য।" (সূরা ইবরাহীম)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ "যারা অত্যাচার চালিয়েছে, তারা অচিরেই জানতে পারবে তারা কী পরিণতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।" (আশ্ শুরা)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ "তারা নিজেদের কৃত অপকর্ম থেকে পরস্পরকে নিষেধ করতো না। এটা ছিল তাদের জঘন্যতম আচরণ।" (আল মায়েদা)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (সহীহ মুসলিম) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে। (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে'আত তিরমিযী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেক

শাসক এবং প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হবে কিভাবে শাসন করেছ।" (সহীহ আল বুখারী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ যে শাসকই তার প্রজাকে ধোকা দেবে সে জাহান্নামবাসী হবে। (তাবরানী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ আল্লাহ যার শাসনাধীন কিছু প্রজাকে ন্যস্ত করেছেন, অতঃপর সে তার হিত কামনা দ্বারা তাদেরকে উপকৃত করেনা, তার ওপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দেবেন। (সহীহ আল বুখারী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তির শাসনে আল্লাহ কিছু প্রজাকে অর্পণ করেছেন অথচ সে তাদের সাথে প্রতারণা করতে থাকে এবং প্রতারণা করতে করতে মারা যায়, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দেবেন।" (সহীহ আল বুখারী)

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "জনগণের ওপর শাসন পরিচালনা করে এমন প্রত্যেক শাসককেই কিয়ামতের দিন আটক করা হবে এবং একজন ফেরেশতা তার ঘাড় ধরে রাখবে। আল্লাহ যদি তাকে বলেন যে, ওকে ফেলে দাও, তবে সেই ফেরেশতা তাকে ফেলে দেবে এবং সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (আহমাদ, ইবন মাজাহ) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ ন্যায় বিচারক বিচারপতিও কিয়ামতের দিন এমন একটি মুহূর্তের সম্মুখীন হবে, যখন সে আক্ষেপ করবে যে, দুইজনের মধ্যে কোন একটি খোরমা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব মেটাতেও তার না যাওয়া ভাল ছিল। (আহমাদ) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ দশজন মানুষের শাসককেও কিয়ামতের দিন পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে, অতঃপর হয় তার কৃত সুবিচার ও সুশাসন তাকে মুক্ত করবে, নচেত তার কৃত অবিচার ও দুঃশাসন তাকে ধ্বংস করে দেবে। (আহমাদ ও ইবনে হাব্বান)

রাসূল (সা) এভাবে দোয়া করতেন ঃ হে আল্লাহ! যার ওপর এই উম্মাতের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয় অতঃপর সে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে, তার প্রতি আপনি সদয় হোন, আর যে তাদের ওপর কঠোরতা করে, তার প্রতি আপনিও কঠোরতা করুন। (সহী মুসলিম, সুনানু নাসায়ী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব আল্লাহ যাকে অর্পণ করেন, অতঃপর সে তাদের অভাব ও দৈন্য না মিটিয়ে গা ঢাকা দেয়, আল্লাহ তায়ালাও তার অভাব ও দৈন্য না মিটিয়ে গা ঢাকা দেবেন। (সুনানু আবু দাউদ, আল জামে আত তিরমিযী)

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ পৃথিবীতে অচিরেই পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী শাসকদের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাচারকে মেনে নেবে এবং তাদের অত্যাচারকে সমর্থন যোগাবে, সেও আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই। সে কখনো হাউজ কাউসারে আসার সুযোগ পাবেনা। (আহমাদ, তিরমিযী,

নাসায়ী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ আমার উম্মাতের দুই শ্রেণীর মানুষ আমার শাফায়াত কখনো পাবেনা, অত্যাচারী ও ধোকাবাজ শাসক এবং ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারী। এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হবে এবং এদের ব্যাপারে কেউ কোন দায়দায়িত্ব স্বীকার করবেনা। (তাবারানী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী আযাব ভোগ করবে অত্যাচারী শাসক। (তাবারানী) অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ হে মানবমন্ডলী, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। নচেৎ এমন এক সময় আসবে, যখন তোমরা দোয়া করলেও আল্লাহ্ তা কবুল করবেন না এবং তোমরা ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। জেনে রেখ, ইহুদী আলেমরা এবং খৃস্টান সংসার ত্যাগীরা সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা থেকে বিরত হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ওপর তাদের নবীদের মাধ্যমে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের ওপর সর্বব্যাপী বিপদ মুসিবত নাযিল করেন।

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের ওপর দয়ালু নয়, আল্লাহ্ তার ওপর দয়া করেন না। (সহীহ্ আল বুখারী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা ন্যায় বিচারক শাসককে কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। সেদিন তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। (সহীহ্ আল বুখারী ও সহী মুসলিম) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ সেই সব ন্যায় বিচারক কিয়ামতের দিন জ্যোতির্ময় মিম্বরের ওপর অধিষ্ঠিত থাকবে যারা নিজের অধস্তনদের ওপর পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনের ওপর এবং জনগণের ওপর শাসন পরিচালনার সময় ন্যায়বিচার করবে। (সহীহ্ মুসলিম ও নাসায়ী)

হযরত মা'য়াজকে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় রাসূল (সা) তাকে বলেন ঃ সাবধান, জনগণের মূল্যবান ধনসম্পদ রক্ষা করবে, আর মাযলুমের দোয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। কেননা আল্লাহর ও মাযলুমের দোয়ার মাঝে কোন পর্দা থাকেনা। (সহীহ্ আল বুখারী) সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন যে, তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের মধ্যে একজন হলো মিথ্যাবাদী শাসক। তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা নেতৃত্বের প্রতি লোভাতুর থাকবে অথচ নেতৃত্ব তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিন অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (সহীহ আল বুখারী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি এই দায়িত্ব এমন কারো ওপর অর্পণ করবো না, যে তা চাইবে বা তার আকাংখা করবে। (সহীহ্ আল বুখারী)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ হে কা'ব ইবনে আজরা, আল্লাহ তোমাকে মূর্খ ও নির্বোধ লোকদের শাসন থেকে রক্ষা করুন। আমার পরে এমন শাসকরা ক্ষমতাসীন হবে, যারা আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবেনা। (আহমাদ) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক হতে চায় অতঃপর সেই পদে নিয়োগ লাভ করে, অতঃপর তার অবিচারের চেয়ে সুবিচারের মাত্রা বেশী হয়, তার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে। আর যার সুবিচারের চেয়ে অবিচারের মাত্রা বেশী হয় তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত রয়েছে। (সুনানু আবী দাউদ) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ একজন শাসককে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের ওপর ছুঁড়ে মারা হবে। এর ফলে পুলটি এত জোরে ঝাঁকুনী খাবে যে, তার জোড়গুলো খুলে স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। ঐ শাসক যদি আল্লাহর অনুগত হয়, তাহলে এর পরও সে ঐ পুল পার হয়ে যাবে। আর যদি সে আল্লাহর অবাধ্য হয়, তবে তাকে নিয়ে পুলটি ভেংগে পড়বে এবং সে ৫০ বছরের দূরত্বে অবস্থিত জাহান্নামের গহবরে নিক্ষিপ্ত হবে।

আমর ইবনুল মুহাজির বলেন ঃ হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয আমাকে বলেছিলেন ঃ "যখন দেখবে আমি সত্যের পথ থেকে দূরে সরে গেছি, তৎক্ষণাত আমার কলার টেনে ধরে বলবে যে, ওহে উমর, তুমি এ কী করছ?"

অতএব, হে জুলুমবাজ, অত্যাচারী শাসক! মনে রেখ, তোমার কারাগার হচ্ছে জাহান্নাম এবং মহা প্রভু আল্লাহই তোমার চূড়ান্ত বিচারক। সেখানে তুমি কোন ওজর আপত্তি পেশ করতে পারবেনা। ভয়াবহ কবর হবে তোমার হাজতখানা। আর দীর্ঘস্থায়ী হিসাব নিকাশ ও জবাবদিহির জন্য তোমাকে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং নিজেকে সেই শাস্তি থেকে বাঁচাও। আর ওহে মজলুম, মনে রেখ, জালিমকে বিন্দুমাত্রও ছাড় দেয়া হয়না। যদি দেখ, কোন জালিম এত প্রভাবশালী হয়ে গেছে যে, তাকে আর প্রতিহত করা যাচ্ছেনা, তবে তাকে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবে, হয়তো রাতের মধ্যেই কোন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যাবে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে সে কিছুতেই নিস্তার পাবেনা।

১৮. অহংকার

নিজেকে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা, অন্যদেরকে নিজের তুলনায় ক্ষুদ্র ও অধম জ্ঞান করতঃ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তার প্রতি অবাধ্য হওয়া ও আদেশ অমান্য করা - এ সবই অহংকারের লক্ষণ ও তার আওতাভুক্ত। পবিত্র কুরআনে একাধিক জায়গায় অহংকারের নিন্দা ও অহংকারীর প্রতি ধিক্কার ঘোষিত হয়েছে। যেমন সূরা আল

মু'মিনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

"মূসা বললো ঃ আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে, যে হিসাবের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা।" সূরা আন্-নাহলে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" সূরা আল-বাকারাতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম ঃ আদমকে সিজদা কর। সকলেই সিজদা করলো। কেবল ইবলিস করলোনা। সে অস্বীকার ও অহংকার করলো। সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" এ দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহর আদেশকে যে অহংকার বশতঃ অমান্য করে, আল্লাহর প্রতি তার ঈমান থাকলেও তাতে কোন লাভ হবে না। ইবলিসের ন্যায় সে কাফের বলে গণ্য হবে। সূরা লুকমানে বলা হয়েছে ঃ "মানুষের প্রতি মুখ ভেংচি দিয়োনা, ভ্রুকুটি করোনা এবং যমীনের ওপর অহংকার ভরে চলাফেরা করোনা। আল্লাহ কোন অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।"

একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "অহংকার আমার পোশাক। এই পোশাক যে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।" (সহীহ্ মুসলিম)

রাসূল (সা) বলেন ঃ "অহংকারী স্বৈরাচারীদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষুদ্র কণার আকৃতিতে ওঠানো হবে। লোকেরা তাদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করবে এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর কেবল লাঞ্ছনা ও অপমানই আসতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের বোলাস নামক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মাথার ওপর আগুন জ্বলতে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামবাসীর মলমূত্র, ঘাম, কাশি ইত্যাদি খেতে দেয়া হবে।" (সুনানু নাসায়ী, জামেআত তিরমিযী)

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ যার অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (সহীহ্ মুসলিম) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্কে লিপ্ত হবে। জান্নাত বলবে ঃ আমার এ কী দশা যে, মানব সমাজের দুর্বল ও পতিত শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কেউ আমার ভেতরে প্রবেশ করে না? আর জাহান্নাম বলবে ঃ আর আমাকে যত সব স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ সময় আল্লাহ্ তাদের বিতর্কের মীমাংসা করে বলবেন ঃ হে জান্নাত! তুমি আমার রহমতের প্রতীক। আমি যাকে ইচ্ছা করি, তাকে তোমার মাধ্যমে রহমত দিয়ে থাকি। আর ওহে জাহান্নাম! তুমি আমার আযাবের প্রতীক। তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা আযাব দিয়ে

থাকি। তবে তোমাদের উভয়কেই কানায় কানায় পূর্ণ করা হবে।" (সহীহ মুসলিম)

ইতিহাস সাক্ষী যে, সর্বপ্রথম আল্লাহর নাফরমানী করা হয়েছিল যে গুনাহের আশ্রয় নিয়ে সেই গুনাহটি ছিল অহংকার। ইবলিসই এই অপরাধ সংঘটিত করেছিল।

হযরত সালমা ইবন আল-আকওয়া' বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর সামনে বাম হাত দিয়ে আহার করলো। তিনি বললেন ঃ ডান হাত দিয়ে খাও। সে বললোঃ আমি ডান হাত দিয়ে খেতে পারি না। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি যেন আর পারও না।" তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তার ডান হাত দিয়ে খেতে না পারার কারণ অহংকার ছাড়া আর কিছু নয়।" অতঃপর সে আর কখনো মুখের কাছে হাত তুলতে সক্ষম হয়নি। (সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) বলেন ঃ কে জাহান্নামবাসী তাকি আমি তোমাদেরকে বলবো না? সবাই এক বাক্যে বললো ঃ হাঁ, বলুন। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়, কৃপণ ও অর্থগৃধ্নু এবং অহংকারী ব্যক্তি। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) রাসূল (সা) আরে বলেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে চলাফেরা করে এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, সে যখন আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত করবে, তখন তাঁকে তার ওপর ক্রুদ্ধ দেখবে।" (তাবারানী)

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ প্রথম যে তিন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে তারা হলো বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখলকারী ও জালিম শাসক, যাকাত আদায়ে অবহেলাকারী বিত্তশালী এবং অহংকারী দরিদ্র। সহীহ আল বুখারীতে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ দৃষ্টি দেবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এই তিন ব্যক্তি হচ্ছে ঃ পায়ের গিরে বা পাতা পর্যন্ত গড়িয়ে পড়া পোশাক পরিধানকারী। কাউকে দান করে বা উপকার করে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যে কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়কারী। পায়ের পাতা পর্যন্ত পোশাক গড়ানো অহংকারের আলামত বলে গন্য হয়ে থাকে। তাই রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পায়ের গিরের নিচে যে পোশাক পরা হবে তা জাহান্নামে যাবে।

মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞান ও বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পদমর্যাদার উচ্চতা নিয়ে বড়াই করা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের অহংকার। যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে জ্ঞান বিশেষতঃ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে, সে অহংকারী হতে পারেনা। সে সব সময় নিজের মনের ওপর পাহারা বসিয়ে রাখে এবং কড়া নজর রাখে। এ ব্যাপারে

শৈথিল্য দেখা দিলেই মনে অহংকার আসবে এবং সঠিক পথ থেকে তাকে বিচ্যুত করে ফেলবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ যে অহংকার করে তাকে আমি আমার আয়াতসমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখবো। অর্থাৎ অহংকার মানুষের হেদায়াতের পথ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি অহংকার করা ও মুসলমানদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে এবং জ্ঞানার্জনের পর তাদেরকে বোকা ঠাওরায়, সে সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের অহংকারে লিপ্ত হয়।

১৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দান

পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরকানে মুমিনদের অপরিহার্য গুণাবলীর মধ্যে একটি বলা হয়েছে ঃ "যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।" সূরা হজ্জে ইরশাদ হয়েছে ঃ "তোমরা মিথ্যা থেকে আত্মসংবরণ কর।" হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "মিথ্যা সাক্ষ্য দান শিরকের সমান।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, তাবারানী)

ইবনে মাজাহ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত সে পা নাড়াতেও পারবেনা।

মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা আসলে ৪টা বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হয়। প্রথমতঃ সে মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলে। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা অপব্যয়ী মিথ্যাবাদীকে হেদায়াত করেন না।" (সূরা আল মুমিন) দ্বিতীয়তঃ সে যার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তার ওপর যুলুম করে। কেননা এদ্বারা সে তার জান মাল অথবা সম্মানের ক্ষতি সাধন করে। তৃতীয়তঃ সে যার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তার ওপরও যুলুম করে। কেননা সে তার জন্য হারাম সম্পদ ভোগের ব্যবস্থা করে দেয়, ফলে তার জন্য জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রভাবে আমি যদি কাউকে অন্য কোন মুমিন ভাই-এর সম্পদ দেয়ার নির্দেশ দেই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা ঐ সম্পদ তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটা টুকরো।" (সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম) চতুর্থতঃ সে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে একটি নিষিদ্ধ সম্পদ, প্রাণ বা সম্ভ্রমের ওপর অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ বানিয়ে দেয়।

সহীহ আল বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ রাসূল (সা) বলেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ কী কী বলবোনা? শোনো, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়া, আর সাবধান, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সাবধান মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।" বর্ণনাকারী বলেন, শেষের কথাটি তিনি এতবার পুনরাবৃত্তি করেন যে, আমরা মনে মনে বলছিলাম

যে, আহা, উনি যদি এখন চুপ করতেন, তবে ভালো হতো।

২০. মদ্যপান

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল মায়েদায় বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া ও ভাগ্য গণনা শয়তানের নোংরা কাজ। এগুলিকে পরিহার করে চল। তাহলে তোমরা সাফল্য লাভ করবে। শয়তান শুধু তোমাদের মধ্যে ক্ষমতা ও বিদ্বেষ সংঘটিত করতে চায় মদ ও জুয়ার মধ্য দিয়ে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। তোমরা কি তাহলে বিরত থাকবে?"

সুতরাং এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে মদ পান করতে নিষেধ করেছেন এবং তা থেকে সাবধান করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেনঃ "তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কারণ ওটা সকল ঘৃণ্য কাজের জননী।" এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি মদ পরিত্যাগ করেনা, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে এবং এ জন্য সে আযাবের যোগ্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা আন্ নিসায় বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে এবং তার সীমা লংঘন করে, আল্লাহ তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "মদপানের নিষেধাজ্ঞা নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ একে অপরের কাছে গিয়ে বলতে থাকেন যে, মদকে হারাম করা হয়েছে এবং তাকে শিরকের সমপর্যায়ের গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তাবারানী ও হাকেম বর্ণিত এক হাদীস অনুসারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর মদ পানকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ গণ্য করতেন। এটা যে যাবতীয় নোংরা ও গর্হিত কাজের প্ররোচনার উৎস বা জননী, সে ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে উমার, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি শরীফে হযরত আনাস এবং আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত একাধিক হাদীসে মদ পানকারীর ওপর অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মাদক ও নেশাকর দ্রব্যই মদ এবং প্রত্যেক মদই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে মদ খাওয়ায় অভ্যস্ত থেকেছে এবং তওবা ছাড়াই মরে গেছে, সে আখিরাতে জান্নাতের পানীয় থেকে বঞ্চিত থাকবে। হাদীসটি সহীহ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ ও বায়হাকীতেও বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম ও নাসায়ীতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মাদক দ্রব্য সেবন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের ঘর্ম ও মলমূত্র পান করাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীস রাসূল (সা) বলেনঃ "মদ্যপায়ী ব্যক্তি মূর্তি পূজাকারীর সমান।"

সহীহ নাসায়ীতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "দুই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না ঃ পিতামাতার অবাধ্য ও মদ্যপায়ী।" অপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না ঃ মদ্যপায়ী, পিতামাতার অবাধ্য ও দায়ূস।" দায়ূস হলো সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সদস্যদেরকে অসৎ কর্মে লিপ্ত জেনেও বাধা দেয় না।

রাসূল (সা) বলেন ঃ "তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয়না এবং কোন সৎ কর্ম উর্দ্ধে আরোহন করে না। পলাতক গোলাম যতক্ষণ তার মনিবের নিকট ফিরে না আসে, যে স্ত্রীর ওপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট-যতক্ষণ সে তার ওপর খুশী না হয়, আর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাওয়া ব্যক্তি- যতক্ষণ তার হুশ ফিরে না আসে।"

মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এমন যে কোন মাদক দ্রব্যই মদ, চাই তা তরল পানীয় হোক বা শক্ত খাদ্য হোক, এবং শুকনো হোক কিংবা ভিজা হোক। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "মদ্যপায়ীর দেহে যতক্ষণ বিন্দুমাত্রও মদ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার নামায কবুল করবেন না।" অপর হাদীসে আছে ঃ "মদ্যপায়ীর কোন সৎ কর্মই আল্লাহ্ কবুল করেন না, আর মদ পানের কারণে মাতাল হয়ে যাওয়া ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। সে যদি তওবা করে আবার মদ পান করে, তবে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের গলিত তামা ভক্ষণ করাবেনই।" রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি মদ পান করলো, কিন্তু মাতাল হলো না, আল্লাহ্ তায়ালা ৪০ রাত পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন। আর যে মদ পান করে মাতাল হয়, আল্লাহ্ তার কোন সাদাকাহ ও সৎকাজ ৪০ রাত পর্যন্ত গ্রহণ করেন না। এই সময়ের মধ্যে সে মারা গেলে সে পৌত্তলিকের মত মরবে। আর আল্লাহ তাকে জাহান্নামীর মলমূত্র ও ঘাম পান করাবেন।"

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ পান করে না। পরে তওবা তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি যিনা করে কিংবা মদ পান করে। আল্লাহ তার কাছ থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেন, যেভাবে কোন ব্যক্তি তার জামা মাথার ওপর দিয়ে খুলে ফেলে।" (হাকেম)

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় মদ পান করে, সে ভোর পর্যন্ত

মুশরিক থাকবে। আর যে ব্যক্তি সকালে মদ পান করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুশরিক থাকবে।" রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "জান্নাতের ঘ্রাণ পাঁচশো বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। অথচ পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে যে খোঁটা দেয়, মদ্যপায়ী ও মূর্তি পূজারী এই ঘ্রাণ পাবেনা।" (তাবারানী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "মদ্যপায়ীকে জাহান্নামে ব্যভিচারী নারীদের যৌনাংগ থেকে নির্গত পানি পান করানো হবে।"

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা আমাকে রহমত ও হেদায়াত হিসাবে পাঠিয়েছেন। বাদ্যযন্ত্র ও জাহেলিয়াতের কর্মকান্ড উচ্ছেদ করার জন্য পাঠিয়েছেন। আমার প্রভু শপথ করেছেন যে, আমার কোন বান্দা এক কাতরা মদ পান করলেও তাকে আমি জাহান্নামের উত্তপ্ত পানি পান করাবো। আর যে বান্দা আমার ভয়ে মদ ত্যাগ করবে, আমি তাকে সর্বোত্তম সাথীদের সাথে জান্নাতের সম্ভ্রান্ততম স্থানে পানীয় পান করাবো।" (আহমাদ)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "মদের ওপর, মদ পানকারীর ওপর, যারা মদ পান করায় তাদের ওপর, মদের ক্রেতা, বিক্রেতা, উৎপাদনকারী, বহন-পরিবহনকারী, সংগ্রহকারী, সরবরাহকারী ও মদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগকারী সকলের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে।" (আবু দাউদ, আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স বলেন ঃ "মদখোররা রোগাক্রান্ত হলে তাদেরকে দেখতে যেয়োনা।" ইমাম বুখারী বলেন ইবনে উমার বলেন ঃ "মদখোরদেরকে সালাম করোনা।" রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "মদখোরদের সাথে ওঠাবসা করোনা। রোগাক্রান্ত হলে তাদেরকে দেখতে যেয়োনা। তাদের জানাযায় হাজির হয়োনা। মদখোর যখন কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবে, তখন তার জিহবা তার বুকের ওপর ঝুলতে থাকবে, তা থেকে লালা ঝরতে থাকবে, তাকে যেই দেখবে ঘৃণা করতে ও ধিক্কার দিতে থাকবে এবং সকলেই তাকে মদখোর হিসাবে চিনবে।"

মুসলিম মনীষীগণের কেউ কেউ বলেছেন ঃ "মদ্যপায়ী রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং তাকে সালাম করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, মদ্যপায়ী ফাসিক ও অভিশপ্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তবে সে তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।"

হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন যে, "আমার এক মেয়ে রোগাক্রান্ত হলে আমি তার চিকিৎসার জন্য খানিকটা মদ তৈরী করলাম। এই সময় রাসূল (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করে বললেন ঃ হে উম্মু সালামা! এ কি হচ্ছে? আমি বললাম! হে

আল্লাহর রাসূল! ওটা দিয়ে আমি আমার মেয়ের চিকিৎসা করছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যে জিনিসকে আমার উম্মাতের ওপর হারাম করেছেন, তাতে তার রোগ নিরাময়ের কোন গুণ রাখেননি।"

আবু মূসা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) এর নিকট একটি কলসীতে রক্ষিত কিছু রস আনা হলো। সেই রসে কিছুটা পচন ধরে গিয়েছিল। রাসূল (সা) বললেন ঃ "এই কলসিটাকে দেয়ালের সাথে ছুড়ে মারো। কারণ ওতে যে পানীয় রয়েছে, ওটা আল্লাহতে অবিশ্বাসী ও আখেরাতে অবিশ্বাসীদের পানীয়।"

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "যার বুকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত রক্ষিত আছে, সে মদ পান করলে কিয়ামতের দিন ঐ আয়াতের প্রতিটি অক্ষর তার কাছে বাদী হয়ে আসবে এবং আল্লাহর দরবারে তাকে আসামী হিসাবে দাঁড় করাবে। আর কিয়ামতের দিন আল কুরআন যার বাদী হবে, তার জন্য দুঃসংবাদ।"

রাসূল (সা) আর একটি হাদীসে বলেন ঃ "কোন দল দুনিয়াতে কোন নেশাকর দ্রব্য সেবনে ঐক্যবদ্ধ হলে জাহান্নামে আল্লাহ তাদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরকে উক্ত মাদক দ্রব্য সেবনে প্ররোচিত করার জন্য দোষারোপ করবে। প্রত্যেকে অপরকে বলবে ঃ তুমিই আমাকে এই নিষিদ্ধ জিনিস সেবনে উদ্বুদ্ধ করেছিলে।"

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি মদ পান করবে, জাহান্নামে আল্লাহ তাকে এমন মারাত্মক বিষ পান করাবেন যে, সেই বিষের পেয়ালা মুখের কাছে নেয়া মাত্রই এবং বিষ পান করার আগেই ঐ পেয়ালার ভেতরে তার মুখের গোশ্ত খসে পড়বে। আর বিষ পান করার পর তার দেহের সমস্ত গোশত ও চামড়া খসে পড়ে যাবে। তার দুর্গন্ধে সমগ্র জাহান্নামবাসী যন্ত্রণা ভোগ করবে। মনে রেখ, মদ পানকারী, মদ উৎপাদনকারী, পরিবহন ও সরবরাহকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী এবং এর বিক্রয়মূল্য ভোগকারী - সকলেই এর পাপের অংশীদার। তাদের নামায, রোযা, হজ্জ - কিছুই আল্লাহ কবুল করবেন না যতক্ষণ তারা তওবা না করে। তওবা না করে মারা গেলে আল্লাহ তাকে প্রতি ঢোক মদ পানের বিনিময়ে জাহান্নামের অধিবাসীদের রক্ত পূঁজ পান করাবেন। মনে রেখ, যে কোন নেশাকর ও মাদক দ্রব্য মদ হিসাবে গণ্য এবং মদ মাত্রেই হারাম।"

একটি হাদীসে আছে যে, মদখোরদেরকে দোজখের প্রহরীরা পুলসিরাতের ওপর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এবং দোজখে তাদেরকে যে নোংরা পানীয় পান করানো হবে, তা আকাশের ওপর পতিত হলে তার উত্তাপে গোটা আকাশ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ "কোন মদ্যপায়ী মারা গেলে তাকে একটি কাষ্ঠ খন্ডের ওপর শূলবিদ্ধ করে কবরস্থ কর। পরে কবর খুলে দেখ। যদি দেখতে পাও যে তার মাথা পশ্চিম দিক থেকে ফিরে যায়নি, তাহলে তাকে শূল থেকে খুলে স্বাভাবিকভাবে দাফন কর। নচেত তাকে শূলবিদ্ধ অবস্থায়ই রাখো।"

হযরত ফযীল ইবনে ইয়ায একবার তার মুমূর্ষ শিষ্যকে দেখতে গিয়ে তাকে কলেমা পড়তে বলেন। কিন্তু সে কলেমা পড়তে পারছিল না। তিনি বারবার তাকে কলেমা শেখালেন। কিন্তু সে বললো ঃ আমি কলেমা পড়তে পারছিনা। আর কলেমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ফযীল কাঁদতে কাঁদতে তার কাছ থেকে চলে গেলেন। অতঃপর কিছু দিন পর তাকে স্বপ্নে দেখলেন। দেখলেন তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ তোমার কলেমার জ্ঞান কিসে ছিনিয়ে নিয়েছিল? সে বললো ঃ একবার আমার অসুখ হয়েছিল। চিকিৎসক আমাকে চিকিৎসার জন্য মদ পান করতে বলেছিল। তাই আমি মদ পান করতাম। বস্তুতঃ চিকিৎসার্থে মদ পানকারীর যদি এই দশা হয়ে থাকে, তাহলে সখের বসে ও নেশার বশে মদ পানকারীর কী অবস্থা হবে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

মদ ছাড়াও কিছু তরল বা কঠিন আকৃতির মাদক দ্রব্য রয়েছে, যা খেলে বা পান করলে মাদকতা আসে, বিবেকবুদ্ধি ও মেজাজ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে পাল্টে যায়, আংশিক অথবা পুরোপুরি মাতলামীর সৃষ্টি করে, মাত্রাতিরিক্ত যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে ব্যভিচারে প্ররোচিত করে, স্বভাবে হিংস্রতা এনে গালিগালাজ, মারামারি বা দাংগা ফাসাদের উস্কানি দেয়, আর নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদাত থেকে সেবনকারীকে বিরত রাখে, এমন কি মাত্রারিক্ত সেবন করলে সেবনকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। গাজা, ভাং, আফিম, তাড়ি, হিরোইন, হাশিশ ও অনুরূপ দেশী-বিদেশী বস্তু মাদক দ্রব্য এর আওতাভুক্ত। এর সব কটিই হারাম। "সকল মাদক দ্রব্যই হারাম চাই তা পরিমাণে বেশী হোক বা কম হোক"- এই একটি দ্ব্যর্থহীন বাক্য দ্বারা রাসূল (সা) এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং মদখোরের শরীয়ত বিহিত শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত প্রত্যেক মাদকখোরেরেই প্রাপ্য।

একটি ঘটনা ঃ উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে এক যুবক ক্রন্দনরত অবস্থায় এসে বললো ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, আমি কবর খুঁড়ে মৃতদের কাফন চুরি করতাম। একটি কবর খুঁড়ে দেখি, তার ভেতরে শায়িত মানুষটি শুকরের আকৃতি ধারণ করে রয়েছে। আমি ভয়ে কবরটি ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় গায়েবী আওয়ায হলো ঃ "তুমি তো চলে যাচ্ছ।

এই লোকটাকে কেন শুকরে পরিণত করা হয়েছে জান?" আমি বললাম ঃ না। আমাকে বলা হলো ঃ "সে মদ খেত এবং তওবা না করেই মারা গেছে। তাকে এই অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত আযাব ভোগ করানো হবে।" আল্লাহ আমাদেরকে এই ভয়ংকর পাপ কাজ থেকে রক্ষা করুন।

২১. জুয়া

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, দেবতার নামে বেদীতে বলি দেয়া ও লটারী দ্বারা ভাগ্য গণনা শয়তানের নোংরা কাজ। এসব থেকে দূরে থাক। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। মদ ও জুয়ার মধ্য দিয়ে শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে ও নামায থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। তোমরা কি বিরত থাকবে?" (সূরা আল মায়েদা)

যে কোন ধরনের জুয়াই এই আয়াতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, চাই তা দাবা, তাস, পাশা, গুটি অথবা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা খেলা হোক। এটা আসলে অবৈধ পন্থায় মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ ও লুণ্ঠন করার আওতাভুক্ত। যাকে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল বাকারার এই আয়াতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন ঃ "তোমরা পরস্পরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় খেয়োনা।" রাসূল (সা) এক হাদীসে বলেছেন ঃ "কিছু লোক অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদে হস্তক্ষেপ করে। তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব।" (সহীহ আল বুখারী) সহীহ বুখারীর অপর এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কেউ যদি এরূপ প্রস্তাব বা দাওয়াত দেয় যে, এস তোমার সাথে জুয়া খেলবো, তবে তার (গুনাহ মাফের জন্য) সদকা করা উচিত।" বস্তুতঃ জুয়া সম্বন্ধে শুধু কথা বললেই যদি সদকা বা কাফফরা দিতে হয়, তবে কাজ করলে কী পরিণতি হতে পারে ভেবে দেখুন তো!

তাস ও দাবা ইত্যাদি খেলা যদি আর্থিক হারজিত থেকে মুক্ত হয় এবং নিছক চিত্তবিনোদনমূলক হয়, তবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে হারাম, কারো মতে হালাল। কিন্তু আর্থিক হারজিত যুক্ত থাকলে তা যে হারাম, সে ব্যাপারে সকল মাযহাবের আলেম ও ইমামগণ একমত। মারদ বা পাশা জাতীয় জুয়া খেলা হারাম হওয়া সম্পর্কে ইমামগণ একমত হয়েছেন। কেননা রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পাশা খেললো, সে যেন নিজের হাতকে শুকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে রঞ্জিত করলো।" (মুসলিম) সহীহ আল-বুখারী বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি পাশা খেলে, সে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করে।" হযরত ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ "পাশা খেলা এক ধরনের

জুয়া এবং তা শুকরের চর্বি দিয়ে পালিশ করার মত হারাম কাজ।"

দাবা খেলা ত অধিকাংশ আলেমের মতে হারাম, চাই তাকে কোন কিছু বন্ধক রাখা তথা আর্থিক হারজিতের বাধ্যবাধকতা থাক বা না থাক। তবে বন্ধক রাখা এবং হেরে যাওয়া খেলোয়াড়ের বন্ধক বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা, অন্য কথায় আর্থিক হারজিত যুক্ত থাকলে তা সর্বসম্মতভাবে জুয়া ও হারাম। বন্ধক রাখা ও আর্থিক হারজিত যুক্ত না থাকলেও অধিকাংশ আলেমের মতে দাবা খেলা হারাম। কেবলমাত্র ইমাম শাফেয়ী একে হালাল মনে করেন শুধু এই শর্তে যে, তা ঘরোয়াভাবে খেলা হবে এবং নামায কাযা অথবা অন্য কোন ফরয ওয়াজিব বিনষ্ট হওয়ার কারণ হবেনা। ইমাম নবাবী ইমাম শাফেয়ীর এই মতানুসারে ফতোয়া দিতেন। সেই সাথে তিনি পারিশ্রমিক বা পুরস্কারের বিনিময়ে দাবা খেলাকে জুয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে রায় দেন।

যে সমস্ত আলেম দাবা খেলাকে হারাম বলেন, তাদের প্রমাণ হলো সূরা আল মায়েদার তৃতীয় আয়াতের এই উক্তি ঃ "ওয়া আন তাসতাকসিমু বিল আযলাম।" ইমাম সুফিয়ান ও ওয়াকী ইবনুল জাররাহ ব্যাখ্যা দেন যে, 'আযলাম' অর্থ দাবা খেলা। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ শাতরান্জ বা দাবা হলো অনারবদের জুয়া। হযরত আলী (রা) একদিন দাবা খেলায়রত একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখে বললেন ঃ "তোমরা যা নিয়ে এরূপ ধ্যানে মগ্ন আছ এটি কী? এগুলো স্পর্শ করার চেয়ে জ্বলন্ত আগুন স্পর্শ করাও ভাল। আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি।" হযরত আলী (রা) আরো বলেন ঃ "দাবাড়ুর ন্যায় মিথ্যাবাদী আর কেউ নেই। সে বলে আমি হত্যা করছি। অথচ সে হত্যা করেনি। সে বলে, ওটা মরেছে। অথচ কোন কিছুই মরেনি।" হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ গুনাহগার ব্যক্তি ছাড়া কেউ দাবা খেলেনা। ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াহকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, দাবা খেলাতে আপনার মতে আপত্তি আছে? তিনি বললেন ঃ দাবা পুরোপুরি আপত্তিকর। তাঁকে বলা হলো ঃ দূর্গের সৈন্যরা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে দাবা খেলে। তিনি জবাব দিলেন ঃ এটি গুনাহর কাজ। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কারযী দাবা খেরা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ দাবা খেলার ন্যূনতম ক্ষতি এই যে, দাবাড়ু কিয়ামতের দিন বাতিল পন্থীদের সাথে সমবেত হবে।

হযরত ইবনে উমার (রা) দাবাকে পাশার চেয়েও খারাপ এবং ইমাম মালিক (রহ) দাবাকে পাশার সমপর্যায়ের এবং উভয়ে এ দুটিকে হারাম বলেছেন। ইমাম মালিক আরো বলেন ঃ আমি শুনেছি যে, হযরত ইবনে আব্বাস জনৈক

ইয়াতীমের সম্পতির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি ঐ সম্পত্তিতে দাবা খেলার সরঞ্জাম পেয়ে তা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। দাবা খেলা বৈধ হলে ইয়াতীমের সম্পত্তির এই ক্ষতি সাধন তার দ্বারা সম্ভবপর হতো না। হারাম বলেই তিনি এ কাজ করতে পেরেছিলেন - যেমন কোন ইয়াতীমের সম্পত্তিতে মদ থাকলে তা ঢেলে ফেলা ওয়াজিব। ইবরাহীম নাখয়ী (রহ) এর মতে দাবা একটি অভিশপ্ত খেলা। এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিন তাঁর সৃষ্টির প্রতি ৩৬০ (তিনশো ষাট) বার রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যে দাবা খেলে, সে এর একটি দৃষ্টিও পায়না।" হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "দাবা পাশা ও অন্যান্য অলসতা সৃষ্টিকারী খেলায় নিমগ্ন লোকদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিওনা। কেননা তারা যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন শয়তান তার দলবল নিয়ে তাদের মাঝে সমবেত হয়। যখনই কেউ খেলা ছেড়ে চলে যায়, শয়তান তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। কেননা শয়তান ও তার দলবল তাকে ঘৃণা করে, দাবাড়ুরা খেলা শেষে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে যায় তখন তারা মরা জন্তুর লাশ খেয়ে পেট ভরা কুকুরদের মত চলে যায়।" অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "দাবাড়ুরা কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব ভোগ করবে।"

২২. সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "যারা সতী ও সরলমনা মুমিন নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং সেই দিন তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, যেদিন তাদের জিহবা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।" (সূরা আন নূর) "যারা সতী নারীদের ওপর অপবাদ দেয়, অতঃপর চারজন সাক্ষী হাজির করেনা, তাদেরকে ৮০টি দোররা মারো এবং আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করোনা। তারাই হচ্ছে ফাসিক।" (সূরা আন নূর)

এ সব আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন সতী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার ও অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ আরোপকারী দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তার জন্য কঠিন আযাব নির্দ্ধারিত রয়েছে। পৃথিবীতে তার শাস্তি এই যে, তাকে ৮০টি দোররা (বিশেষভাবে সজ্জিত প্রহার দন্ড) মারা হবে এবং সে সত্যবাদী হলেও তার সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করা হবেনা। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রাসূল (সা) সাতটি বৃহত্তম কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন এবং এই সাতটির অন্যতম হচ্ছে সতী ও সরলমনা মুসলিম নারীদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ রটনা করা। অপবাদ রটনার বিভিন্ন পন্থা

রয়েছে, যেমন ঃ কোন নির্দোষ মুসলিম নারীকে এরূপ সম্বোধন করা "ওহে ব্যভিচারীনী, ওহে বেশ্যা, ওহে অসতী, অথবা তার স্বামীকে সম্বোধন করা, "ওহে ব্যভিচারীনীর বা বেশ্যার স্বামী, অথবা তার সন্তানকে বলা "ওহে হারামজাদা বা হারামজাদী, ওহে বেশ্যার সন্তান বা ব্যভিচারীনীর সন্তান" ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন স্ত্রী বা পুরুষ যার বিরুদ্ধেই করা হোক এবং যে ভাষাতেই করা হোক, আর সেই অভিযুক্ত পুরুষ বা স্ত্রী স্বাধীন বা দাসদাসী যাই হোক না কেন - অভিযোগ আরোপকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আবেদন সাপেক্ষে ৮০টি দোররা মারা হবে।

(ব্যভিচার ব্যতীত অন্যান্য পাপাচার সংক্রান্ত অপবাদ আরোপের বিষয়টি পরবর্তীতে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হবে। কেননা সেগুলি কবীরা গুনাহ্ হলেও সেগুলোর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন পার্থিব শাস্তি নির্দ্ধারিত নেই। - অনুবাদক)

পরিতাপের বিষয় যে, সাধারণতঃ অজ্ঞ মুসলমানেরা এ ধরনের অশ্লীল কথাবার্তা রটনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত হয় ও আযাব ভোগ করে। এ জন্য রাসূল (সা) মানুষের জিহবাকে সংযত রাখতে বলেছেন। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "লোকেরা বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে কোন কোন কথা বলে জাহান্নামের এত গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়, যার দূরত্ব সূর্যাস্তের স্থান ও সূর্যোদয়ের স্থানের মধ্যের দূরত্বের চেয়েও বেশী।" এ কথা শুনে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল বললেন ঃ "হে রাসূলুল্লাহ! আমাদের কথাবার্তার জন্যও কি আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে?" রাসূল (সা) বললেন ঃ "ওহে মুয়ায! মানুষের মুখ দ্বারা সংঘটিত পাপ ছাড়া আর কোন পাপ কি এমন আছে, যা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপের কারণ হবে?" রাসূল (সা) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে হয় নিরব থাকুক, না হয় ভালো কথা বলুক।" এছাড়া পবিত্র আল কুরআনের এ আয়াতটিতেও জিহবার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে ঃ "সে যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিখে রাখার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" (সূরা ক্বাফ) হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) রাসূলকে (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে? তিনি বলেন ঃ তোমার জিহবাকে সংযত রাখো, তোমার বাড়ীর প্রশস্ততা যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয় (অর্থাৎ অন্যের ভূমির প্রতি লোভ করোনা, তোমার গুনাহর জন্য কাঁদো, এবং মনে রেখ যে, নিষ্ঠুরমনা লোকেরা আল্লাহ থেকে সবচেয়ে বেশী দূরবর্তী।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে

অশ্লীল কথাবার্তা উচ্চারণকারী।" (তিরমিযী) এ হাদীস থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, অশ্লীল কাজে লিপ্ত লোকেরা তাহলে কত বেশী ঘৃণিত। তিনি আরো বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অংগ (জিহবা দাঁত ও খাদ্যনালী) এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী অংগকে (যৌনাংগ) সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নেবে, আমি তার জন্য জান্নাতেও দায়িত্ব নেব।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চরিত্রবান ও চরিত্রব্রতী লোকদের সম্মান রক্ষা এবং সমাজে অশ্লীলতার বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যেই ৪ জন চাক্ষুস সাক্ষী ব্যতীত ব্যভিচারের অভিযোগ প্রকাশ্যে উচ্চারণে এইরূপ কঠোর আইনগত কড়াকড়ি আরোপিত হয়েছে। এ দ্বারা প্রকৃত ব্যভিচারীদেরকে রক্ষা করা শরীয়তের উদ্দেশ্য নয়। (নাউজু বিল্লাহ) প্রকৃত অপরাধীদেরকে শাস্তি দানের জন্য যথাযথ নিয়মে আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

২৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাত করা

সরাসরি কোষাগার থেকে এবং যাকাতের তহবিল থেকে আত্মসাত করাও এর আওতাভুক্ত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আত তাওবা) "কোন নবীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাত করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আত্মসাত করবে, সে কিয়ামতের দিন আত্মসাতকৃত জিনিস সাথে নিয়ে হাজির হবে।" (আলে ইমরান)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূল (সা) ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ের ওপর একটা উট থাকবে এবং সেই উট ডাকতে থাকবে। তখন ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল "আমাকে উদ্ধার করুন। তখন আমি বলবো ঃ আমি তোমাকে কোন সাহায্যই করতে সক্ষম নই, তোমাকে আমি আগেই আল্লাহর বিধান জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ের ওপর একটা ঘোড়া থাকবে এবং তা উচ্চস্বরে ডাকতে থাকবে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে ঃ হে রাসূল! আমাকে উদ্ধার করুন। আমি বলবো, আমি তোমার কোন সাহায্য করতে সক্ষম নই, তোমাকে আগেই আল্লাহর বিধান জানিয়ে দিয়েছি। তোমাদের কাউকে আমি কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ে একটা ছাগল থাকবে এবং সেই ছাগল উচ্চস্বরে ডাকতে থাকবে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে ঃ হে রাসূল! আমাকে উদ্ধার করুন। আমি বলবো ঃ

আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে সক্ষম নই। আমি তোমাকে আগেই আল্লাহর বিধান জানিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ে চিৎকাররত কোন প্রাণী থাকবে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবোঃ হে রাসূল! আমাকে উদ্ধার করুন। আমি বলবো ঃ আমি তোমার কোন সাহায্য করতে সক্ষম নই। আমি তোমার কাছে আগেই আল্লাহর বিধান পৌছিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ের ওপর কাপড় চোপড়ের স্তূপ থাকবে এবং সে আমাকে বলবে ঃ হে রাসূল! আমাকে উদ্ধার করুন। কিন্তু আমি বলবো ঃ আমি তোমাকে সাহায্য করতে অক্ষম। আমি আগেই তোমার কাছে আল্লাহর বিধান পৌছিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ে নীরব বস্তু (স্বর্ণ রৌপ্য) থাকবে, এবং সে বলবে, হে রাসূল! আমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু আমি বলবো, আমি তোমাকে সাহায্য করতে অক্ষম। আমি আগেই তোমার কাছে আল্লাহর বিধান পৌছিয়ে দিয়েছে।" (সহীহ্ মুসলিম)

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি এই সকল বস্তু যুদ্ধলব্ধ (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ) হিসাবে আসার পর তা সরকারীভাবে বিতরণের আগেই অথবা বাইতুল মাল থেকে অথবা যাকাত হিসাবে সংগৃহীত হওয়ার পর তা থেকে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা দায়িত্বশীলের অনুমতি ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা তার ঘাড়ে চড়াও হবে। পবিত্র আল কুরআনে এই দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি আত্মসাত করবে, সে আত্মসাতকৃত জিনিস নিজের সাথে নিয়ে আসবে।"

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "সরকারেরর পক্ষে আদায়কৃত সম্পদের একটা সুই সুতোও যদি কারো কাছে থাকে, তবে তা জমা দিয়ে দাও। আত্মসাত করা থেকে বিরত থাক। কেননা আত্মসাতকারী কিয়ামতের দিন নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হবে।" ইবনুল্ লাতবিয়া নামক জনৈক সাহাবীকে একবার যাকাত সদকা আদায়ের কাজে নিয়োগ করা হয়। তিনি কিছু সদকার জিনিস আদায় করে রাসূলের (সা) কাছে উপস্থিত করেন। তিনি কিছু জিনিসকে দেখিয়ে বলেন এটা আপনাদের। আর কিছু জিনিসকে দেখিয়ে বলেন ঃ এটা আমাকে উপঢৌকন হিসাবে দেয়া হয়েছে। এ কথা শোনা মাত্র রাসূল (সা) মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে নিম্নরূপ ভাষণ দেন ঃ আল্লাহর কসম, তোমাদের কেউ যেন বিনা অধিকারে কোন জিনিস গ্রহণ না করে। তাহলে কিয়ামতের দিন সে ঐ জিনিসকে বহন করে হাজির হবে। যে ব্যক্তি সেদিন

নিজের ঘাড়ে চিৎকাররত উট, গরু বা ছাগল বহন করে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তাকে আমি চিনবোনা। অতঃপর হাত উঁচু করে বললেন "হে আল্লাহ! আমি কি তোমার নির্দেশ পৌছিয়ে দিয়েছি?" (অপর রেওয়াতে আছে যে, রাসূল (সা) আদায়কারীকে বলেছিলেন ঃ তুমি যদি সরকারী আদায়কারী হয়ে না যেতে এবং ঘরে বসে থাকতে, তাহলে কি কেউ তোমাকে উপঢৌকন দিত?) (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলের (সা) সাথে খাইবারে গিয়েছিলাম (অতঃপর তা আমাদের হাতে বিজিত হয়।) সেখানে আমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য পাইনি। আমরা শুধু খাদ্য দ্রব্য ও কাপড়-চোপড় পেয়েছিলাম। এরপর আমরা ওয়াদিউল কুরায় চলে গেলাম। রাসূল (সা) এর সাথে বণী জুযামের এক ব্যক্তি দেয়া একটি ভৃত্য ছিল। (সে বনী যুবাইব গোত্রের রিফায়া বিন এযীদ নামে পরিচিত ছিল।) আমরা যখন ওয়াদীতে যাত্রা বিরতি করলাম, সেই সময়ে রাসূলের (সা) ভৃত্যটি কাফেলার উষ্ট্রবহরে অবস্থান করেছিল। এই সময়ে কোথা থেকে নিক্ষিপ্ত একটি তীরে বিদ্ধ হয়ে সে মারা যায়। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূল! লোকটির কী সৌভাগ্য যে, শহীদ হয়ে গেল। রাসূল (সা) বললেন । "কখনো নয়। যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি সে একটি কম্বল গনিমতের সম্পদ থেকে তুলে নিয়েছে। অথচ ওটা তাকে সরকারীভাবে বিতরণ করা হয়নি। ঐ কম্বল তার দেহে আগুন হয়ে জ্বলবে।" এ কথা শুনে সাহাবীগণ ভীষণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং যার কাছে একটা বা দুটো জুতোর ফিতে ছিল, তাও তিনি এনে জমা দেন (এবং বলেন ঃ আমি এটা খাইবারের যুদ্ধের দিন পেয়েছি।) রাসূল (সা) বলেন ঃ একটা কিংবা দুটো জুতোর ফিতে আগুনের অন্তর্গত। (মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজাহ, বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, একবার এক সফরে রাসূলের (সা) মালপত্রের পাহারায় কিরকিরা নামক এক ব্যক্তিকে রাখা হয়। সে মারা গেলে রাসূল (সা) বলেন, সে দোজখবাসী। লোকেরা তাকে দেখতে গেলে দেখতে পেল, সে একটি আলখেল্লা আত্মসাত করেছে। হযরত যায়দ বিন খালেদ জুহানী (রা) বলেন যে, খাইবারের যুদ্ধে এক ব্যক্তি কোন দ্রব্য আত্মসাত করে। পরে সে মারা গেলে রাসূল (সা) তার জানাযা পড়েননি। তিনি বললেন, তোমাদের এই সংগীটি আল্লাহর পথের সম্পদ আত্মসাত করেছে। আমরা তার জিনিসপত্র তল্লাশী করে দুই দিরহাম মূল্যের একটি রেশমী বস্ত্র পেলাম, যা যুদ্ধে

ইহুদিদের কাছ থেকে হস্তগত হয়েছিল। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আত্মসাতকারী ও আত্মহত্যাকারী ছাড়া রাসূল (সা) আর কারো জানাযা পড়া থেকে বিরত থেকেছেন বলে আমার জানা নেই। রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "কর্মচারীদের প্রাপ্ত উপহার আত্মসাতের পর্যায়ভুক্ত।" (সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া যেমন নামায কবুল করেননা, তেমনি আত্মসাতকৃত সম্পদের সদকাও গ্রহণ করেননা। (সহীহ মুসলিম)

আত্মসাত সম্পর্কে আরো বহু হাদীস রয়েছে। সে সব হাদীসের কতক যুলুম (অত্যাচার) সংক্রান্ত অধ্যায়ে আসবে। যুলুমকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ এক, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হরণ। দুই, কাউকে হত্যা, প্রহার ও আহত করার মাধ্যমে যুলুম করা। তিন, গালিগালাজ, অভিসম্পাত, গীবত ও মিথ্যা অপবাদ দানের মাধ্যমে কারো ইজ্জতের ওপর যুলুম করা। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সা) এই সব কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেছিলেন ঃ "মনে রেখ! তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত তোমাদের কাছে পবিত্র যেমন এই শহরে এই মাসে আজকের দিন পবিত্র।" (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

২৪. চুরি করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "চোর-স্ত্রী বা পুরুষ যাই হোক না কেন, তাদের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল মায়েদা)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইবনে শিহাব বলেন ঃ মানুষের সম্পদ অপহরণের অপরাধের জন্য আল্লাহ হাত কাটার শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি চোরের প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী এবং হাত কাটাকে বাধ্যতামূলক করার কাজে প্রাজ্ঞ।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন চোর ঈমানদার অবস্থায় চুরি করেনা। তবে তওবা করলে ঈমান বহাল হয়।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, তিন দিরহাম মূল্যের দ্রব্য চুরির ঘটনায় রাসূল (সা) হাত কেটেছেন। (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম) হযরত আয়িশাহ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) সিকি দিনার বা তার বেশী চুরিতে হাত কেটে দিতেন। (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম) একাধিক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সিকি দিনার বা তিন দিরহামের কম চুরিতে হাত কাটা যাবেনা।

তৎকালে ১২ দিরহামে এক দিনার হতো। তবে চুরির পরিমাণ যাই হোক এবং হাত কাটার শাস্তির উপযুক্ত হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় তা কবীরা গুনাহ ও জঘন্য অপরাধ।

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আয়িশাহ (রা) বলেন যে, বনু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা বিভিন্ন জিনিস ধার নিয়ে পরে অস্বীকার করতো। রাসূল (সা) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। তার পরিবারের লোকেরা রাসূলের (সা) পালকপুত্র যায়েদের ছেলে উসামার কাছে এসে ঐ মহিলার অব্যাহতির জন্য সুপারিশ করতে অনুরোধ করলো। উসামা সুপারিশ করলে রাসূল (সা) বললেন ঃ হে উসামা! আমি আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে তোমাকে সুপারিশ করতে দেখতে চাইনা।" অতঃপর সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন ঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো শুধু একজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার হাত কেটে দিত। আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদের (সা) কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।" অতঃপর বনু মাখযুমের ঐ মহিলার হাত কেটে দেয়া হলো।

তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণিত হাদীসে হযরত আবদুর রহমান ইবনে জারীর বলেন ঃ আমরা ফুযালা বিন উবাইদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম চোরের হাত কাটার পর কর্তিত হাত চোরের কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া কি রাসূলের (সা) সুন্নাত? তিনি বললেন ঃ হাঁ, রাসূল (সা) কর্তিত হাত চোরের কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

আলেমগণ বলেন ঃ চুরি করা জিনিস মালিকের নিকট ফেরত দেয়া ব্যতীত চোরের তওবায় কোন লাভ হবেনা। তবে সে গরীব হলে মালিকের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারে।

২৫. ডাকাতি করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়, তাদের একমাত্র শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের বিপরীত দিকের হাত ও পা কেটে দিতে হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এটা তাদের পার্থিব অপমান। আরো তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা আল মায়েদা)

ইমাম ওয়াহেদী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার" অর্থ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করা। আদেশ অমান্যকারী প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধে ও বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে থাকে। "পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়" অর্থাৎ হত্যা ও সম্পদ অপহরণের মাধ্যমে অরাজকতা ছড়ায়। মুমিনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারী আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণাকারী রূপে বিবেচিত। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আওযায়ী এই মত পোষণ করতেন। "অথবা" শব্দটি বারবার ব্যবহার করা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি প্রয়োগে ইসলামী সরকারের স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করা যাবে, ইচ্ছা করলে শূলে চড়ানো যাবে, এবং ইচ্ছা করলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে। এই মতটি হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও মুজাহিদের। ইমাম আতিয়ার মতে এ দ্বারা স্বাধীনতা নয় বরং অপরাধের মাত্রার তারতম্য অনুসারে শাস্তি বিধান করা বুঝায়। যে ডাকাত হত্যা ও সম্পদ হরণ এই দুই অপরাধই করবে তাকে হত্যাও করা হবে অতঃপর শূলে চড়ানো হবে। যে ডাকাত সম্পদ কেড়ে নেবে কিন্তু কাউকে হত্যা করবেনা, তাকে শুধু হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে। যে ডাকাত শুধু রক্তপাত করবে এবং সম্পদ হরণ করবেনা তাকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যাও করবেনা, সম্পদও হরণ করবেনা, কিন্তু অস্ত্র নিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে, তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। এটি শাফেয়ী মাযহাবের মত। ইমাম শাফেয়ী আরো বলেন যে, প্রত্যেককে তার অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তি দেয়া হবে। হত্যা ও শূল দুটোই যার প্রাপ্য, তাকে প্রথমে হত্যা করা হবে অথবা ৩ বার শূলে চড়িয়ে নামিয়ে রাখা হবে যাতে তার শাস্তিকে খুবই ঘৃণ্য করে প্রকাশ করা যায়। আর যার কেবল হত্যার শাস্তি প্রাপ্য তাকে হত্যা করে লাশ আপনজনদের হাতে অর্পণ করতে হবে। আর যার শুধু কর্তন দন্ড প্রাপ্য, তার প্রথমে ডান হাত কাটা হবে। সে পুনরায় চুরি ডাকাতি করলে তার বাম পা কাটা হবে। পুনরায় এই অপরাধ করলে তার বাম হাত কাটা হবে। কেননা আবু দাউদ নাসায়ী বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেনঃ "প্রথমবার চুরি করলে তার হাত কেটে দাও, দ্বিতীয়বার চুরি করলে তার পা কেটে দাও, পুনরায় চুরি করলে হাত কেটে দাও, পুনরায় চুরি করলে পা কেটে দাও।" হযরত আবু বকর ও হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে এই হাদীস অনুসারেই কাজ করা হতো এবং কোন সাহাবীই এর বিরোধিতা করেননি।

আয়াতে যে বলা হয়েছে "অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে" এর ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাকে ধরা সম্ভব হবেনা, তার সম্পর্কে সরকার ঘোষণা দিয়ে দেবেন যে, যে ব্যক্তি তাকে ধরতে পারবে, সে যেন তাকে হত্যা করে। আর যে ধরা পড়বে, তাকে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকাতে হবে। কেননা এতে তার দেশে ঘুরে ঘুরে অপরাধ করার পথ বন্ধ হবে এবং এটাই তার বহিষ্কার।

বস্তুতঃ শুধুমাত্র হত্যার ভয় দেখানো এবং সন্ত্রাস ছড়ানোই কবীরা গুনাহ। এর ওপর কেউ যদি জিনিসপত্র ছিনতাইও করে এবং খুন জখমও করে, তবে সে তো এক সাথে অনেকগুলো কবীরা গুনাহ্ সংঘটিত করে। এ ছাড়া এ ধরনের অপরাধীরা সাধারণতঃ মদখুরী, ব্যভিচার, সমকাম, নামায তরক ইত্যাদি কবীরা গুনাহে তো লিপ্ত থাকেই।

২৬. মিথ্যা শপথ করা ও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় যারা আল্লাহর নামে ওয়াদা করে ও কসম খেয়ে তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ লাভ করে, আখেরাতে তাদের কিছুই প্রাপ্য থাকবেনা, আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না, এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (আলে ইমরান)

ইমাম ওয়াহদী বলেন ঃ একবার একটি জমির মালিকানা নিয়ে দুই ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী দাবী জানাতে থাকে এবং তাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য তারা উভয়ে রাসূলের (সা) নিকট গমন করে। বিবাদী যখন নিজের দাবীর স্বপক্ষে কসম খেতে উদ্যত হলো, অমনি এই আয়াত নাযিল হলো। ফলে সে কসম খাওয়া থেকে বিরত হয় এবং জমির ওপর বাদীর মালিকানা মেনে নেয়।

এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে হকদার না হয়েও অপরের সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য কসম খায়, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে রাগান্বিত দেখবে। আশয়াস বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতটি আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল। জনৈক ইহুদীর সাথে একটি জমি নিয়ে আমার বিরোধ ছিল। আমি তাঁকে রাসূলের (সা) কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমার কি সাক্ষী বা প্রমাণ আছে? আমি বললাম ঃ না। তখন রাসূল (সা) উক্ত ইহুদীকে বললেন ঃ তুমি শপথ করে বল যে ঐ জমি তোমার। আমি বললাম ঃ হে রাসূল! ইহুদীকে শপথ করার সুযোগ দিলে তো সে শপথ করে আমার জমি নিয়ে নেবে। এই সময় এই আয়াত নাযিল হয়। আয়াতটিতে যে "ক্ষুদ্র স্বার্থের"

কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা পার্থিব স্বার্থকেই বুঝানো হয়েছে, যার জন্য লোকেরা সচরাচর মিথ্যা কসম খেয়ে থাকে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্যযোগ্য যে, ইসলামী আইন অনুসারে আদালতে বাদী উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করতে অক্ষম হলে বিবাদী শপথ করার সুযোগ লাভ করে থাকে এবং এই শপথের ভিত্তিতেই আদালত বিবাদের নিষ্পত্তি করে থাকে। তাই এরূপ ক্ষেত্রে শপথ অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য নয় জেনেও কোন সম্পত্তির দাবীতে শপথ করে, সে আল্লাহকে রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে পাবে।' অতঃপর রাসূল (সা) এই আয়াতটি পাঠ করলেন যে, "যারা আল্লাহর নামে ওয়াদা করে ও কসম খেয়ে তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ লাভ করে . . .।"

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলের (সা) কাছে বসা ছিলাম।

রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের শপথ দ্বারা কোন মুসলমানদের সম্পদ কুক্ষিগত করে, সে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম করে ফেলে। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে রাসূল! যদি তা খুব নগণ্য জিনিস হয় তবুও? তিনি বললেন ঃ "যদি একটা গাছের ডালও হয় তবুও।" (সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাতে হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "তিন ব্যক্তির সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালাা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।" এ কথাটা তিনি তিনবার বললেন। হযরত আবু যর বললেন ঃ "ওরা তো চরম ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগ্য ব্যক্তি। হে রাসূল! তারা কারা?" রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি পায়ের গোড়ালী সমান কাপড় পরে, যে দান বা উপকার করে তার খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে তার পণ্য বিক্রী করে। অর্থাৎ শপথ করে মিথ্যামিথ্যি পণ্যের উচ্চতর ক্রয়মূল্য বা বিদেশী পণ্য বলে উল্লেখ করে, যাতে উচ্চ মূল্যে তা বিক্রি করা যায়, অথচ মিথ্যা শপথ করে পণ্যের ত্রুটি গোপন করে। সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত অপর হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করা, আত্মহত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। ইচ্ছাকৃতভাবে যে মিথ্যা শপথ করা হয়, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ইয়ামীনে গামূস' তথা নিমজ্জিতকারী শপথ বলা হয়। কারণ এই শপথ মানুষকে পাপে নিমজ্জিত করে।

কারো কারো মতে তাকে আগুনে নিমজ্জিত করে বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করাও কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। যেমন নবীর কসম, কাবার কসম, ফেরেশতার কসম, আকাশের কসম, পানির কসম, জীবনের কসম, আমানতের কসম, প্রাণের কসম, মাথার কসম, অমুকের মাজারের কসম, ইত্যাদি।

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামে' তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। শপথ যদি করতেই হয় তবে আল্লাহর নামেই শপথ করবে, নচেত চুপ থাকবে।"

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "তোমারা দেবদেবীর নামে বা বাপ-দাদার নামে শপথ করোনা।" "আমার কথা সত্য নাহলে আমি অমুকের সন্তান নই-" এরূপ বলা বাপ-দাদার নামে শপথের পর্যায়ভুক্ত। আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি এভাবে শপথ করে যে, আমার কথা সত্য না হলে আমি মুসলমান নই, সে মিথ্যুক হলে যা বলেছে তাই হবে (ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে) আর সে সত্যবাদী হলেও সম্পূর্ণ নিরাপদে ইসলামের পথে বহাল থাকতে পারবেনা।"

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "কেউ অভ্যাসবশতঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে ভুলক্রমে শপথ করলে তৎক্ষণাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে।"

২৭. যুলুম বা অত্যাচার করা

যুলুম বা অত্যাচার নানাভাবে করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত রূপ হলো মানুষের সম্পদ হরণ, জোর পূর্বক অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, মানুষকে প্রহার করা, গালিগালাজ করা, বিনা উস্কানীতে কারো ওপর আক্রমণ চালানো এবং আর্থিক, দৈহিক ও মর্যাদার ক্ষতিসাধন এবং দুর্বলদের ওপর নৃশংসতা চালানো ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ বলেন ঃ "যালেমদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো উদাসীন মনে করোনা। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শুধু একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে, তারা মাথা

নিচু করে উঠিপড়ি করে দৌড়াতে থাকবে, তাদের চোখ তাদের নিজেদের দিকে ফিরবেনা, এবং তাদের হৃদয়সমূহ দিশাহারা হয়ে যাবে। মানুষকে আযাব সমাগত হওয়ার দিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও। সেদিন যুলুমবাজরা বলবে : হে আমাদের প্রভু! অল্প কিছুদিন আমাদেরকে সময় দিন, তাহলে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করবো এবং রাসূলদের অনুসরণ করবো। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে বলতেনা যে তোমাদের পতন নেই! যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে, তোমরা তো তাদের বাসস্থানেই বাস করেছ এবং সেই সব যালেমের সাথে আমি কেমন আচরণ করেছি, তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। উপরন্তু আমি তোমাদের জন্য বহু উদাহরণ দিয়েছি।"

সূরা আশ শুরাতে আল্লাহ বলেন : "শুধু তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে থাকে।" সূরা আশ শুরারার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন : "যুলুমবাজরা তাদের যুলুমের পরিণতি অচিরেই জানতে পারবে।"

রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ তায়ালা যালেমকে দীর্ঘ সময় দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন তাকে আর রেহাই দেননা। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন : তোমার প্রভুর পাকড়াও এ রকমই হয়ে থাকে, যখন তিনি যুলুম রত জনপদ সমূহকে পাকড়াও করেন। তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, অপ্রতিরোধ্য।" (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে' তিরমিযী)

রাসূল (সা) আরো বলেন : "কেউ যদি তার কোন ভাই-এর সম্মান হানি কিংবা কোন জিনিসের ক্ষতি করে থাকে, তবে আজই তার কাছ থেকে তা বৈধ করে নেয়া উচিত (অর্থাৎ ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত) এবং সেই ভয়াবহ দিন আসার আগেই এটা করা উচিত, যেদিন টাকা কড়ি দিয়ে কোন প্রতিকার করা যাবেনা, বরং তার কাছে কোন নেক আমল থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ হিসাবে মযলুমকে উক্ত নেক আমল দিয়ে দেয়া হবে এবং তার কোন অসৎ কাজ না থাকলেও উক্ত মযলুমের অসৎ কাজ তার ওপর বর্তানো হবে।" (সহীহ আল বুখারী ও জামে' তিরমিযী)

একটি হাদীসে কুদসীতে রাসূল (স) বলেন : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের ওপর যুলুম হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের ওপর যুলুম করোনা।" (সহীহ মুসলিম, জামে' তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে আছে ঃ "রাসূল (সা) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা কি জান, দরিদ্র কে? তাঁরা বললেন ঃ আমাদের মধ্যে যার অর্থ নেই, সম্পদ নেই, সেই দরিদ্র। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি সে-ই, যে কিয়ামতের দিন প্রচুর নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ সংগে করে আনবে, কিন্তু সে এমন অবস্থায় আসবে যে, কাউকে গালি দিয়ে এসেছে, কারো সম্পদ হরণ করে এসেছে, কারো সম্মানের হানি করেছে, কাউকে প্রহার করেছে, এবং কারো রক্তপাত করেছে। অতঃপর এই ব্যক্তির সৎ কার্যগুলো তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এভাবে মযলুমদের ক্ষতি পূরণের আগেই তার সৎকাজগুলো শেষ হয়ে গেলে মযলুমদের গুনাহগুলো একে একে তার ঘাড়ে চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (সহী আল বুখারী ও অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ) সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অপর হাদীসে আছে ঃ "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও অন্যের জমি জবর দখল করবে, কিয়ামতের দিন তার ঘাড়ে সাতটি পৃথবী চাপিয়ে দেয়া হবে।" একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তির ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই, যে এমন ব্যক্তির ওপর অত্যাচার করে, যার আমি ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই।"

জনৈক আরব কবি বলেন ঃ

"ক্ষমতা থাকলেই যুলুম করোনা, যুলুমের পরিণাম অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। যুলুম করার পর তুমি তো সুখে নিদ্রা যাও, কিন্তু মযলুমের চোখে ঘুম আসেনা। সে সারা রাত তোমার ওপর বদ দোয়া করে, এবং আল্লাহ তা শোনেন। কেননা তিনিও ঘুমান না।" জনৈক মনীষী বলেছেন ঃ "দুর্বলদের ওপর যুলুম করোনা। তাহলে তারা একদিন চরম ক্ষতিকর শক্তিমান গোষ্ঠীতে পরিণত হবে।"

তাওরাতে বর্ণিত আছে যে, "পুলসিরাতের পাশ থেকে একজন ঘোষক কিয়ামতের দিন এই বলে ঘোষণা দিতে থাকবে ঃ "ওরে বলদর্পী, নিষ্ঠুর যালেমগণ! আল্লাহ নিজের মর্যাদা ও প্রতাপের শপথ করে বলেছেন যে, আজকের দিন কোন অত্যাচারী ব্যক্তি এই পুল পার হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না।"

হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, "মক্কা বিজয়ের বছর যখন আবিসিনয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরগণ রাসূলের (স) নিকট প্রত্যাবর্তন করলো, তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে আবিসিনিয়ায় থাকাকালীন কোন বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা জানাবে? তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে কতিপয় যুবক বললো ঃ জ্বী, হে রাসূল! একদিন আমরা সেখানে বসা ছিলাম দেখলাম, আমাদের পাশ

দিয়ে এক বৃদ্ধা মাথায় এক কলসী পানি নিয়ে চলে যাচ্ছে। সহসা এক যুবক এসে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে জোরে ঠেলা দিল। এতে বৃদ্ধা পড়ে গেল এবং তার পানির কলসীও পড়ে ভেংগে গেল। বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে সেই যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললো ঃ ওহে বিশ্বাসঘাতক! আল্লাহ যেদিন আরশ স্থাপন করবেন, যেদিন আগের ও পরের সকল মানুষকে সমবেত করবেন, এবং যেদিন মানুষের হাত ও পা তদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, সেই দিন তুই দেখে নিস, আল্লাহর সামনে তোর কি পরিণতি হয় এবং আমার কি অবস্থা হয়।" এ কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ বৃদ্ধা ঠিকই বলেছে। যে জাতি তার দুর্বলদের কল্যাণার্থে সবলদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেনা, সে জাতিকে আল্লাহ কিভাবে সম্মানিত করবেন?" (ইবন মাজাহ, ইবনে হাববান, বায়হাকী)

রাসূল (সা) বলেন, "পাঁচ ব্যক্তির ওপর আল্লাহর ক্রোধ অবশ্যম্ভাবী। তিনি ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই তাদের ওপর তা কার্যকর করবেন, নচেত আখেরাতে কার্যকর করবেন ঃ (১) কোন জাতির শাসক, যে তার প্রজাদের কাছে থেকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য আদায় করে নেয়, কিন্তু তাদের ওপর সুবিচার ও ইনসাফ করে না এবং তাদেরকে যুলুম থেকে রক্ষা করেনা। (২) এমন দলনেতা, গোত্রপতি ও জাতীয় নেতা, যাকে সবাই আনুগত্য করে ও যার নির্দেশ সবাই মেনে চলে, অথচ সে সবল ও দুর্বলের সাথে সমান আচরণ করে না এবং নিজের খেয়ালখুশীমত কথা বলে। (৩) যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজনকে ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়না এবং তাদেরকে ইসলামের বিধান শিক্ষা দেয়না। (৪) যে ব্যক্তি নিজের নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট থেকে আপন প্রাপ্য কাজ পুরোপুরি আদায় করে নিয়েও তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দেয়না। (৫) যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে মোহরানা থেকে বঞ্চিত করে ও তার ওপর অত্যাচার চালায়।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন ঃ "আল্লাহ যখন সর্বপ্রথম তাঁর সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন, তখন তারা আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করে বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি কার সাথে থাকেন? আল্লাহ জবাব দিলেন ঃ মযলুমের সাথে, যতক্ষণ তার প্রাপ্য তাকে ফিরিয়ে দেয়া না হয়।"

হযরত ওহাব বিন মুনাবিবহ বলেন ঃ "একজন পরাক্রমশালী রাজা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। একদিন এক বৃদ্ধা ভিখারিনী এসে সেই প্রাসাদের পাশে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে বাস করতে লাগলো। পরে একদিন রাজা প্রাসাদের ছাদে উঠে চারপাশ ঘুরে দেখার সময় ঐ ঝুপড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ঝুপড়িটা কার? লোকেরা বললো ঃ এক দরিদ্র বৃদ্ধার। সে ওখানে বাস করে। রাজা

তৎক্ষণাত ঝুপড়িটি ভেংগে ফেলার নির্দেশ দিলেন। বৃদ্ধা তখন বাইরে ভিক্ষা করতে গিয়েছিল। একটু পরে এসে দেখলো, তার ঝুপড়িটা বিধ্বস্ত। সে আশপাশের লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো আমার ঝুপড়ি কে ভেংগেছে? লোকেরা তাকে জানালো যে, রাজা ভেংগেছে। বৃদ্ধা আকাশেরর দিকে মাথা তুলে বললো ঃ হে আল্লাহ! আমি যখন আমার ঝুপড়িতে ছিলাম না, তখন তুমি কোথায় ছিলে? তুমি কি ওটা রক্ষা করতে পারনি? এরপর আল্লাহ জিবরীলকে ঐ প্রাসাদটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন এবং তা সংগে সংগে ধ্বংস করা হলো।"

কথিত আছে, ক্ষমতা থেকে পতনের পর রাজা খালেদ বিন বারমাক ও তার ছেলে কারাবন্দী হলে তার ছেলে বললো ঃ আব্বা, এত সম্মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকার পর এখন আমরা কারাগারে? খালেদ বললেন ঃ হ্যাঁ, বাবা! প্রজাদের ওপর যুলুম চালিয়ে আমরা যে রজনীতে তৃপ্তির সাথে নিদ্রা গিয়েছিলাম, আল্লাহ তখন জাগ্রত ছিলেন এবং মযলুমদের দোয়া কবুল করেছিলেন।" এযীদ বিন হাকীম বলতেন ঃ "এক ব্যক্তির ওপর আমি যুলুম করেছিলাম। আমি জানতাম যে, আল্লাহ ছাড়া তার আর কোন সাহায্যকারী দুনিয়ায় নেই। কিন্তু সে যখন বললো, "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, আমার ও তোমার মধ্যে ফায়সালা আল্লাহই করবেন," তখন আমি তাকে এত ভয় পেলাম যে, জীবনে আর কখনো কাউকে এত ভয় পাইনি।"

একবার খলিফা হারুনুর রশীদ কবি আবুল আতাহিয়াকে কারাগারে আটক করেন। কবি সেখান থকে তাকে যে চিঠি লেখেন, তাতে এই লাইনটি ছিল ঃ "আল্লাহর কসম, জেনে রেখ, অত্যাচার স্বয়ং অত্যাচারীর জন্যই ভয়ংকর অমংগল ডেকে আনে। অত্যাচারী সব সময়ই অসৎ। ওহে যালেম, কিয়ামতের দিন যখন আমরা একত্রিত হব, তখন কে প্রকৃত নিন্দিত তা তুমি জানতে পারবে।"

তাবরানী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, "অত্যাচারী যখন কেয়ামতের দিন পুলসিরাতের ওপর আসবে, অমনি যার যার ওপর সে অত্যাচার করেছে, অর্থাৎ যার যার হক নষ্ট ও ক্ষতি সাধন করেছে, তারা সবাই আসবে এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে তার কৃত সৎকর্মগুলো ছিনিয়ে নেবে। সব কয়টি সৎকর্ম কেড়ে নেয়ার পর মযলুমদের রাশি রাশি পাপ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে অত্যাচারী জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে।"

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "কিয়ামাতের দিন আল্লাহর বান্দারা খালি পায়ে নগ্ন দেহে ময়দানে সমবেত হবে। এ সময়ে গুরুগম্ভীর স্বরে একটি আওয়ায ধ্বনিত হবে, যা দূরের ও নিকটের সবাই শুনতে

পাবে। বলা হবে ঃ "আমি সকলের অভাব পূরণকারী রাজাধিরাজ, কোন জান্নাতবাসীর পক্ষে জান্নাতে যাওয়া এবং জাহান্নামবাসীর পক্ষে জাহান্নামে যাওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার কৃত যুলুমের আমি প্রতিশোধ না নেই, এমনকি তা যদি একটি চড় থাপ্পড় বা লাথির পর্যায়েও হয়ে থাকে। তোমার প্রভু কারো ওপর যুলুম করেন না।" আমরা বললাম ঃ হে রাসূল! সেটা কিভাবে সম্ভব হবে? আমরা তা সবাই খালি পায়ে ও নগ্ন দেহে থাকবো। রাসূল (স) বললেন ঃ প্রত্যেকের কৃত সৎকর্ম ও অসৎকর্মের আদান-প্রদান দ্বারাই প্রতিশোধ নেয়া হবে। তোমাদের প্রতিপালক যালেম নন।" অপর এক হাদীসে রাসূল (স) বলেন ঃ "একটি বেতের আঘাতের জন্যও কিয়ামাতের দিন প্রতিশোধ নেয়া হবে।"

কথিত আছে যে, "পারস্যের এক সম্রাট নিজের ছেলের জন্য একজন শিক্ষক রেখেছিলেন। ছেলেটি যখন যথেষ্ট বড় হয়ে উঠেছে, তখন একদিন ঐ শিক্ষক তাকে ডাকলেন এবং বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে তাকে কঠোর শারীরিক শাস্তি দিলেন। ছেলেটি তার শিক্ষকের ওপর রাগান্বিত এবং মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে রইল। অল্প দিন পরই রাজা মারা গেল এবং ঐ ছেলেটি সিংহাসনে আরোহণ করলো। তখন সে উক্ত শিক্ষককে দরবারে তলব করে জানতে চাইল যে, আপনি অমুক দিন আমাকে বিনা কারণে শাস্তি দিয়েছিলেন কেন? শিক্ষক বললেন ঃ ওহে সম্রাট, শুনুন, আমি যখন দেখলাম, আপনি বড় হয়েছেন এবং অচিরেই সিংহাসনে আরোহণ করতে যাচ্ছেন, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বিনা কারণে প্রহার ও যুলুম করলে কেমন কষ্ট লাগে, তার স্বাদ আপনাকে গ্রহণ করাবো, যাতে আপনি কারো ওপর যুলুম না করেন। একথা শুনে সম্রাট ধন্যবাদ দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন। অতঃপর স্বীয় প্রাক্তন শিক্ষককে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করলেন।"

এতীমের ওপর যুলুম এবং প্রজার ওপর শাসকের যুলুম ইতিপূর্বে পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে সকল স্তরে দুর্বলের ওপর সবলের যুলুমের বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ যে কোন বান্দার হক বা অধিকার নষ্ট করাই যুলুম। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ধনী বা সক্ষম লোক কর্তৃক দরিদ্র পাওনাদারের প্রাপ্য মজুরী বা অন্য কোন জিনিস দিতে অহেতুক বিলম্ব করা ও তালবাহানা করাও যুলুমের শামিল। এজন্য হাদীসে মজুরের মজুরী তার গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই দিতে বলা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "ধনীর তালহাবানাও যুলুমের অন্তর্ভুক্ত।"

মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "মযলুমের দোয়া মেঘের ওপরে উঠে যায় এবং আল্লাহ তখন বলেন ঃ আমার

মর্যাদা ও প্রতাপের শপথ, আমি তোমাকে সাহায্য করবোই, চাই তা কিছু পরেই হোক।" স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরানা ও খোরপোশ না দেয়াও যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সা) বলেন ঃ "দুর্বলের সাথে সবলের বক্র আচরণ - যা দ্বারা সে তার সহায়-সম্পদ ও মর্যাদার ক্ষতি সাধন করে ও কষ্ট দেয়া - যুলুমের অন্তর্গত।"

হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "কিয়ামাতের দিন পালাক্রমে প্রত্যেক নারীপুরুষকে হাত ধরে কিয়ামতের ময়দানে সমবেত সমগ্র মানব-মন্ডলীর সামনে উপস্থিত করা হবে এবং বলা হবে, এই যে অমুকের ছেলে বা মেয়ে অমুক। এর কাছে যদি কারো কিছু পাওনা থাকে তবে সে যেন এসে তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়। এ সময় অধিকার বঞ্চিত স্ত্রীরা খুশী হবে এবং তাদের অধিকার হরণকারী পিতা, ভাই বা স্বামীর কাছ থেকে অধিকার আদায় করে নেবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ "সেদিন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য হবেনা এবং কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবেনা।" সেদিন আল্লাহ নিজের পাওনা সম্পর্কে যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, কিন্তু মানুষের হক তিনি মাফ করবেন না। অতঃপর যে নারী বা পুরুষকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো, তাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে এবং দাবীদারদেরকে বলা হবেঃ "তোমাদের হক নিতে এগিয়ে এসো।" আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাদেরকে বলবেন, "প্রত্যেক পাওনাদারকে তার নেক আমল থেকে পাওনা অনুপাতে দিয়ে দাও। এভাবে সকল পাওনাদারকে দেয়ার পর যদি সামান্য কিছু নেক আমল অবশিষ্ট থাকে এবং সে যদি সামগ্রিক কৃতকর্মের বিচারে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি হয়, তবে তার অবশিষ্ট আমলকে এমনভাবে বাড়িয়ে দেয়া হবে যাতে সে জান্নাতে যেতে পারে। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। কিন্তু সে যদি সামগ্রিকভাবে অসৎ ব্যক্তি হয়, এবং তার আর কোন নেক আমল অবশিষ্ট না থাকে, তবে ফিরিশতারা বলবে ঃ হে আল্লাহ, ওর সব নেক আমল ফুরিয়ে গেছে, অথচ এখনো ঢের হকদার রয়েছে। তখন আল্লাহ বলবেন, হকদারদের গুনাহ ওর ওপর চাপিয়ে দাও এবং দোজখে প্রবেশ করাও।"

কোন অমুসলিমের ওপর যুলুম করলেও দুনিয়া ও আখেরাতে তার একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। কোন মুসলিমকে তার প্রাপ্য না দেয়া, কম দেয়া, ঠকানো, ধোকা দেয়া, তার ওপর তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ চাপানো, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে না দেয়া পর্যন্ত তার কোন জিনিস গ্রহণ করা যেমন যুলুম, কোন অমুসলিমের ক্ষেত্রেও এই সব কাজ সমান যুলুম। রাসূল (সা) বলেছেন, "কোন

অমুসলিমের অধিকার যে হরণ করবে তথা তার জানমালের কোন ক্ষতি সাধন করবে, কিয়ামাতের দিন আমি স্বয়ং আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে বিচার চাইবো।"

তাবরান্নী বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যে বিবাদ বিচারের জন্য উঠবে তা হবে এক স্বামী ও তার স্ত্রী সংক্রান্ত। স্ত্রী কথা বলবেনা তবে তার হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে তার স্বামীর প্রতি সে যে আচরণ করতো সে সম্পর্কে এবং স্বামীর হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে স্ত্রীর প্রতি সে ভালো বা মন্দ যে আচরণ করতো সে সম্পর্কে। এরপর মামলা উঠবে মনিব ও চাকর চাকরানীদের সম্পর্কে। সেখানে কোন অর্থকড়ি দিয়ে বিবাদ মেটানো হবেনা। কেবল মযলুমকে যালেমের নেক আমল দিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সকল প্রতাপশালী যালেম শাসককে লোহার শিকলে বেঁধে হাজির করা হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে।"

কথিত আছে যে, বিশিষ্ট তাবেয়ী তাউস ইয়ামানী উমাইয়া শাসক হিশাম বিন আবদুল মালিককে একবার উপদেশ দিলেন যে, "আপনি আযানের দিন সম্পর্কে সতর্ক হোন।" হিশাম বললেন, "কোন্ আযানের দিন?" তাউস বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "সেদিন একজন এই বলে আযান দেবে (অর্থাৎ ঘোষণা করবে) যালেমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত!" এ কথা শুনেই হিশাম মূর্ছা গেলেন। তাউস বললেন, কিয়ামতের দিন যা ঘটবে তার বিবরণ শুনে যদি এই অবস্থা হয় তবে তা যখন বাস্তবে ঘটবে তখন তা স্বচোক্ষে দেখলে কী অবস্থা হবে?

যুলুমের পাশাপাশি যুলুমের সহযোগিতা ও যালেমদের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করাকেও ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সূরা হুদে আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা যালেমদের সহযোগী হয়োনা, তাহলে তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে।" হযরত ইবনে আব্বাস এর তাফসীর প্রসংগে বলেন ঃ অর্থাৎ তাদের সাথে পূর্ণ আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করোনা, নম্র ও বিনয়পূর্ণ ভাষায় তাদের সাথে কথা বলোনা এবং বন্ধুত্ব রেখনা। সুদ্দী বলেন ঃ এর অর্থ যালেমদের সাথে আপোষকামী হয়োনা। ইকরামা বলেন ঃ অর্থাৎ তাদের অনুগত হয়োনা। আবুল আলিয়া বলেন ঃ অর্থাৎ যালেমদের কার্যকলাপকে খুশীমনে মেনে নিওনা। সূরা সাফ্ফাতে আল্লাহ বলেন ঃ "যারা যুলুম করে তাদেরকে এবং তাদের সাংগপাংগদেরকে সমবেত করো।" অর্থাৎ তাদের সহযোগী ও অনুসারীদেরও একই পরিণামে ভুগতে হবে।

এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন যালেমকে যালেম জেনেও তার পক্ষ নেবে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।" অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "এমন অনেক শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের বহু অনুসারী থাকবে এবং সেই অনুসারীরাও মানুষের ওপর যুলুম ও মিথ্যাচার চালাবে। সে ব্যক্তি তাদের সাথে ওঠাবসা করবে, তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন দেবে এবং তাদের যুলুমের সহযোগিতা করবে আমি তার কেউ নই এবং সে আমার কেউ নয়। আর যে ব্যক্তি তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে এবং তাদের যুলুমের সহযোগিতা করবেনা, সে আমার আপনজন এবং আমিও তার আপনজন।" রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন যালেমকে সাহায্য করবে তার ওপর কোন না কোন যালেমকে চাপিয়ে দেয়া হবে।" হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়ার (র) বলেন ঃ "যালেম শাসক ও তার সাংগপাংগদের দিকে যখন তাকাবে, তখন অন্তরের ক্ষোভ ও অসন্তোষ সহকারে তাকাবে। নচেত তোমাদের কৃত নেক আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।" মাকহুল দামেস্কী বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন যখন যালেম ও যালেমের সাংগপাংগদের ডাকা হবে, তখন যালেমের কলমে যে কালি ভরে দিত, কিংবা কলম গুছিয়ে দিত বা এরূপ ছোটখাট কাজ বা এর চেয়ে বড় কাজ করে যে সাহায্য করতো সেও বাদ যাবেনা। সকল সহযোগীকে আগুনের একটি বাক্স ভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

রাসূল (সা) এক হাদীসে বলেছেন ঃ "যারা যালেম শাসকদের পক্ষে অস্ত্র নিয়ে ঘুরতো এবং তাদের মনতুষ্টির জন্য মানুষকে অকারণে প্রহার করতো, তারাই হবে সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশকারী।" হযরত ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ "যালেমদের সাংগপাংগরা হবে জাহান্নামের কুকুর।"

রাসূল (সা) অপর এক হাদীসে বলেছেন ঃ "যে স্থানে কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে নির্যাতন বা হত্যা করা হয়, তোমরা কেউ সেই স্থানে থেকনা। কেননা যারা ঐ জায়গায় অবস্থান করে এবং যুলুম প্রতিহত করেনা, তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত নাযিল হয়ে থাকে।" (তাবরানী) অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "এক ব্যক্তি কবরে যাওয়ার পর ফিরিশতারা তাকে বলবে ঃ আমরা তোমাকে একশো ঘা বেত মারবো। লোকটি অনেক অনুনয় বিনয় করে অব্যাহত চাইবে। ফলে তাকে মাত্র একটি ঘা বেত মারা হবে। এরপর কবর আগুনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন লোকটি জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা কী কারণে আমাকে মেরেছ? তারা বলবে ঃ কেননা তুমি পবিত্রতা অর্জন ছাড়াই এক ওয়াক্ত নামায পড়েছিলে এবং তোমার পথের পাশে এক ব্যক্তির ওপর যুলুম হচ্ছিল, কিন্তু তুমি

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে সাহায্য করোনি।" চিন্তার ব্যাপার এই যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মযলুমকে সাহায্য করেনা তার যদি এই পরিণতি হয়, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং যুলুম করে তার কি দশা হবে?

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূল বলেন ঃ তোমার ভাই যালেম হলেও তাকে সাহায্য করো, মযলুম হলেও তাকে সাহায্য করো। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যদি মযলুম হয় তবে তাকে সাহায্য করতে হবে, এ কথা তো বুঝলাম, কিন্তু যালেম হলে কিভাবে সাহায্য করবো? রাসূল (সা) বললেন ঃ তাকে যুলুম থেকে ফিরাও। এটাই তাকে সাহায্য করা।"

কথিত আছে, জনৈক দরবেশ একদিন যুলুবাজ সরকারী আমলাদের একজন সহযোগীকে তার মৃত্যুর কিছুকাল পর অত্যন্ত দুর্দাশাগ্রস্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ মৃত্যুর পর তুমি কেমন আছ? সে বললো" দুর্বিসহ অবস্থায় আছি। আল্লাহর আযাব ভোগ করছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মনিবরা অর্থাৎ যুলূমবাজ সরকারী কর্মচারীরা কোথায় আছে? সে বললোঃ তারা আছে আমার চেয়েও ভয়ংকর অবস্থায়। তারপর সে বললো ঃ আপনি কি এ আয়াত পড়েননি ঃ "যালেমরা অচিরেই জানতে পারবে তাদের কী পরিণতি হয়।"

জনৈক ঐতিহাসিক এ প্রসংগে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, একবার আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম তার এক হাত ঘাড় থেকে কর্তিত। সে উচ্চস্বরে বলছে ঃ যারা আমাকে দেখবে তারা যেন কারো ওপর অত্যাচার না করে। আমি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি হয়েছে ভাই? সে বললো ঃ একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। আমি একজন অত্যাচারী ব্যক্তির বরকন্দাজ ছিলাম। একদিন দেখলাম, এক জেলে বড় একটা মাছ নিয়ে যাচ্ছে। মাছটি দেখে আমার ভীষণ লোভ হলো এবং জেলেকে প্রহার করে তার মাছটি কেড়ে নিলাম। মাছটি নিয়ে সানন্দে বড়ী যাচ্ছি। সহসা মাছটি আমার বুড়ো আংগুলে ভীষণ জোরে কামড় দিল। অতঃপর বাড়ী গিয়ে মাছটি আছড়ে ফেলে দিলাম। ব্যথায় সেদিন রাত্রে আমার ঘুম হলোনা। পরদিন সকালে দেখি আংগুলটা ভীষণভাবে ফুলে উঠেছে। আমি দ্রুত চিকিৎসকের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে জানালেন, বুড়ো আংগুলটা কেটে ফেলতে হবে। নচেৎ পরে পুরো হাত আক্রান্ত হবে। অগত্যা বুড়ো আংগুল কাটা হলো। কিন্তু এতেও ব্যথার উপশম হলো না। পুনরায় চিকিৎসকের কাছে গেলাম। এবার তিনি আমার হাতের পাতাটি পুরো কেটে দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। কিন্তু তাতেও উপশম হলোনা।

ক্রমে আমার পুরো হাতটাই কাটতে হলো। অতঃপর এক ব্যক্তি আমার সব ঘটনা শুনে আমাকে মাছের মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে বললেন, নচেৎ আমার পুরো দেহই রোগক্রান্ত হতে পারে বলে সতর্ক করে দিলেন। আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করে জেলেটির সন্ধান পেয়েছি এবং তার কাছে পূর্বের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পা ধরে মাফ চেয়েছি। এখন আমার বাদবাকী শরীর সুস্থ আছে। কেননা ঐ জেলে আমাকে মাফ করে দিয়েছে এবং আমাকে যে বদদোয়া করেছিল তা ফিরিয়ে নিয়েছে।

বস্তুতঃ মানুষের ওপর অত্যাচার এমন এক ভয়ংকর গুনাহ, যার শাস্তি কোন না কোন উপায়ে দুনিয়ার জীবনেই পাওয়া শুরু হয়ে যায়। যদিও অনেকেই তা উপলব্ধি করেনা। আর এ থেকে বাঁচার কার্যকর উপায় হলো পরোপকার ও জনসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা। লোভ, হিংসা ও ক্রোধ থেকে আত্ম সংবরণ করা এবং হালালভাবে প্রাপ্ত নিজের যা কিছু আছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকা। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি অদৃষ্টের ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং অন্যের কাছে যা আছে তার থেকে নিরাশ হয় সে-ই প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পায়।

২৮. জোর পূর্বক চাঁদা আদায় করা

এটিও এক ধরনের জুলুম। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটিতে যে জুলুমের কথা বলা হয়েছে, এটিও তার অন্তর্ভুক্তঃ

"যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অবৈধভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়, কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (আশশূরা)

যারা জোর পূর্বক চাঁদা আদায় করে তারা নিজেরাও জুলুমবাজ এবং তারা জুলুমবাজদের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারীও। চাঁদাবাজরা যে চাঁদা আদায় করে, তা যেমন তাদের প্রাপ্য নয়, তেমনি যে পথে তা ব্যয় করে তাও বৈধ পথ নয়। এ জন্য রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "অবৈধ চাঁদা আদায়কারী জান্নাতে যাবেনা।" (আবু দাউদ) এর কারণ এই যে, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়কারী আল্লাহর বান্দাদের ওপর জুলুম ও শোষণ চালায়। তাদের কষ্টোপার্জিত অর্থ কেড়ে নেয়। এ ধরনের লোকেরা কেয়ামতের দিন মজলুমদের প্রাপ্য দিতে পারবেনা। যদি তাদের কবুল কৃত কোন সৎকর্ম থাকে, তবে তাই দিতে হবে। নচেত মজলুমদের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। এ সংক্রান্ত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামাতের দিন প্রচুর নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত নিয়ে

আসবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়ে আসবে, প্রহার করে আসবে অথবা কারো সম্পদ আত্মসাত করে আসবে। অতঃপর এই সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে একে একে তার পুণ্যকর্ম দিয়ে দেয়া হবে। যখন পুণ্যকর্ম ফুরিয়ে যাবে, তখন মজলুমদের পাপ কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

যে হাদীসে এক ব্যভিচারিনী রমণীকে পাথর মেরে হত্যা করার বিবরণ এসেছে, তাতে রাসূল (সা) বলেন ঃ এই মহিলা এমন তওবা করেছে যে, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়কারীও যদি তেমন তওবা করতো, তবে তার গুনাহও মাফ হয়ে যেত। এ থেকে বুঝা যায় এটি কত বড় মারাত্মক গুনাহর কাজ। বস্তুতঃ জোরপূর্বক অর্থ আদায় করার কাজটি ডাকাতি রাহাজানি সদৃশ। জোরপূর্বক চাঁদা যে আদায় করে, যে তার সহযোগিতা করে, যে লেখে, যে সাক্ষী থাকে, তারা সবাই এই পাপের সমান অংশীদার। তারা সবাই হারামখোর। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে গোশতের টুকরাটি হারাম সম্পদ থেকে উৎপন্ন হয়, তা জাহান্নামের উপযুক্ত।"

ইমাম ওয়াহেদী (রহ) "হে নবী তুমি বল, পবিত্র ও অপবিত্র জিনিস সমান হয়না" এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে অপবিত্র জিনিসের মধ্যে জোরপূর্বক আদায়কৃত জিনিসকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কারো সম্পদ সে স্বেচ্ছায় না দিলে হালাল হয়না।

একবার হযরত জাবের (রা) রাসূল (সা)কে এসে বললেন ঃ হে রাসূল, আমার মদের ব্যবসায় ছিল। সেই ব্যবসায় থেকে আমার বেশ কিছু সঞ্চিত নগদ অর্থ রয়েছে। আমি যদি তা দিয়ে আল্লাহর কোন ইবাদাত বা পুণ্যের কাজ করি, তবে তাতে কি আমার উপকার হবে? রাসূল (সা) বললেনঃ তুমি যদি সেই অর্থ হজ্ব, জিহাদ, অথবা সদকায় ব্যবহার কর, তবে তা আল্লাহর কাছে একটা মাছির ডানার সমানও মর্যাদা পাবেনা। আল্লাহ পবিত্র সম্পদ ব্যতীত কোন কিছু গ্রহণ করেন না। তখন আল্লাহ এই বক্তব্যের সমর্থনে নাযিল করলেনঃ "হে নবী! তুমি বল, পবিত্র ও অপবিত্র জিনিস সমান নয়, যদিও অপবিত্র জিনিসের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে।" ইমাম আতা ও হাসান বসরী বলেন, পবিত্র ও অপবিত্র দ্বারা যথাক্রমে হালাল ও হারামকে বুঝানো হয়েছে।

উপদেশ ঃ বল প্রয়োগে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করে যারা গণরোষ থেকে বাঁচার জন্য সুরক্ষিত দুর্গসম উচ্চ প্রাসাদ তৈরী করে বসবাস করেছে, যারা মনোরম ফুলের বাগান নির্মাণ করে পরম আয়েশী জীবন যাপন করেছে, পৃথিবীতে উচ্চ সম্মান ও ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়েছে— ভেবে দেখুন, তারা আজ কোথায়? পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হবার সকল চেষ্টা এবং সকল স্বপ্ন তাদের ধূলিসাত হয়ে

গেছে। তারা আজ তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করতে শুরু করেছে। সেই পরিণামের কথা চিন্তা করে জুলুম নির্যাতন ও পরস্ব অপহরণের পথ চিরতরে বর্জন করে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চায়, তার জীবনের যে কয়টি দিন অবশিষ্ট আসে, তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত।

২৯. হারাম খাওয়া ও যে কোন হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ভোগ দখল করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ "তোমরা একে অপরের সম্পদ অবৈধভাবে ভোগদখল করোনা।" হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন শপথ দ্বারা অন্যের সম্পত্তির ওপর নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করা। অবৈধভাবে তথা হারাম পন্থায় উপার্জন দুই রকমের হতে পারে। প্রথমত ঃ সম্পূর্ণরূপে শক্তি প্রয়োগে ও অত্যাচারের মাধ্যমে, যেমন আত্মসাত, অপহরণ, জবরদখল, গচ্ছিত সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ভোগদখল চুরি ডাকাতি ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত ঃ খেলাধুলা, চালাকী, প্রতারণা ইত্যাদি। লটারী ও জুয়ার মাধ্যমে অর্থ জেতাও এর আওতাভুক্ত। সহীহ্ বুখারীতে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কিছুলোক এমন আছে যারা আল্লাহর বান্দাদের সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট রয়েছে।" সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধুলিধুসরিত দেহ নিয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে "হে প্রভু" "হে প্রভু" বলে মুনাজাত করে, অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারাই সে পুষ্টি অর্জন করে। তার মুনাজাত কিভাবে কবুল হবে?" হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে রাসূল, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমার দোয়া কবুল হয়। রাসূল (সা) বললেন ঃ হে আনাস, তোমার উপার্জনকে হালাল রাখ, তোমার দোয়া কবুল হবে। মনে রেখ, কেউ যদি হারাম খাদ্যের এক গ্রাসও মুখে নেয়, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দোয়া কবুল হবেনা।" বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা যেমন তোমাদের মধ্যে তোমাদের জীবিকা বন্টন করেছেন, তোমাদের মধ্যে তোমাদের স্বভাব চরিচত্ত বন্টন করেছেন। দুনিয়ার সম্পদ তিনি যাকে ভালোবাসেন তাকেও দেন, যাকে ভালোবাসেন না তাকেও দেন। কিন্তু দীন তথা আখিরাতের সম্পদ কেবল তাকেই দেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন। আল্লাহ্ যাকে দীন দান করেছেন, বুঝতে হবে যে, তিনি তাকে

ভালোবেসেছেন। কোন বান্দা হারাম সম্পদ উপার্জন করে তা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করলে তাতে সে বরকত ও কল্যাণ লাভ করবেনা। অন্যকে দান করলে সেই দানও কবুল হবেনা, আর যেটুকু সে দুনিয়ায় রেখে যাবে, তা তার জন্য জাহান্নামের সম্বল হবে। আল্লাহ্ মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না, মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করেন।" (মুসনাদে আহমাদ) হযরত ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পৃথিবী মিষ্ট ও শ্যামল। এখানে যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করবে এবং ন্যায়সংগত পথে তা ব্য করবে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন তাকে জান্নাত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করবে এবং তা অন্যায় পথে ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তাকে অপমানজনক স্থানে নির্বাসিত করবেন। আর হারাম সম্পদ হস্তগতকারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন আগুনে জ্বলবে।" রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করবে তার পরোয়া করেনা, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কোন্ দরজা দিয়ে জাহান্নামে ঢুকাবেন তার পরোয়া করবেন না।" হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ "কোন মুসলমানের হারাম জিনিস খাওয়ার চেয়ে মাটি খাওয়াও ভালো।" (মুসনাদে আহমাদ) হযরত ইউসুফ বিন আসবাত (রহঃ) বলেন ঃ কোন যুবক যখন ইবাদাতে মনোনিবেশ করে, তখন শয়তান নিজের সহকর্মীদেরকে বলেঃ খোঁজ নাও লোকটি কী খায়! সে যদি হারাম খায়, তাহলে সে যত ইচ্ছা ইবাদাত করে ক্লান্ত হোক, বাধা দিওনা। কেননা সে নিজেই নিজের ইবাদাত ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। হারাম খাওয়া অব্যাহত রেখে ইবাদাত তার কোন কাজে লাগবেনা।" এ উক্তিটি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা সমর্থিত। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একজন ফিরিশতা বাইতুল মাকদিসে প্রতি রাতে ও দিনে ঘোষণা দিতে থাকে যে, "যে ব্যক্তি হারাম খায় আল্লাহ্ তার ফরয ও নফল কিছুই গ্রহণ করেন না।" আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক বলেন ঃ "সন্দেহজনক একটি দিরহাম গ্রহণ করার চাইতে আমার কাছে লক্ষ টাকা দান করা অধিকতর পছন্দনীয়।" রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম অর্থ ব্যয় করে হজ্জে গিয়ে বলে "লাব্বায়েক" (প্রভু আমি হাজির), তাকে একজন ফিরিশতা বলে ঃ তোমার লাব্বায়েক গ্রহণযোগ্য নয়। তোমার হজ্জ তোমার মুখের ওপরই ছুড়ে দেয়া হলো।" (তাবারানী)

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে কোন কাপড় কিনলো এবং তার মধ্যে এক দিরহাম অসৎ উপায়ে অর্জিত, সে যতদিন ঐ কাপড় পরিহিত থাকবে ততদিন তার নামায কবুল

হবেনা।" ইমাম ওহব ইবনুল ওয়ারদ বলেন! তুমি যদি জিহাদের ময়দানে যোদ্ধা অথবা প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত থাক, তাতেও কোন ফায়দা হবেনা, যতক্ষণ তুমি যা খাচ্ছ তা হালাল না হারাম, তা লক্ষ্য না রাখ।" হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ "আল্লাহর কাছে তওবা করে সৎ উপার্জনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ কোন হারামখোরের নামায কবুল করেন না।" হযরত সুফিয়ান সাওরী বলেন ঃ "যে ব্যক্তি হারাম অর্থ দ্বারা কোন সৎ কাজ করে, সে পেশাব দ্বারা কাপড় ধৌতকারীর মত। কাপড় পবিত্র পানি ছাড়া পাক হয় না। আর গুনাহর কাফফারাও হালাল উপার্জন ছাড়া সম্ভব নয়।" হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ "আমরা হারামের মধ্যে পতিত হওয়ার ভয়ে হালাল সম্পদের দশ ভাগের নয় ভাগ বর্জন করতাম।" রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে শরীর হারাম খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, তা জান্নাতে যাবেনা।" (তিরমিযী) সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকরের একজন গোলাম ছিল। সে হযরত আবু বকরকে মুক্তিপণ হিসাবে কিছু অর্থ দেয়ার শর্তে মুক্তি চাইলে তিনি তাতে সম্মত হন। অতঃপর সে প্রতিদিন তার মুক্তিপনের কিছু অংশ নিয়ে আসতো। হযরত আবু বকর তাকে জিজ্ঞেস করতেন, কিভাবে এটা উপার্জন করে এনেছ? সে যদি সন্তোষজনক জবাব দিত তবে তিনি তা গ্রহণ ও ভোগ করতেন, নচেত করতেন না। একদিন সে রাতের বেলায় তাঁর জন্য কিছু খাবার জিনিস নিয়ে এল। সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। তাই তাকে ঐ খাদ্যের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভুলে গেলেন এবং এক লোকমা খেয়ে নিলেন। তাঁর পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ খাবার তুমি কিভাবে সংগ্রহ করেছ? সে বললোঃ আমি জাহেলিয়ত আমলে লোকের ভাগ্যগণনা করতাম। আমি ভালো গণনা করতে পারতাম না। কেবল ধোকা দিতাম। এ খাদ্য সেই ভাগ্যগণনার উপার্জিত অর্থ দ্বারা সংগৃহীত। হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ কী সর্বনাশ! তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করেছ। তারপর গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বমিতে খাওয়া জিনিস বেরুলোনা। উপস্থিত লোকেরা তাকে বললো যে, পানি না খেলে খাওয়া জিনিস বেরুবেনা। তখন তিনি পানি চাইলেন। পানি খেয়ে খেয়ে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য পেট থেকে বের করে দিলেন। লোকেরা বললোঃ আল্লাহ আপনার ওপর দয়া করুন। ঐ এক লোকমা খাওয়ার কারণেই কি এত সব? হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ ঐ খাদ্য বের করার জন্য যদি আমাকে মৃত্যু বরণও করতে হতো, তবুও আমি বের করে ছাড়তাম। কেননা আমি শুনেছি, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে তার জন্য দোজখের আগুনই উত্তম।" তাই আমি আশংকা

করছিলাম যে, এই এক লোকমা খাদ্য দ্বারা আমার শরীরের কিছু অংশ গঠিত হতে পারে। বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন ঃ জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা, খেয়ানত, চুরি, ধোকাবাজী ও জালিয়াতি, সুদ ও সুদের দালালী, মিথ্যা সাক্ষ্য দান, ধার করে নিয়ে পরে আত্মসাত, ঘুষ খাওয়া, মাপে ও ওজনে কমবেশী করা, পণ্যের দোষ গোপন করে বিক্রি করা, জুয়া, যাদু, জ্যোতিষ গণনা, ছবি আঁকা ও তোলা, ব্যভিচার, মৃত ব্যক্তির জন্য পেশাদারী কান্না, বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ক্রেতার কাছ থেকে দালালীর পারিশ্রমিক নেয়া, ক্রেতাকে অর্থের বিনিময়ে পণ্যের সন্ধান দান, স্বাধীন মানুষ বিক্রী, মদ ও শুকর বিক্রী বাবদ অর্জিত সম্পদ ও অপহরণকৃত এতিমের সম্পদ- এই সবই হারাম সম্পদ।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন কিছু লোক তাহামার পাহাড় সমান সৎ কর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সংগে সংগেই তাকে ধুলিকণার মত বানিয়ে উড়িয়ে দেবেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে রাসূল, এটা কিভাবে সম্ভব হবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ এই লোকগুলো নামায পড়তো, রোযা রাখতো, যাকাত দিত ও হজ্জ করতো। কিন্তু যখনই কোন হারামের সংস্পর্শে আসতো, অমনি তাতে লিপ্ত হয়ে পড়তো। তাই আল্লাহ তাদের সকল নেক আমল বাতিল করে দিয়েছেন।" (তাবারানী)

বর্ণিত আছে যে, জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তিকে কেউ স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমি কোন আযাব ভোগ করছিনা। তবে দুনিয়ার জীবনে একটি সূঁচ ধার নিয়ে তা ফেরত দেইনি বলে আমার জান্নাতে যাওয়া স্থগিত রয়েছে।

উপদেশ ঃ আখিরাতের কঠিন ও অবধারিত শাস্তির কথা মনে রেখে সব সময় হারাম থেকে পরহেজ করে চলা উচিত।

৩০. মিথ্যা বলা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ "মিথ্যাবাদীদের ওপর অভিসম্পাত।" (আল বাকারা) তিনি আরো বলেন ঃ 'আল্লাহ তায়ালা মিথ্যুক অপচয়ীকে সুপথ দেখান না।" (মুমিন) সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সত্যবাদিতা মানুষকে সততার পথে টেনে নিয়ে যায়, আর সততা টেনে নিয়ে যায় জান্নাতের দিকে। কোন ব্যক্তি ক্রমাগত সত্য বলতে থাকলে এবং সত্যের পথ অন্বেষণ করতে থাকলে এক সময় তাকে সিদ্দীক তথা "পরম সত্যনিষ্ঠ" বলে আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। আর কোন ব্যক্তি

ক্রমাগত মিথ্যা বলা ও মিথ্যার পথ অন্বেষণ করতে থাকলে এক সময় আল্লাহর দরবারে তাকে 'মিথ্যুক' লেখা হয়। সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস মুনাফিকের আলামত - "চাই সে যতই নামায রোযা করুক এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করুক ঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা কবলে তা খেলাফ করে এবং আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে।" সহীহ্ আল বুখারীতে অপর এক হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ চারটি দোষ যার ভেতরে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার ভেতরে এর একটি থাকবে, সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার ভেতরে মুনাফেকীর একটি আলামত থেকে যাবে ঃ আমানতের খেয়ানত করা, ওয়াদা খেলাপ করা, মিথ্যা বলা ও ঝগড়ার সময় গালিগালাজ করা। সহীহ্ আল বুখারীতে যে দীর্ঘ হাদীসে রাসূল (সা) এর স্বপ্নের বৃতান্ত দেয়া হয়েছে, তাতে এক জায়গায় রাসূল (সা) বলেন ঃ এক শায়িত ব্যক্তির কাছে আমরা উপস্থিত হলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়িয়ে লোহার একটি অস্ত্র দিয়ে একবার তার ডানপাশের চোয়াল ও চোখ একেবারে পেছন পর্যন্ত ফেড়ে দিচ্ছে। তারপর যখনই বাম দিকে অনুরূপ ফেড়ে দিচ্ছে, তখন ডান দিকটা আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। আবার ডান দিকে পুনরায় চোয়াল ফেড়ে দিলে বাম দিক ভালো হয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই ব্যক্তি কে? আমার সংগী ফিরিশতাদ্বয় বললেন ঃ সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা মিথ্যে গুজব রটিয়ে ছেড়ে দিতো এবং তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো। আর একটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিনের স্বভাবে সব রকমের দোষ থাকা সম্ভব, কিন্তু মিথ্যা ও খেয়ানত থাকা সম্ভব নয়। রাসূল (সা) বলেন ঃ "তোমরা কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করোনা। কেননা খারাপ ধারণা জঘন্যতম মিথ্যাচার।" (সহীহ্ আল বুখারী ও মুসলিম) মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন নাঃ ব্যভিচারী বৃদ্ধ, মিথ্যুক শাসক এবং অহংকারী দরিদ্র। মুসনাদে আহমদের হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "মানুষকে হাসানোর জন্য যে মিথ্যা বলে তার সর্বানশ হোক, তার সর্বনাশ হোক, তার সর্বনাশ হোক।" মিথ্যার মধ্যে অধিকতর মারাত্মক হচ্ছে মিথ্যা শপথ। সূরা আল মুনাফিকুনে আল্লাহ তায়ালা এটিকে মুনাফিকদের স্বভাব বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুনাফিকরা জেনে শুনেও মিথ্যা শপথ করে। (২৬ নং কবীরা গুনাহ দ্রষ্টব্য) আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হাদীসে

রাসূল (সা) বলেন ঃ তিনজনের সাথে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন কথাও বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র করবেন না, অধিকন্তু তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত থাকবে ঃ যে ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি আছে, কিন্তু পথিককে তা ব্যবহার করতে দেয় না, যে ব্যক্তি খরিদ্দারকে মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি এত দামে কিনেছি, আর খরিদ্দার তা বিশ্বাস করে তা অধিক মূল্যে কিনে নেয়, অথচ আসলে সে সেই দামে তা কেনেনি, এবং যে ব্যক্তি কোন নেতার প্রতি নিছক দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য আনুগত্য করার ওয়াদা করে, অতঃপর নেতা তাকে স্বার্থ দিলে সে তার আনুগত্য করে, নচেত করেনা। রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তোমাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে, তার সাথে মিথ্যা কথা বলা নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতকতা।" রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "আল্লাহর সাথে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি হলো কোন ব্যক্তি যা দেখেনি, তাই দেখেছে বলে দাবী করা।" অর্থাৎ সে বলে আমি এরূপ স্বপ্নে দেখেছি, অথচ তা সে দেখেনি। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ কোন বান্দা ক্রমাগত মিথ্যা বলতে থাকলে তার হৃদয়ে প্রথমে একটা কালো দাগ পড়ে, অতঃপর সেই দাগ বড় হতে হতে পুরো হৃদয়টা কালো হয়ে যায়। তখন আল্লাহর কাছে তাকে মিথ্যাবাদী লেখা হয়।

সুতরাং সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কল্যাণ নিহিত আছে এমন অবস্থা ছাড়া কোন মুসলমানের কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা উচিত নয়। তার উচিত হয় সত্য বলা, নচেত চুপ থাকা। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন ভালো কথা বলে, নচেত চুপ থাকে।" এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন কথার কল্যাণকরিতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত না হলে সে কথা বলা উচিত নয়। হযরত আবু মূসা (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, হে রাসূল! মুসলমানদের মধ্যে কে উত্তম? রাসূল (সা) বললেন ঃ যার জিহবা ও হাত দ্বারা অন্য মুসলমান কষ্ট পায় না। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী) অপর হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ জেনে শুনে হারাম বাক্য উচ্চারণ করে, সে জাহান্নামে এত নিচে নিক্ষিপ্ত হবে, যা পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত অপেক্ষাও দূরে অবস্থিত।" উল্লেখ্য যে, কারো প্রাণ রক্ষা, দুইপক্ষের কলহ প্রশমিত করা এবং দাম্পত্য সম্পর্কে ভাংগন রোধ করার প্রয়োজনে মিথ্যা বলার শুধু অনুমতি আছে তা নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা অবশ্য কর্তব্য। তবে এরূপ ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার চাইতে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলা ভাল। যেমন সূর পর্বতগুহায় যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি হযরত আবু বকরকে রাসূল (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, ইনি কে? আবু বকর বললেন ঃ উনি আমার পথ প্রদর্শক।

জনৈক মনীষী বলেছেন ঃ মানুষের ভেতরে প্রায় আট হাজার চারিত্রিক দোষ রয়েছে। কিন্তু একটি গুণ তার সব দোষ ঢেকে দিতে সক্ষম। সে গুণটি হলো বাকসংযম। আর একটি গুণ তার সব দোষ দূর করতে পারে। তাহচ্ছে সত্যবাদিতা।

৩১. বিচার কার্যে অসততা ও দুর্নীতি

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল মায়েদায় বলেন ঃ "আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে যারা বিচার ও শাসন করে না তারা জালেম" . . . "আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে যারা বিচার ও শাসন করেনা তারা কাফের" . . . "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার ও শাসন করে না তারা ফাসেক।" রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে বিচারক বা শাসক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না, আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না। (হাকেম) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ বিচারক তিন প্রকারের ঃ তন্মধ্যে দুপ্রকারের বিচারক জাহান্নামে যাবে এবং এক প্রকারের বিচারক জান্নাতে যাবে। যে বিচারক সত্য ও ন্যায় কি, তা জানে এবং তদনুযায়ী বিচার করে সে জান্নাতে যাবে। আর যে বিচারক সত্য ও ন্যায় কি তা জানে না, আর যে বিচারক সত্য ও ন্যায় কি তা জেনেও ন্যায়বিচার করেনা, - এরা উভয়ে দোজখবাসী। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যে জানেনা তার কি দোষ? রাসূল (সা) বললেন ঃ "সে না জেনে বিচারক হয়েছে এটাই তার দোষ।" (হাকেম, আবু দাউদ, তিরমিযী) হযরত আবু হুরাইয়া (রা) বলেন ঃ যাকে বিচারক নিয়োগ করা হলো, তাকে যেন ছুরি ছাড়াই যবাই করা হলো।" হযরত ফযীল বিন ইয়ায বলেন ঃ "একজন বিচারপতির উচিত একদিন বিচারকার্য পরিচালনা করা, আর একদিন নিজের জন্য কান্নাকাটি করা।" ইমাম মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে (রহ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সবার আগে বিচারকদেরকেই হিসাবের জন্য ডাকা হবে।" রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন ন্যায় বিচারককে যখন কিয়ামতের দিন হিসাবের সম্মুখীন করা হবে তখন হিসাবের কঠোরতা দেখে সে আক্ষেপ করবে যে, একটা খোরমা সংক্রান্ত বিবাদেও যদি আমি দু'জনের বিচার না করতাম।" হযরত আলী (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক শাসক ও বিচারককে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে পুলসিরাতে দাঁড় করিয়ে সমগ্র মানব জাতির সামনে তার গোপন আমলনামা পাঠ করা হবে। অতঃপর সে যদি ন্যায় বিচারক সাব্যস্ত হয়, তবে আল্লাহ তাকে মুক্তি দেবেন, নচেত পুলসিরাত সহ সে জাহান্নামে পতিত হবে।"

৩২. ঘুষ খাওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ আত্মসাত করোনা, শাসকদের কাছে অর্থ নিয়ে যেওনা, যাতে তোমরা মানুষের অর্থের একাংশ অন্যায় পন্থায় ভোগ করতে পার। অথচ তোমরা জান।" অর্থাৎ তোমরা শাসকদেরকে উৎকোচ দিয়ে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা করোনা, অথচ তোমরা তো জান যে, এ রকম করা বৈধ নয়। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়কে অভিসম্পাত দিয়েছেন। ইমামগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, ঘুষদাতার ওপর অভিসম্পাত তখনই পতিত হবে, যখন সে তা দ্বারা অন্যের ক্ষতি সাধনে ব্রতী হবে অথবা নিজের প্রাপ্য নয় এমন কোন সুবিধা আদায় করতে চাইবে। কিন্তু সে যদি নিজের কোন ন্যায্য প্রাপ্য জিনিস বা অধিকার আদায়ের জন্য অনন্যোপায় হয়ে ঘুষ দেয় এবং কারো জুলুম থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দেয়, তবে তার ওপর অভিসম্পাত পতিত হবেনা। এ সংক্রান্ত যে হাদীস আবু দাউদ ও তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন, তাতে ঘুষদাতা ও ঘুষখোরের মাঝে তৃতীয় যে ব্যক্তি উভয়কে সাহায্য করে, তাকেও অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যক্তি যদি ঘুষদাতা কর্তৃক নিযুক্ত হয়, তবে ন্যায্য অধিকার আদায় ও জুলুম থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তার অবস্থা ঘুষদাতার মত হবে এবং সে অভিসম্পাতের যোগ্য হবেনা। নচেত অভিসম্পাতের যোগ্য হবে। তবে শাসকের জন্য ঘুষ আদান প্রদান সর্বাবস্থায় হারাম— চাই তা কারো অধিকার বিনষ্ট করার মাধ্যমেই করুক, অথবা কোন জুলুম প্রতিহত করার জন্যই করুক।

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করলো, অতঃপর যার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে, সে তাকে কোন হাদিয়া বা উপহার দিল, সে যদি এই হাদিয়া গ্রহণ করে, তবে তা হবে একটি বড় ধরনের সুদ খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ "তোমার ভাই এর প্রয়োজন পূরণ করে দিয়ে তার কাছ থেকে যদি উপহার গ্রহণ কর তবে তা হবে হারাম।" (উল্লেখ থাকে যে, যে ব্যক্তি কোন কাজের জন্য বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত থাকে, সে যদি তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ করে দিয়ে যার জন্য কাজ করেছে তার কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করে, তবে সেটা সর্বসম্মতভাবে ঘুষ - চাই তা উপহার, উপঢৌকন, হাদিয়া বা বখশিস যে নামেই প্রদত্ত হোক না কেন। আর যদি দায়িত্বের অতিরিক্ত হয় এবং চাকুরীর সময়ের বাইরে করা হয় তবে সে জন্য পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক নিলে তা ঘুষ হবেনা। —অনুবাদক)

বর্ণিত আছে যে, একবার একজন খৃস্টান বৈরুতে ইমাম আওযায়ীর সাথে সাক্ষাত

করে অভিযোগ করলো যে, বা'লাবাকের শাসক তার ওপর অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত খাজনা আরোপ করেছে। সে এই জুলুমের প্রতিকারে সুপারিশমূলক চিঠি লেখার জন্য ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করলো এবং তাকে হাদিয়া হিসাবে এক বোতল মধু দিল। ইমাম আওযায়ী তাকে বললেন ঃ আমি চিঠি লিখে দেব এবং মধুর বোতলটি তোমাকে ফেরত দিব। লোকটি মধুর বোতল ও চিঠি নিয়ে চলে গেল এবং ইমাম সাহেবের অনুরোধক্রমে বা'লাবাকের শাসক তার খাজনা থেকে ৩০ দিরহাম কমিয়ে দিল।

৩৩. নারীর সাথে পুরুষের এবং পুরুষের সাথে নারীর সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা গ্রহণ

সহীহ বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যেসব পুরুষ নারীর সাথে এবং যে সব নারী পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা গ্রহণ করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" উল্লেখ্য যে, পুরুষ কর্তৃক নারীর এবং নারী কর্তৃক পুরুসের কণ্ঠস্বর অনুকরণও এর আওতাভুক্ত।

সুতরাং নারী যখন পুরুষের মত আটশাট, পাতলা ও শরীরের আবরণযোগ্য অংশ অনাবৃত থাকে এমন পোশাক পরে, তখন সে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং অভিসম্পাতের যোগ্য হয়। তার এই আচরণ যদি তার স্বামী মেনে নেয় এবং তাকে এ থেকে বিরত না রাখে, তবে সেও অভিসম্পাতের যোগ্য হবে। কেননা স্ত্রীকে আল্লাহর আদেশের অনুগত রাখতে এবং তার নাফরমানী থেকে বিরত রাখতে সে আদিষ্ট। আল্লাহ বলেছেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর . . " অর্থাৎ তাদেরকে সদাচরণ শিক্ষা দাও, আল্লাহর আনুগত্য করতে আদেশ দাও এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত রাখ, যেমন তোমাদের নিজেদের বেলায় এসব জরুরী। তাছাড়া রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেক নিজ নিজ অধিনস্থ সম্পর্কে দায়ী। পুরুষ তার পরিবার সম্পর্কে দায়ী এবং কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ পুরুষরা যখন স্ত্রীদের আজ্ঞাবহ হবে, তখন পুরুষরা ধ্বংস হবে।" এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নারীর শাসনকর্ত্রী হওয়াও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনের পর্যায়ে পড়ে এবং পুরুষ কর্তৃক নারীর আজ্ঞাবহ হওয়াও নারীর অনুকরণের পর্যায়ভুক্ত। রাসূল (সা) বলেন ঃ "দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী হবে ঃ যারা গরুর লেজ সদৃশ বেত দ্বারা মানুষকে প্রহার করে এবং যে সব নারী এত

পাতলা পোশাক পরে যে তার ভেতর দিয়ে শরীরের রং দেখা যায় এবং অহংকারীর বেশে হেলে দুলে পথ চলে। এই সকল নারী জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা, যা বহুদূর থেকে পাওয়া যায়।" (সহীহ মুসলিম) হযরত নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর হযরত যুবাইরের কাছে ছিলেন। এমতাবস্থায় এক মহিলা ঘাড়ে ধনুক বহন করে মেষ পাল হাকাতে হাকাতে এগিয়ে এল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি পুরুষ না মহিলা? সে বললো ঃ মহিলা। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমরের দিকে তাকালে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীর মুখ দিয়ে পুরুষদের সাথে সাদৃশ অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে এবং মহিলাদের সাথে সাদৃশ অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল, পুরুষসুলভ পেশা অবলম্বন করে পুরুষোচিত ভংগীতে বেপর্দাভাবে চলাফেরা ও কাজ করা নারীদের জন্য পুরুষের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের পর্যায়ে পড়ে। তবে পর্দা সহকারে পেশা অবলম্বন করা ও তার কাজ করা যায়।

আর যে সমস্ত কাজের জন্য নারীদেরকে অভিশম্পাত করা হয় তা হলো বাহিরে চলাচলের সময় দেহের সৌন্দর্য ও গহনাপত্র প্রদর্শন, সুগন্ধি দ্রব্য গায়ে বা কাপড়ে মেখে চলা এবং খাট আটসাট ও পাতলা পোশাক পরা, যা দ্বারা ছতর ঢাকে না ও পর্দা হয় না। এ সবই তাবাররুজের অন্তর্গত। যার রিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কঠোর সমালোচনা করেছেন। অধিকাংশ মহিলা এগুলোতে লিপ্ত হয় বলেই রাসূল (সা) বলেছেন আমি মিরাজের রাত্রে জাহান্নাম দেখেছি এবং তার অধিকাংশ অধিবাসী দেখেছি মহিলা। তিনি একথাও বলেছেন যে, "আমি পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর কোন জিনিস রেখে যাইনি।"

৩৪. নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয় দান

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য, দায়ুস অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয়দাতা এবং পুরুষসুলভ আচরণকারী নারী।" নাসায়ীর বর্ণনায় রাসূল (সা) বলেন ঃ তিন জনের ওপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন ঃ মদখোর, পিতামাতার অবাধ্য ও আপন পরিবারে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয়দাতা।

যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী অশ্লীলতার মধ্যে লিপ্ত আছে বলে অনুমান করে, কিন্তু তার হাতে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, এবং স্ত্রীকে ভালোবাসার কারণে তাকে কিছু বলতে পারেনা, অথবা স্ত্রীর কাছে এমনভাবে ঋণগ্রস্ত আছে যে তার পরিশোধ করতে সে অপরাগ, সে বিপুল পরিমাণ দেনমোহরের দায়গ্রস্ত, অথবা বহুসংখ্যক

শিশুসন্তান রয়েছে যাদের খোরপোশের দাবী নিয়ে স্ত্রী আদালতের শরণাপন্ন হবে - এরূপ আশংকা রয়েছে বলে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাকে দায়ুস বলা যাবে না। তবে যার ভেতরে অশ্লীলতার প্রতি ঘৃণা বর্তমান নেই এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ইসলামী বিধান বিশেষত পর্দা মেনে চলতে বাধ্য করেনা তার ইহকালে ও পরকালে কোন কল্যাণ নেই এবং সে দায়ুস বলেই গণ্য হবে।

[উল্লেখ্য যে, উপরে যে ব্যতিক্রমমূলক কয়েকটি অবস্থার উল্লেখ করা হলো, তার কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে একজন মানুষের নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান, যা অনেকটা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতার মতই। পিতা ও স্বামী হিসাবে সন্তান ও স্ত্রীদের প্রায় শর্তহীন ও অবাধ আনুগত্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে শরীয়তের বিধি ও সামাজিক প্রথা উভয়ের আলোকেই। তাই নিরংকুশ কর্তৃত্বের এই পরিমন্ডলে সে যাতে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিবারকে সৎপথের ওপর বহাল রাখে, সেজন্য পবিত্র কুরআনে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, "তোমাদের নিজেদেরকে ও পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর।" আর যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাদেরকে দায়ুস বলা হয়। পরিবারে পর্দার ব্যাপারে ও শরিয়াতের অন্যান্য বিধানের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তার জন্য পরিবার-প্রধানকেই দায়ী হতে হবে এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে সে দায়ুস হবে। - অনুবাদক]

৩৫. তালাকপ্রাপ্তা নারীর তাহলীল

(অর্থাৎ বিনা সহবাসে তালাক দেয়ার শর্তে বিয়ে করা, যাতে তালাক প্রাপ্তা নারী তার পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়।) নাসায়ী ও তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন তালাক প্রাপ্তা নারীকে তার পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে ও বিয়ের শর্ত অনুসারে বিনা সহবাসে তালাক দেয়, তাকে এবং যার জন্য হালাল করে তাকে রাসূল (সা) অভিশাপ দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হযরত উমর (রা) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) এবং তাবেয়ী ফকীহগণ এই হাদীস অনুসারে কাজ করতেন। ইমাম আহমাদও স্বীয় মুসনাদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) কে তাহলীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন ঃ না, স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে ব্যতীত কোন বিয়ে চলবে না। বিয়ের নামে কোন ছলচাতুরী চলবে না। (অর্থাৎ কেবল বিয়ের ভান বা অভিনয় করা হবে, আসলে বিয়ে করা হবে না। এটা জায়েজ নয়।) আল্লাহর কিতাবের সাথে উপহাস করার অবকাশ নেই। সহবাস ছাড়াই স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়ার বাধ্যবাধকতা গ্রহণযোগ্য

নয়। উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "ভাড়াটে পাঠা কে বলবো?" সবাই বললো ঃ হা, বলুন! তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ "সহবাস না করে তালাক দিতে হবে-এই শর্ত মেনে নিয়ে যে বিয়ে করে, সেই হচ্ছে ভাড়াটে পাঠা। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের শর্তাধীন বিয়েকারী ও যার জন্য সে বিয়ে করে, তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। (ইবনে মাজা) এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলো যে, একটি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আমি বিয়ে করেছি। আমি তাকে তালাক দিয়ে তার পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য হালাল করে দিতে চাই। অথচ তার পূর্বতন স্বামী আমাকে আদেশও করেনি, আর আমি যে তার জন্য এ কাজ করছি তা সে জানেও না। এ সম্পর্কে আপনার মত কি? ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক বিয়ে ছাড়া আর সমস্ত বিয়ে অচল। তোমার যদি ভালো লাগে তবে তাকে রেখে দেবে, নচেত ছেড়ে দেবে। এ ধরনের কাজকে আমরা রাসূল (সা) এর আমলে ব্যভিচার গণ্য করতাম। হযরত উমর (রা) এ ধরনের বিয়েকে ব্যভিচার গণ্য করতেন এবং যে এ ধরনের বিয়ে করে ও যার জন্য করে- উভয়কে তিনি 'রজম' (প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদন্ড প্রদান) করার সংকল্প প্রকাশ করতেন। হযরত ইবনে উমার (রা) তাহলীল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে বিশ বছর কাটিয়ে দিলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়কে ব্যভিচারী আখ্যায়িত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমার চাচাতো ভাই স্বীয় স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়ে এখন অনুতপ্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ "সে আল্লাহর নাফরমানী করেছে। ফলে আল্লাহ তাকে এই অনুতাপজনক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। সে শয়তানের ফরমাবরদারী করেছে। তাই শয়তান তাকে এই সংকটজনক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে এবং এখান থেকে বেরুবার পথ রাখেনি।" লোকটি বললো ঃ যদি কেউ তার জন্য তার স্ত্রীকে হালাল করে দেয়ার উদ্যোগ নেয় তাহলে কেমন হয়? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ধোকা দেবে, আল্লাহ তাকে ধোকা দেবেন। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম) বলেন ঃ প্রথম স্বামী, স্ত্রী ও দ্বিতীয় স্বামী- এই তিনজনের কারো যদি তাহলীলের নিয়ত থাকে, তাহলে পরবর্তী স্বামীর সাথে অনুষ্ঠিত বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ ধরনের বিয়ে দ্বারা ঐ স্ত্রী সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হবেনা। হাসান বশরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, মালেক বিন আনাস, লাইস বিন সা'দ, সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আহমাদ- এঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, এক্ষেত্রে স্ত্রী সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হবেনা। ইমাম শাফেয়ীর মতে তাহলীলের শর্তে আক্দ সম্পন্ন হলে সেই

বিয়েই অবৈধ। কেননা তা মুত'য়া বিয়ের ন্যায় অস্থায়ী, যা শরীয়তসিদ্ধ নয়। তবে আ'কদ সম্পন্ন হওয়ার সময়ে নয় বরং তার আগে বা পরে এই শর্তের উল্লেখ করা হলে শর্ত বাতিল হবে ও বিয়ে শুদ্ধ হবে।

৩৬. প্রস্রাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা

প্রস্রাব থেকে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা মূলতঃ খৃষ্টানদের রীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "তোমরা পোশাককে পবিত্র কর।" (সূরা আল-মুদ্দাসসির) হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) দুটো কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ "এই কবর দুটির অধিবাসীদ্বয় আযাব ভোগ করবে। কারণ এদের একজন চোগলখুরি করে বেড়াতো। অপরজন প্রস্রাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না।" (সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "তোমরা প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন কর। কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব এ কারণেই হয়ে থাকে।" (দারকুত্নী)

যে ব্যক্তি পেশাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করেনা, তার দেহ ও পোশাক উভয়ই অপবিত্র হয়ে যায় এবং তার নামায হয়না। তাবরানী ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ জাহান্নামবাসী তো এমনিতেই অবর্ণনীয় দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। উপরন্তু চার শ্রেণীর মানুষের কারণে তাদের দুঃখ যন্ত্রণা আরো বেড়ে যাবে। ফলে তারা উত্তপ্ত পানি ও আগুনের মধ্য দিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকবে এবং নিজেদের জন্য মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে। অতঃপর জাহান্নামবাসী একে অপরকে বলবে ঃ এ চারটি লোকের পরিচয় কি, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করে আমাদের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়েছে। তখন অপরজন বলবে ঃ ওদের একজনকে একটি আগুনের খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে? অপরজন নিজের বেরিয়ে পড়া নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অপরজনের মুখ থেকে অনবরত পুঁজ ও রক্তের বমি হচ্ছে। আর একজন নিজের শরীরের গোশ্ত কামড়িয়ে খাচ্ছে। অতঃপর খাঁচায় আবদ্ধ লোকটিকে লক্ষ্য করে বলা হবে ঃ এই অভিশপ্ত লোকটির কি হয়েছে, যে আমাদের যন্ত্রণার ওপর যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়েছে? সে বলবে ঃ আমি অভিশপ্ত এজন্য যে, নানাভাবে মানুষের সম্পদ লুটেপুটে খেতাম, অতঃপর সেই সমস্ত দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েই মারা গিয়েছিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে বেড়ায়, তাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করা হবে। সে বলবে ঃ আমি অভিশপ্ত এ জন্য যে, প্রস্রাব সম্পর্কে সাবধান থাকতাম না। এবং তা ধুয়ে পরিষ্কার করতাম না। অতঃপর যার মুখ দিয়ে অনবরত রক্ত ও পুঁজের বমি হতে থাকবে, তাকে একইভাবে জিজ্ঞাসা

করা হলে সে বলবে ঃ আমি অভিশপ্ত এজন্য যে, আমি যে কোন খারাপ কথা শুনে মজা পেতাম এবং একজনের কথা অপরজনের কাছে পৌছে দিয়ে চোগলখুরি করে শত্রুতা বাধিয়ে দিতাম। অতঃপর যে নিজের দেহের গোশ্ত কামড়ে খাবে তাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলবে ঃ আমি এজন্য অভিশপ্ত যে, আমি মানুষের গোশ্ত খেতাম, অর্থাৎ গীবত করতাম।' আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সব জঘন্য পাপ থেকে রক্ষা করুন!

৩৭. রিয়া অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা

আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ও আলামত হিসাবে বর্ণনা করে বলেন ঃ "তারা মানুষকে দেখায় এবং আল্লাহকে কদাচিৎ স্মরণ করে।" (সূরা আন নিসা) "সেই সব নামাযীর জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে এবং মানুষকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করে না।" (সূরা আল মাউন) "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের সদকাগুলোর খোঁটা দিয়ে নষ্ট করে দিওনা, যেমন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দানকারী ব্যক্তি নষ্ট করে।" (সূরা আল বাকারাহ) "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত লাভের আশা করে, তার সৎ কাজ করা উচিত এবং নিজের রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" (সূরা আল কাহ্ফ) অর্থাৎ অন্যকে দেখিয়ে খুশী করার উদ্দেশ্যে ইবাদাত করা উচিত নয়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমে তিন ব্যক্তির বিচার অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছিল। তাকে হাজির করে তাকে দেয়া আল্লাহর নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে সকল নিয়ামতের স্বীকৃতি দেবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি এই সমস্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কী কাজ করেছ? সে বলবে ঃ আমি তোমার জন্য লড়াই করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন ঃ "তুমি মিথ্যা বলেছ। আসলে তোমাকে যাতে লোকে বীর বলে সেইজন্য লড়াই করেছিলে। লোকে তোমাকে তো বীর বলেছে।" অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করেছিল। তাকে হাজির করে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ তুমি এই বিপুল সম্পদ ছাড়া কী সৎ কাজ করেছ? সে বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পথে যেখানেই অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন দেখেছি, সেখানে অর্থ ব্যয়ে ইতস্তত করিনি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি

মিথ্যা বলেছ। তুমি আমার পথে নয়, বরং লোকে যাতে তোমাকে দানশীল বলে প্রশংসা করে, সেই জন্য দান করেছ। লোকেরা তোমাকে তো দানশীল বলেছেই।" অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয় ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেছিল, অন্যকেও জ্ঞান বিতরণ করতো এবং কুরআন অধ্যয়ন করতো। তাকে হাজির করে তাকে প্রদত্ত আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে এবং সে তা স্বীকার করবে। জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি এই ইসলামী জ্ঞান দ্বারা কী কাজ করেছ? সে বলবে ঃ আমি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেছি, জ্ঞান বিতরণও করেছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য আল কুরআন অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং লোকেরা যাতে তোমাকে ক্বারী বলে প্রশংসা করে, সেই জন্য অধ্যয়ন করেছ। অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে।" (সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) আরো বলেন! "যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য সৎ কাজ করে, আল্লাহ তাকে শুনাবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য করে, আল্লাহ তাকে দেখাবেন।" (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম) ইমাম খাত্তাবী বলেন, এ হাদীসের মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষের জন্য নয় বরং মানুষকে শুনানো ও দেখানোর জন্য কাজ করে, আল্লাহ তাকে এভাবে শাস্তি দেবেন যে, তার কাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিয়ে কিয়ামতের দিন জনসমক্ষে অপমানিত করবেন। রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ সামান্যতম রিয়াও শিরকের শামিল। (তাবরানী, হাকেম) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর যে জিনিসটি ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করি, সেটি হচ্ছে ছোট শিরক। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে রাসূলাল্লাহ! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন ঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা। আল্লাহ যেদিন তার বান্দাদেরকে কর্মফল দেবেন সেদিন বলবেন ঃ যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা সৎ কাজ করতে, তাদের কাছে চলে যাও, এবং দেখ তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা।" (আহমাদ, বায়হাকী) পবিত্র আল কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ "তাদের সামনে আল্লাহর পক্ষ হতে এমন জিনিস প্রতিভাত হবে, যা তারা কল্পনাও করেনি।" এর ব্যাখ্যা প্রসংগে কেউ বলেন যে, তারা এমন সব কাজ করতো, যাকে তারা দুনিয়ার সৎ কাজ মনে করতো, কিন্তু কিয়ামতের দিন তা খারাপ কাজ বলে প্রতিভাত হবে। এই আয়াত পড়ে কোন কোন বুযুর্গ বলতেন ঃ রিয়াকারদের সর্বনাশ হোক।" ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের

দিন রিয়াকারকে চারটি নাম ধরে ডেকে বলা হবে : ওহে রিয়াকার, ওহে ভণ্ড, ওহে পাপিষ্ঠ, ওহে ক্ষতিগ্রস্ত। যাও, যাকে খুশী করার জন্য কাজ করেছিলে, তার কাছ থেকে তোমার পুরস্কার নাওগে। আমার কাছে তোমার জন্য কিছুই নেই।" বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে ঘাড় নিচু করে চলতে দেখলেন। তিনি বললেন : তুমি ঘাড় উঁচু করে চল। ঘাড় নিচু করাতে বিনয় নেই– বিনয় থাকে অন্তরে।" হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, মসজিদে সিজদায় থাকাকালে উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে। আবু উমামা তাকে বললেন : এরূপ কান্নাকাটি তোমার বাড়ীতে বসে করলেই ভালো করতে। ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-মুবারক বলেন : "তোমার কাকুতি মিনতি রাত্রিকালে প্রকাশ্যে কর। কেননা রাত্রিকালে ওঠা আল্লাহর জন্য আর দিনের বেলায় ওটা মানুষের জন্য হয়ে থাকে।" হযরত আলী (রা) বলেন : রিয়াকারের আলামত এই যে, একাকী থাকলে উদাসীন ও অলস হয়ে যায়, আর লোকজনের মধ্যে থাকলে সক্রিয় হয় এবং প্রশংসা করলে বেশী করে সৎ কাজ করে, আর ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে বা নিন্দা সমালোচনা করলে সৎ কাজ কমিয়ে দেয়। হযরত ফযীল বিন ইয়ায বলেন : মানুষকে খুশী করার জন্য সৎ কাজ করা শিরক, আর মানুষের রোষের ভয়ে সৎ কাজ ছেড়ে দেয়া রিয়াকারী। ইখলাস হলো উভয় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করার নাম। আল্লাহ আমাদেরকে রিয়া থেকে মুক্তি দিন ও ইখলাস দান করুন। আমীন।

(উল্লেখ্য যে, মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে অথবা মানুষকে সৎ কাজে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য থাকলে প্রকাশ্যে সৎ কাজ করা দোষের নয়। যেমন আল্লাহ বলেন : যারা দিনে ও রাতে প্রকাশ্যে ও গোপনে অর্থ দান করে, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে।" –অনুবাদক)

৩৮. নিছক দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দীনী জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জন করা, তা গোপন করা এবং ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল না করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। (সূরা ফাতির) অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে। ইবনে আব্বাস বলেন : অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যারা তার ক্ষমতা ও প্রতাপ সম্পর্কে অবগত আছে তারাই তাকে ভয় করে। ইমাম শা'বী বলেন : যে আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই জ্ঞানী। রবী ইবনে আনাস বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, সে জ্ঞানী নয়। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন : "আমি যে সুস্পষ্ট বাণী পথ নির্দেশিকা নাযিল করেছি, তা আমি মানুষের জন্য এই

কিতাবে বিশদভাবে বর্ণনা করার পরও যে ব্যক্তি তা গোপন করে, আল্লাহ ও অভিশাপকারীরা তাদেরকে অভিসম্পাত করেন।" (সূরা আল বাকারা)

এ আয়াত ইহুদী আলেমদের সম্পর্কে নাযিল হয়। এতে "সুস্পষ্ট বাণীসমূহ" দ্বারা হত্যা ও ব্যভিচার প্রভৃতির শরীয়ত নির্দেশিত শাস্তির বিধান ও অন্যান্য আইন, "পথ নির্দেশিকা" দ্বারা রাসূল (সা) এর আনীত সামগ্রিক বিধান ও তার প্রশংসা, "মানুষ" দ্বারা বনী ইসরাইল, "কিতাব" দ্বারা তাওরাত এবং "অভিশাপকারীরা" দ্বারা জ্বিন ও মানুষ ছাড়া আর সব কিছুকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : যে কোন দু'জন মুসলমান পরস্পরকে অভিশাপ দিলে তা ইহুদী ও খৃস্টানদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। কেননা তারা মুহাম্মাদ (সা) সংক্রান্ত বৃত্তান্ত তাদের কিতাবে থাকা সত্ত্বেও তা গোপন করে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন : যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের কাছ থেকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা এই কিতাবকে মানুষের কাছে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করবে এবং কোনক্রমেই তার কিছুমাত্র গোপন করবে না। কিন্তু তারা এই প্রতিশ্রুতিকে পেছনে ফেলে রাখলো এবং এর বিনিময়ে জঘন্য স্বার্থ খরিদ করলো। তাদের খরিদ করা জিনিস অত্যন্ত নিকৃষ্ট।"

ইমাম ওয়াহেদী বলেন : এ আয়াত মদীনার ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়। আল্লাহ তাওরাতে তাদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছেন (অর্থাৎ কঠোর আদেশ দিয়েছেন) যে, তারা যেন অবশ্যই মুহাম্মাদ (সা) এর ব্যাপারে বর্ণিত তথ্যাবলী, তার প্রশংসা ও নবুওয়াতের বিষয়গুলো প্রকাশ করে এবং কোনক্রমেই তা গোপন না করে। কিন্তু সেই অংগীকার বা আদেশ তারা পেছনে ফেলে রাখলো অর্থাৎ অমান্য করলো। রাসূল (সা) বলেন : যে জ্ঞান বা বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় সেই জ্ঞান বা বিদ্যা যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে শিখবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবন মাজাহ) রাসূল (সা) আরো বলেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করলো এই উদ্দেশ্যে যে, সে সকল জ্ঞানীদের মধ্যে গৌরবের অধিকারী হবে, অথবা বেকুফ লোকদের সাথে তর্কে লিপ্ত হবে, অথবা জনগণের মন তার দিকে আকৃষ্ট হবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (জামে আত্ তিরমিযী) রাসূল (সা) আরো বলেন : যার কোন বিষয় জানা আছে, অথচ তাকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সে উক্ত জ্ঞানকে গোপন করে কিয়ামতের দিন তার ঘাড়ে আগুনের লাগাম পরানো হবে। সহীহ মুসলিম, জামে আত্ তিরমিযী ও সুনান আন্ নাসায়ীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এই বলে দোয়া করতেন যে, "যে জ্ঞান আমার

উপকার করেনা (অর্থাৎ আখেরাতে) তা থেকে পানাহ চাই।" তিরমিযী ও ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি (দীন সংক্রান্ত) জ্ঞান অর্জন করলো, অথচ তদনুযায়ী আমল করলো না, তার জ্ঞান কেবল তার অহংকারই বাড়াবে। আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ অসৎকর্মশীল আলেমকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সে সময় লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আপনার এ অবস্থা কেন হলো? আমরা তো আপনার কাছ থেকে হেদায়েত লাভ করতাম। সে বলবে ঃ আমি তোমাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করতাম, নিজে তা করতাম।

৩৯. খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ "হে মুমিনগ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের খেয়ানত করোনা। অথচ তোমরা (এর গুরুত্ব) জান।" (আল আনফাল)

ইমাম ওয়াহেদী (রহ) বলেন যে, এ আয়াত সাহাবী আবু লুবাবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। বনু কুরাইযা গোত্রের পল্লীতে তাঁর স্ত্রীও সন্তানেরা বসবাস করছিল। রাসূল (সা) বনু কুরাইযাকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। তিনি আবু লুবাবাকে কোন প্রয়োজনে বনু কুরাইযার কাছে পাঠিয়েছিলেন। বনু কুরাইযার লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ "হে আবু লুবাবা! আমাদের ব্যাপারে সা'দের রায় অনুসারে আমরা যদি নেমে আসি, তা হলে আমাদের কি হবে বলে তোমার মনে হয়? আবু লুবাবা নিজের গলার দিকে ইংগিত দিয়ে বুঝালেন যে, তোমাদেরকে যবাই করা হবে। কাজেই নেমনা। তাঁর এ কাজটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা ছিল। আবু লুবাবা নিজেও স্বীকার করেন যে, আমি কাজটি করার সংগে সংগেই বুঝতে পারলাম যে, আমি খিয়ানত করে ফেলেছি। এরপর আবু লুবাবা মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে নিজেকে ছয়দিন যাবত বেঁধে রাখেন এবং তাঁর তওবা কবুল হবার ঘোষণা আসার পরই নিজেকে মুক্ত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর যা কিছুই ফরয করেন তাই আমানত। আর আল্লাহর আদেশ বা নিষেধ অমান্য করাই আমানতের খেয়ানত।

রাসূল (সা) বলেছেনঃ 'মুনাফিকের আলামত তিনটিঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন ভংগ করে এবং যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় তখন তার খেয়ানত করে। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) সহীহ মুসলিমে যে কথাটি সংযোজন করা হয়েছে তা হলোঃ "যদিও সে নামায

রোযা করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে।" রাসূল (সা) আরো বলেনঃ যে আমানতদার নয় তার ঈমান নেই এবং যে ওয়াদা পালন করেনা তার দীন নেই। (আহমাদ, বাযায, তাবরানী) খিয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা সব কিছুতেই খারাপ। তবে একটা অপরটার চেয়ে খারাপ হতে পারে। যে ব্যক্তি সামান্য জিনিসে আমানতের খেয়ানত করে, সে কারো ধন সম্পদ ও পরিবার পরিজনের ব্যাপারে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বড় বড় অন্যায় করে, তার মত নয়। রাসূল (সা) বলেছেনঃ যে তোমাকে বিশ্বাস করে তার বিশ্বাস রক্ষা কর আর যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করোনা। আবার হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেনঃ মুমিনের মধ্যে আর যত দোষই থাক, খিয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচার থাকতে পারেনা। (আহমদ) রাসূল (সা) বলেনঃ আল্লাহ বলেছেন, দুই ব্যক্তি যখন একত্রে কোন কাজ করে, তখন আমি তাদের তৃতীয় জন হই। যতক্ষণ তারা একে অপরের সাথে খিয়ানত অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা না করে। (অর্থাৎ খিয়ানত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক শরীকী কাজে আল্লাহর রহমত থাকে।) (আবু দাউদ) রাসূল (সা) আরো বলেনঃ মানুষের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে সদগুণটি তিরোহীত হবে তা হচ্ছে আমানতদারী বা বিশ্বস্ততা, আর সর্বশেষ যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হচ্ছে নামায এবং অনেক নামাযী এমন রয়েছে যে কল্যাণ লাভ করেনা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "আমানতে খেয়ানতকারীকে কেয়ামতের দিন হাজীর করা হবে এবং বলা হবে "তোমার আমানত ফেরত দাও।" সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে ফেরত দেব? দুনিয়া তো ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন তার কাছে যে জিনিসটি আমামত রাখা হয়েছিল, তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থলে হুবহু যে আকারে রাখা হয়েছিল সেই আকারে দেখানো হবে। অতপর বলা হবে যে, তুমি ওখানে নেমে যাও এবং ওটা বের করে নিয়ে এস। অতঃপর সে নেমে যাবে এবং জিনিসটি ঘাড়ে করে নিয়ে আসবে। জিনিসটি তার কাছে দুনিয়ার সকল পাহাড়ের চেয়ে ভারী মনে হবে। সে মনে করবে যে, জিনিসটি নিয়ে আসলে সে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু জাহান্নামের মুখের কাছে আসা মাত্র আবার আমানতের জিনিসসহ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পড়ে যাবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। অতঃপর ইবনে মাসউদ বলেনঃ নামায, ওযু, গোছল, ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবহৃত দাড়িপাল্লা সবই আমানত। আর গচ্ছিত সম্পদ সবচেয়ে বড় আমানত।"

৪০. নিজের কৃত দানখয়রাত ও অনুগ্রহের দোহাই দেয়া, খোটা দেয়া ও প্রচার করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের দানখয়রাতের দোহাই দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে দানখয়রাতকে নষ্ট করে দিওনা।" (সূরা আল বাকারাহ) সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছেঃ পায়ের গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত কাপড় পরিধানকারী, নিজের কৃত দান সদকা ও অনুগ্রহের দোহাই দাতা ও প্রচারকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী।" সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেনঃ তিন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে নাঃ পিতামাতাকে অসন্তুষ্টকারী, মদ্যপায়ী ও নিজের কৃত অনুগ্রহ ও দানখয়রাতের প্রচারকারী ও দোহাই দানকারী।" অর্থাৎ যে কাউকে কিছু দান করে ও তারপর সেই দানের দোহাই দেয় ও প্রচার করে। রাসূল (সা) বলেছেনঃ তোমরা নিজেদের কৃত দানের প্রচার করোনা এতে দানের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায় ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। ইমাম ইবনে সিরিন শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলছেঃ আমি তোমাকে অমুক জিনিস দিয়েছি, অমুক উপকার করেছি। ইবনে সিরীন তাকে বলেনঃ চুপ কর, উপকার করে তার হিসাব করলে কোন সওয়াব হয়না।

৪১. অদৃষ্টকে অস্বীকার করা

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল কামারে বলেনঃ "আমি প্রতিটি জিনিস পরিচ্ছন্নভাবে সৃষ্টি করেছি।" ইমাম ইবনুল জাওসী বলেন যে, এ আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে দু'টো মত রয়েছে। প্রথম মত এইযে, মক্কার মুনাফিকরা রাসূল (সা) এর কাছে এসে অদৃষ্ট নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আর আবু উমামা (রা) এর বর্ণনা অনুসারে এ আয়াত নাযিল হয় অদৃষ্টে অবিশ্বাসী গোষ্ঠী সম্পর্কে। দ্বিতীয় মত এই যে, নাজরানের খৃস্টান পাদ্রী রাসূল (সা) এর কাছে এসে বলেছিল যে, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি মনে কর পাপ কাজ অদৃষ্ট মোতাবিক হয়ে থাকে? আসলে তা নয়। তখন রাসূল (সা) বললেনঃ "তোমরা খোদাদ্রোহী।" এই সময় আয়াত নাযিল হয়। সূরা আল হাদীদে আল্লাহ বলেনঃ "পৃথিবীতে এবং তোমাদের জীবনে যে বিপদ মুসিবত আসুক, তা তোমাদের সৃষ্টির আগে থেকেই একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ কাজ। কাজেই তোমরা যা হারাও তার জন্য আফসোস করোনা

এবং আল্লাহ যা কিছু তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য গর্বিত ও উল্লাসিত হয়োনা। আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিত মানুষকে ভালবাসেন না।"

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেনঃ আল্লাহ যখন কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তীদেরকে ও পরবর্তীদেরকে একত্রিত করবেন, তখন তাঁর আদেশক্রমে জনৈক ফেরেশতা পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা শুনতে পারে এত জোরে ঘোষণা করবেন যে, আল্লাহর অবাধ্যরা কোথায়? তখন কাদরিয়াগণ (অর্থাৎ অদৃষ্টের অবিশ্বাসীগণ) উঠে দাঁড়াবে। তাদেরকে তৎক্ষণাত জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কাদরিয়া গোষ্ঠীর মতবাদ এই যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে গুনাহর কাজের ক্ষমতা দেবেন, আবার তাকে শাস্তিও দেবেন, এটা সম্ভব নয়। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এইযে, আল্লাহ মানুষকে ভালমন্দ সব রকম কাজের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। ভালো কাজ করলে সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় ও পুরস্কৃত হয়। আর মন্দ কাজ করলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় ও শাস্তি পায়। আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন। "আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কাজকে সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ মানুষের ভালোমন্দ সব কাজ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। অন্য আয়াতে বলেছেনঃ "তিনি মানুষের বিবেককে পাপ ও পুণ্য জানিয়ে দিয়েছেন।" অর্থাৎ তাকে পাপ ও পুণ্য উভয়ের জন্য তাকে ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়েছেন। রাসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা এক শ্রেণীর মানুষকে অনুগ্রহপূর্বক সৎ কাজের প্রেরণা দেন এবং তাদেরকে তার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেন, আর অপর এক শ্রেণীর মানুষকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন, ফলে তাদেরকে অপমানিত করেন। তাদের অপকর্মের জন্য তাদেরকে ধিকৃত করেন এবং যে কাজ দ্বারা তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন, তা ছাড়া অন্য কোন কাজে তারা সমর্থ হয়না। অতপর তাদেরকে শাস্তি দেন। অথচ এ সব সত্ত্বেও আল্লাহ ন্যায় বিচারক।"

রাসূল (সা) বলেছেনঃ জেনে রাখ, সমগ্র মানব জাতি যদি তোমার কোন উপকার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবুও তারা আল্লাহ যতটুকু তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার চেয়ে বেশী উপকার করতে পারবেনা। আর যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবুও আল্লাহ যেটুকু নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা ছাড়া আর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। "কলমগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং কাগজগুলো শুকিয়ে গেছে।" অর্থাৎ অদৃষ্টে যা কিছু লেখা হয়েছে তা চূড়ান্ত। নতুন করে আর কিছু লেখা হবেনা এবং নতুন কিছু সংঘটিতও হবেনা।

[উল্লেখ্য যে, তাকদীর বা অদৃষ্টে বিশ্বাস করা রিসালাত, আখেরাত ও কিতাবে

বিশ্বাস করার ন্যায় ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। তাই তাকদীরে অবিশ্বাস করা শুধু কবীরা গুনাহ নয়, কুফরীও বটে। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও মতভেদ রয়েছে তবে সকল মতভেদের উর্দ্ধে উঠে এই মর্মে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা ভালো ও মন্দ কাজের নিয়ত বা ইচ্ছা করাতে এবং সে জন্য চেষ্টা করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। আর এই স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে সে যে ইচ্ছা ও চেষ্টা করবে, তার জন্যই তাকে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু কাজটি সমাধা করার ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়নি এবং তার জন্য সে দায়ীও হবেনা। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল এবং সে জন্য সে তাকে উপযুক্ত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলো। এতে আহত ব্যক্তি যদি নিহত না হয়, তবুও আক্রমণকারী আল্লাহর কাছে খুনের দায়ে দোষী হবে এবং শাস্তি পাবে। কেননা আয়ু না ফুরালে ও মৃত্যুর নির্দ্ধারিত সময় সমাগত না হলে কারো মৃত্যু ঘটানো যায়না। কিন্তু ইচ্ছা ও সক্রিয় চেষ্টার জন্য হত্যার গুনাহ সে এড়াতে পারবেনা। কারণ তার ক্ষমতায় যা ছিল তা সে পুরোপুরি করেছে। এ বক্তব্যের সপক্ষে একটি হাদীস উল্লেখ করা যাচ্ছে। রাসূল (সা) বলেছেনঃ যখন দুই ব্যক্তি পরস্পরকে হত্যা করার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যে হত্যা করেছে সে জাহান্নামী হবে এতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন দোজখে যাবে? রাসূল (সা) বললেনঃ সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিল।"-অনুবাদক]

৪২. মানুষের গোপনীয় দোষ জানার চেষ্টা করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ তোমরা গোপনীয় জিনিসের তল্লাশী করোনা। তাফসীরকারগণ বলেনঃ এর অর্থ মানুষের গুপ্ত দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করোনা। অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরী করতে নিষেধ করা হয়েছে। একবার হযরত ইবনে মাসউদকে বলা হলো যে, ওয়ালীদ ইবনে উকবার দাড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা মদ গড়িয়ে পড়ে। তিনি বললেনঃ গোয়েন্দাগিরী করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কোন কিছু প্রকাশিত হয়ে গেলে সেটি আমরা বিবেচনা করবো।

রাসূল (সা) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কারো কথাবার্তা তার সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও আড়ি পেতে শোনে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শীসা ঢালা হবে।" একটি হাদীসে বিনা অনুমতিতে কারো চিঠি পড়তেও কঠোরভাবে নিষেধ করা করা হয়েছে।

৪৩. নামীমা বা চোখলখুরি

(ইসলামের চিরস্থায়ী বিধান হলো, কারো প্রশংসা করতে হলে তার অসাক্ষাতে আর সমালোচনা করতে হলে সাক্ষাতে করতে হয়। এই বিধান লংঘন করে যখনই কারো অসাক্ষাতে নিন্দা, সমালোচনা বা কুৎসা রটানো হয়, তখন তা শরীয়ত বিরোধী কাজে পরিণত হয়। এ ধরনের কাজ তিন রকমের হতে পারে এবং তিনটিই কবীরা গুনাহ্। প্রথমত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ বা দোষ আরোপ করা হয়, তা যদি মিথ্যা, বা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণহীন হয়, তবে তা নিছক অপবাদ। আরবীতে একে বুহতান বা কাযাফ বলা হয়। ইসলামী শরীয়তে এটি শুধু কবীরা গুনাহ্ নয়, বরং আইনত দন্ডনীয় ফৌজদারী অপরাধ। শরীয়তে এর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে ৮০ ঘা বেত্রদন্ড এবং চির জীবনের জন্য সাক্ষ্য দানের অযোগ্য ঘোষিত হওয়া। ইতিপূর্বে ২২ নং কবীরা গুনাহতে এটি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আরোপিত দোষ বা অভিযোগ যদি সত্য হয়, কিন্তু তা ইসলামের বিধি অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে ও নিভৃতে বুঝিয়ে বলে আত্মশুদ্ধির সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে ফাঁস করে দিয়ে উভয়ের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করা বা তাদের সুসম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তাকে নামীমা বা চোগলখুরি বলে। তৃতীয়তঃ যদি ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দিয়ে তাকে জনসমক্ষে হেয় করার চেষ্টা করা হয়, তবে তাকে গীবত বলা হয়। অসাক্ষাতে পরনিন্দার এই তিনটি রূপই কবীরা গুনাহ্ ও ঘৃণ্য অপরাধ। তিনটিতেই লংঘিত হয় হক্কুল ইবাদ তথা মানবাধিকার। কেননা এদ্বারা অবৈধভাবে তার মান ইজ্জত ও সম্ভ্রম বিনষ্ট করা হয়। অথচ তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত দেয়া হয় না। তাই এ অপরাধ সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা করেন না। — অনুবাদক)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ "সেই ব্যক্তির অনুসরণ করোনা, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে অসাক্ষাতে নিন্দা করে, যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগায়।" (সূরা আল কালাম)

সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন যে, চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। অপর হাদীসে আছে যে, একবার রাসূল (সা) দুটি কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ "এই দুটি কবরের অধিবাসীদ্বয় আযাবে ভুগছে। তবে কোন বড় ধরনের গুনাহের জন্য তারা আযাবে ভুগছেনা। একজন পেশাব করে ভালোভাবে পবিত্র হতোনা। আর অপর জন

চোগলখুরী করে বেড়াতো। অতঃপর তিনি খেজুরের দুটি কাটা ডাল নিয়ে উভয়ের কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন এবং বললেন ঃ ডাল দুটো না শুকানো পর্যন্ত হয়তো ওদের আযাব কম থাকবে।"

এই হাদীসে "কোন বড় ধরনের গুনাহের জন্য তারা আযাবে ভুগছেনা" এ উক্তির অর্থ এই যে, তাদের ধারণায় তাদের কৃত গুনাহ তেমন বড় ধরনের ছিলনা। এ জন্য কোন কোন রেওয়াতে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তবে অবশ্যই তা বড় গুনাহ ছিল।" সহীহ বুখারী, মুসলিম ও মুয়াতায়ে ইমাম মালিকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সবচেয়ে অধম লোক দেখতে পাবে সেই ব্যক্তিকে, যে বিভিন্ন জনের কাছে গিয়ে নিজেকে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দোমুখো আচরণ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দুটো আগুনের জিহবা দেবেন। দোমুখো আচরণ দ্বারা বুঝায় দু'জনের সাথে দু'রকমের কথা বলা। ইমাম গাযযালী (রহ) বলেছেন ঃ "দোমুখো লোক বলতে সাধারণতঃ চোখলখোরকে বুঝানো হয়ে থাকে, যে একজনকে গিয়ে বলে ঃ অমুক তোমার সম্পর্কে এরূপ কথা বলেছে। সংশ্লিষ্ট দু'পক্ষের যে কোন পক্ষ অথবা তৃতীয় কোন পক্ষ যে গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা অপছন্দ করে, সেটার প্রকাশ করাই চোগলখুরি, চাই তা কথা, লেখা, ইশারা ইংগিত বা অন্য যে কোন মাধ্যমেই করা হোক না কেন, এবং প্রকাশিত বিষয়টি কারো কথা বা কাজ বা কোন দোষত্রুটি- যাই হোক না কেন। মোটকথা, চোগলখুরি হলো, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কেউ অথবা তৃতীয় কেউ অপছন্দ করে এমন কোন গোপন তথ্য ফাঁস করা। মানুষের যে অবস্থাই নজরে পড়ুক না কেন, তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করায় যদি সমাজের উপকার না হয় বা তা দ্বারা সমাজকে কোন গুনাহ থেকে রক্ষা করা না যায়, তাহলে তা থেকে বিরত থাকা উচিত।" ইমাম গাযযালী আরো বলেছেন ঃ যার কাছে কেউ কারো সম্পর্কে চোগলখুরি করে, এবং বলে যে, অমুক তোমার সম্পর্কে এই এই কথা বলেছে। তার উচিত ছয়টি কাজ করা ঃ প্রথমতঃ তাকে অবিশ্বাস করবে। কেননা সে একজন চোগলাখোর ও ফাসেক। সে বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে, কাজটির তীব্র সমালোচনা করবে এবং সদুপদেশ দেবে। তৃতীয়তঃ তাকে মন থেকে ঘৃণা করবে। কেননা সে আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। আর আল্লাহর ঘৃণিত ব্যক্তিকে ঘৃণা করা ওয়াজিব। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তির সম্পর্কে চোগলখোর খারাপ সংবাদ দিয়েছে, তার সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে খারাপ ধারণা পোষণ করবেনা। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা বেশী ধারণা পোষণ

থেকে বিরত থাকবে। কেননা কিছু কিছু ধারণায় গুনাহ্ হয়। পঞ্চমতঃ তার বর্ণিত সংবাদকে এতটা গুরুত্বও দেবেনা যে, তার সত্যাসত্য তদন্ত করতে আরম্ভ করে দেবে। কেননা আল্লাহ্ বলেন ঃ "তোমরা গোয়েন্দাগিরি করোনা।" ষষ্ঠতঃ চোগলখোরকে দেয়া উপদেশ নিজেই যেন লংঘন না করে। চোগলখোর যা বলেছে, তা নিয়ে সে নিজে যেন অন্যের সাথে আলোচনা না করে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনু আবদুল আযীযকে কারো সম্পর্কে একটি খারাপ খবর দিল। তিনি বলেন ঃ তুমি যদি চাও তাহ্‌লে তোমার খবরটা নিয়ে অগ্রসর হই। তুমি যদি সত্য বলে থাক, তাহ্‌লে তোমার ওপর এই আয়াত প্রযোজ্য হবে, "তোমাদের কাছে কোন ফাসেক যদি কোন খবর নিয়ে আসে, তাহ্‌লে তোমরা তা নিয়ে তদন্ত চালাও।" আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহ্‌লে তোমার ওপর এই আয়াত প্রযোজ্য হবে, "যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়।" আর যদি তুমি চাও, তোমাকে মাফ করে দিই। সে বললো ঃ আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ ক্ষমা করুন। আমি আর এ কাজ করবোনা।"

হযরত হাসান বাসরী বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার কাছে অন্যের কথা লাগায়, জেনে রেখ, সেও তোমার কথা অন্যের কাছে লাগায়।

এক ব্যক্তি জনৈক বিশিষ্ট আলেমের নিকট এসে অপর একজনের নামে বিভিন্ন দুর্নাম আরোপ করতে লাগলো। তখন ঐ আলেম বললেন ঃ "তুমি আমার কাছে তিনটি অপরাধ করেছ। প্রথমতঃ আমার এক দীনী ভাই-এর প্রতি আমার মনে ক্ষোভ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছ। দ্বিতীয়তঃ তার কারণে আমার মনকে দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত করেছ। তৃতীয়তঃ তুমি আমার কাছে বিশ্বস্ততা হারিয়েছ। কোন কোন মনীষী বলতেন ঃ "যে ব্যক্তি কারো গালি তোমার নিকট পৌছায়, সে যেন নিজেই তোমাকে গালি দেয়।" এক বক্তি হযরত আলী (রা) এর নিকট এসে বললো ঃ অমুক আপনার নামে দুর্নাম রটিয়েছে ও গালি দিয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। সে তাকে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেল। লোকটি ভেবেছিল, হযরত আলী তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু তিনি তাকে গিয়ে বললেনঃ "ওহে ভাই! তুমি যা বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহ্‌র কাছে আমি ক্ষমা চাই। আর যদি মিথ্যা হয়, তাহ্‌লে আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাই।" কোন কোন তাফসীরকার সূরা লাহাবের যে জায়গায় আবু লাহাবের স্ত্রীকে "হাম্মালাতাল হাতাব" বলা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ এর শাব্দিক অর্থ কাষ্ঠ বহন কারীনী। সে একজন চোগলখোর ছিল। চোগলখুরি স্বভাবটাকে কাষ্ঠ

বলা হয়েছে, কেননা কাষ্ঠ যেমন আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে, তেমনি চোগলখুরি দু'জনের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে।

একটি ঘটনা ঃ কথিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি দেখতে পেল, বাজারে একজন নিজের দাস বিক্রি করছে। বিক্রেতা এভাবে হাকডাক করছে ঃ "এ গোলামের একটু চোগলখুরির অভ্যাস ছাড়া আর কোন দোষ নেই।" লোকটি এ দোষটাকে গুরুত্ব না দিয়ে গোলামকে কিনে নিল। গোলামটি তার বাড়ীতে থাকতে লাগলো। কিছুদিন পর সে তার মনিবের স্ত্রীকে বললো ঃ আমার মনিব আর একটি বিয়ে করতে চাইছেন এবং তিনি আপনার প্রতি আর তেমন অনুরক্ত নেই। আপনি কি এই বিয়ে ঠেকাতে চান এবং আপনার স্বামী আগের মত আপনাকে ভালোবাসুক- এটা চান, তাহলে উনি যখন ঘুমাবেন, তখন একটা ছুরি দিয়ে তার কণ্ঠনালীর ওপরের একটা পশম কেটে নিয়ে নিজের কাছেই রাখুন। অপর দিকে মনিবকে সে বললো, আপনার স্ত্রী তলে তলে অন্য একজনকে ভালোবাসে এবং সে তার সাথে চক্রান্ত করে আজ আপনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় যবাই করবে। আপনি যদি বাঁচতে চান তাহলে আপনি না ঘুমিয়ে কেবল ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকবেন। দেখবেন, আপনার স্ত্রী কিভাবে আপনার গলায় ছুরি চালাতে চেষ্টা করে। মনিব ঠিক তাই করলো। রাত্রে যেই তার স্ত্রী ছুরি নিয়ে তার গলার পশম কাটতে গেছে, অমনি মনিব উঠে তার হাত ধরে বসলো এবং ছুরি কেড়ে নিয়ে স্ত্রীকে সংগে সংগে খুন করলো। অতঃপর স্ত্রীর আত্মীয়রা এসে মনিবকে খুন করলো। অতঃপর উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং তাতে উভয় পক্ষ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল।

৪৪. বিনা অপরাধে কোন মুসলমানকে অভিশাপ ও গালি দেয়া

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী ও তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কুফরী।" (আবু দাউদ ব্যতীত সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ) তিনি আরো বলেছেন যে, "কোন মুমিনকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার শামিল।" (ইবনে মাজা ব্যতীত সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ) সহীহ মুসলিমে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) বলেছেন, "অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন কারো সুপারিশকারীও হবেনা, সাক্ষীও হবেনা।" হাদীসে আরো আছে ঃ "মুমিন কখনো অভিশাপকারী, কটুভাষী, অশ্লীলভাষী ও অশালীনভাষী হতে পারেনা।" সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন বান্দা যখন কাউকে অভিশাপ করে (বদ দোয়াও অভিশাপের কাছাকাছি- অনুবাদক) তখন তা আকাশে উঠে যায়। কিন্তু আকাশের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার প্রবেশ রোধ করা হয়। অতঃপর তা পৃথিবীতে নেমে

আসে। কিন্তু তার জন্য পৃথিবীর পথ রুদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা ডানে ও বামে ছুটাছুটি করতে থাকে। যখন বেরুবার কোন পথ পায়না, তখন যার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে, সে তার উপযুক্ত হলে তার ওপর কার্যকর হয়, নচেত স্বয়ং অভিশাপকারীর ওপরই কার্যকর হয়।" হযরত ইমরান বিন হাসীন বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল (সা) কোন সফরে যান। সেই সফরে এক আনসারী মহিলা স্বীয় বাহন উটকে উচ্চস্বরে গালাগালি করে উঠলো ও অভিশাপ দিল। এটা শুনতে পেয়ে রাসূল (সা) বললেন ঃ "এই উটের পিঠে যে সব মালপত্র আছে তা নামাও এবং উটটাকে ছেড়ে দাও। কেননা সে তো অভিশপ্ত। ইমরান বলেন ঃ আমি যেন এখনো মহিলাটিকে দেখতে পাচ্ছি যে, অসহায়ভাবে লোকদের সাথে হেঁটে চলছে, কেউ তাকে সাহায্য করতে আসছেনা।" (সহীহ মুসলিম) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ সবচেয়ে খারাপ সুদ হলো, একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অপমানজনক ভাষা প্রয়োগ করা।

অবশ্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট পাপ কার্যে জড়িত ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "অত্যাচারীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ! . . . মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।" রাসূল (সা) বিভিন্ন ব্যক্তিকে, যথা সুদের সাথে জড়িত, তাহলীলের সাথে জড়িত এবং ঘুষ, মদ ও জুয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা চুলের সাথে চুল গিরে দিয়ে বাঁধে, ভ্রুর চুল ফেলে দেয়, বিপদে ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার ও আহাজারী করে, চুল কামায় ও কাপড় ছিড়ে ফেলে দেয়, তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি চিত্রকর, ভাস্কর ও যারা অন্যের জমি দখল করার জন্য সীমানার চিহ্ন তুলে ফেলে বা পাল্টে ফেলে, তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি নিজের পিতামাতার ওপর অভিশাপ বর্ষণকারী, গালিগালাজ বর্ষণকারী, কোন অন্ধ ব্যক্তিকে পথভ্রষ্টকারী, জীবজন্তুর সাথে কুকর্মকারী, সমকামী, নিজ স্ত্রীর সাথে পশ্চাদ্বারে সংগমকারী, ভাগ্য গণনাকারী ও তার কাছে গমনকারী, মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারীনী এবং পেশাদার ক্রন্দনকারীনী ও তার সহকর্মী, জনগণ অপছন্দ করা সত্ত্বেও জোরপূর্বক তাদের নেতা বা শাসকের পদ দখলকারী, স্বামী অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় যে স্ত্রী রাত কাটিয়ে দিয়েছে, আযান শুনতে পেয়েও যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জামায়াতে উপস্থিত হয়না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে জীবজন্তু জবাইকারী, চোর, সাহাবীগণকে গালিগালাজকারী, পুরুষের বেশভূষা ও সাদৃশ্যধারনকারী স্ত্রী লোক এবং স্ত্রীলোকের বেশভূষা ও সাদৃশ্য ধারনকারী পুরুষ, মানুষের চলাচলের পথে মলমূত্র ত্যাগকারী, হাতে মেহেদী ও চোখে সুর্মা ব্যবহারে বিমুখ (অর্থাৎ

সৌন্দর্য চর্চার মাধ্যমে স্বামীকে খুশী রাখতে অনাগ্রহী) রমনী, স্বামী স্ত্রী ও চাকর-মনিবের সম্পর্ক বিনষ্টকারী, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগমকারী, কোন মানুষকে অস্ত্র দেখিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারী, যাকাত দিতে অস্বীকারকারী, নিজের পিতা নয় এমন কাউকে পিতা এবং নিজের মনিব নয় এমন কাউকে মনিব পরিচয় দানকারী, কোন জীবজন্তুর গায়ে তপ্ত লোহার শলাকা দিয়ে দাগ অংকনকারী, শরীয়তের বিধান অনুসারে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে বিচারক কর্তৃক শাস্তি ঘোষণা করার সম্ভাবনা দেখে তা থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকারী, স্বামীগৃহ থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোথাও গমনকারীনী মহিলা, স্বামীর বিছানা ছেড়ে রাত যাপনকারিনী মহিলা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎকাজে আদেশ দান অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করণে বিমুখ, মদ পানকারী ও মদের উৎপাদন, ক্রয়বিক্রয়, পরিবহন ও এইসবের সাথে জড়িত ও সহযোগিতাকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। অপর হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ছয় ব্যক্তিকে আমি অভিশাপ দিয়েছি, আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন এবং প্রত্যেক নবী অভিশাপ দিয়েছেন, আর প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হওয়া নিশ্চিত। সেই ছয় ব্যক্তি হলো ঃ আল্লাহর নির্ধারিত অদৃষ্টকে অস্বীকারকারী, আল্লাহর কিতাবে কোন কিছু সংযোজনকারী, আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাদেরকে অপমানিত করা এবং আল্লাহ যাদেরকে অপমানিত করেছেন তাদেরকে সম্মানিত করার জন্য জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে হালাল প্রতিপন্নকারী এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাকে হারাম প্রতিপন্নকারী এবং আমার প্রদর্শিত পথ বর্জনকারী। এছাড়া রাসূল (সা) প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারকারীকে, হস্তমৈথুনকারীকে, কোন মহিলা ও তার কন্যাকে এক সাথে বিবাহকারীকে, ঘুষখোর, ঘুষদাতা ও ঘুষের দালালকে, বিদ্যা গোপনকারীকে, খাদ্য গোলাজাতকারীকে, কোন মুসলমানের অপমানকারীকে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মজলুম মুসলমানকে যে সাহায্য করে না তাকে, নির্দয় শাসককে, বিয়ে না করার জন্য প্রতিজ্ঞাকারী পুরুষ ও স্ত্রীকে এবং কোন নির্জন প্রান্তরে বিনা প্রয়োজনে একাকী গমনকারীকেও অভিসম্পাত করেছেন।

নিরপরাধ মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া সর্বসম্মতভাবে হারাম। আর অসচ্চরিত্র লোকদেরকে নামোল্লেখ ব্যতিরেকে অভিসম্পাত করা সর্বসম্মতভাবে বৈধ। যেমন কেউ যদি বলে, অত্যাচারীদের ওপর বা মিথ্যাবাদীদের ওপর বা কাফেরদের ওপর অভিসম্পাত, তবে তা সর্বসম্মতভাবে জায়েয। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজে জড়িত ব্যক্তিকে নামোল্লেখপূর্বক অভিসম্পাত করা সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের

মতে এটা জায়েয। কিন্তু ইমাম গাযযালীর মতে, যে ব্যক্তি তওবা ছাড়া মারা গেছে বলে নিশ্চিত জানা যায়, যেমন আবু লাহাব, আবু জেহেল, ফিরাউন, হামান প্রমুখ কেবলমাত্র তাদের ওপরই অভিশাপ করা জায়েয। কারো অকল্যাণ কামনা করে বদ দোয়া করাও অভিশাপের কাছাকাছি। যে যে ক্ষেত্রে অভিশাপ অবৈধ, সেই সেই ক্ষেত্রে বদ দোয়াও অবৈধ। এমনকি যালেমের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করা অনুচিত তবে প্রতিরোধের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে মযলুম স্বয়ং যালেমের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অভিসম্পাত করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৪৫. ওয়াদা খেলাপ করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "তোমরা ওয়াদা পালন কর। নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" যুজ্জাজ বলেন ঃ আল্লাহ যা কিছু করতে আদেশ করেছেন এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তার সবই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এসব পালনে মুসলমানরা আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা চুক্তি পালন কর।" হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ চুক্তির অর্থ যা কিছু কুরআনে হালাল ও হারাম করা হয়েছে এবং যা কিছু নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করা হয়েছে। মুকাতিল বলেন ঃ চুক্তি অর্থ কুরআনের মাধ্যমে বান্দার ওপর আরোপিত হালাল ও হারাম এবং বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত আল্লাহর বিধান এবং মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পাদিত যাবতীয় চুক্তি, অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ চারটি দোষ যার ভেতরে থাকবে সে পুরোপুরি মুনাফিক। আর যার ভেতরে এর কোন একটি দোষ থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকীর একটা উপাদান থাকবে যতক্ষণ সে তা বর্জন না করে ঃ যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন তার কাছে কোন জিনিস আমানত তথা গচ্ছিত রাখা হয়, তখন সে তাতে খেয়ানত করে। যখন সে কোন অংগীকার করে বা প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন সে তা ভংগ করে এবং যখন কারো সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়, তখন সে সীমা ছাড়িয়ে যায়। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) একটি হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি বাদী হব ঃ যে ব্যক্তি ওয়াদা করে তার খেলাপ করেছে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রী করে তার মূল্য ভোগ করে এবং যে ব্যক্তি কোন কর্মচারী নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয় না। (সহীহ আল বুখারী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে

কোন বাইয়াতে (অংগীকারে) আবদ্ধ নয়, সে জাহেলী মৃত্যু বরণ করে। (সহীহ মুসলিম) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন নেতার আনুগত্যের অংগীকার করে, তার উচিত সাধ্যমত তার আনুগত্য করা।" (সহীহ মুসলিম)

৪৬. ভবিষ্যদ্বক্তা ও জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা

আল্লাহ বলেন ঃ "যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় চোখ, কান হৃদয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" ইমাম ওয়াহেদী এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন ঃ অর্থাৎ তুমি যা জানোনা তা বলোনা। কাতাদা বলেন ঃ অর্থাৎ তুমি যা দেখনি তা দেখেছ, যা শোননি তা শুনেছ এবং যা জানোনি তা জেনেছ বলে দাবী করোনা। এক কথায়, কোন ব্যাপারে যা জানোনা তা বলো না। হযরত ইবনে আব্বাস আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ চোখ কান ও হৃদয় কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সে কথা আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন। এ কথার মাধ্যমে যা দেখা হারাম তা দেখতে, যা শোনা হারাম তা শুনতে এবং যে ইচ্ছা পোষণ করা নিষেধ তা পোষণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহই একমাত্র অদৃশ্যজ্ঞ। তিনি তার অদৃশ্য জ্ঞান নিজের মনোনীত কোন রাসূলকে ব্যতীত আর কাউকে দেন না।" ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন ঃ অর্থাৎ অদৃশ্য বা গায়েবের জ্ঞানের ওপর আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকার। এ অধিকারে তার কোন শরীক নেই। এই গায়েবের জ্ঞান তিনি কোন মনোনীত রাসূল ছাড়া কাউকে দেননা। শুধুমাত্র রাসূলকে যতটুকু গায়েবের জ্ঞান দিতে চান দেন। কেননা এই গায়েব বা অদৃশ্যের তথ্য জানানোই নবীর নবুয়তের প্রমাণ। এ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি নক্ষত্রকে অদৃশ্য জ্ঞানের উৎস মনে করে সে কাফের। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ (সা) এর ওপর নাযিলকৃত কিতাব ও ওহিকে অস্বীকার করে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাদের ভেতর কেউ হয় মুমিন এবং কেউ হয় কাফের। যে বলে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রে অবিশ্বাসী। আর যে বলে যে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক ধরনের আবহাওয়ার কারণে বা বাতাসের কারণে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রে বিশ্বাসী।

অভিজ্ঞ মনীষীগণ বলেছেন ঃ বিশেষ ধরনের আবহাওয়ার কারণে বৃষ্টি হয়েছে একথা বলার সময় কোন মুসলমান যদি মনে করে যে, বিশেষ ধরনের আবহাওয়াই বৃষ্টির স্রষ্টা, তাহলে সে নিঃসন্দেহে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।

আর যদি কেউ মনে করে যে, বিশেষ ধরনের আবহাওয়া বৃষ্টির আলামত বা লক্ষণ মাত্র, তাহলে কাফের হবেনা। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এরূপ না বলাই ভালো।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের কথায় বিশ্বাস করে, তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হয়না। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে যে, একদল লোক রাসূল (সা) কে গণক ও জ্যোতিষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন। "ও সব কিছুই নয়।" "ওসব কিছুই নয়।" তখন কয়েকজন বললেন ঃ হে রাসূল! অমুক জ্যোতিষী না অমুক কথা বলেছে? রাসূল (সা) বললেন ঃ "কিছু সত্য কথা জিনেরা সংগ্রহ করে, অতঃপর তা তার মনিব মানুষটির কানে কানে বলে দেয়। অতঃপর সে তার সাথে শত শত মিথ্যা সংযজিত করে প্রচার করে।" বুখারী শরীফের এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ফেরেশতারা মেঘের ভেতরে নেমে আসে অতঃপর যে সব বিষয়ের যে ফায়সালা হয়ে গেছে তা নিয়ে আলোচনা করে। শয়তান এই সব কথা আড়ি পেতে শুনে জ্যোতিষীদের কাছে পৌছায়। অতঃপর জ্যোতিষীরা তার সাথে শত শত মিথ্যা যোগ করে।"

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "পাখির উড্ডয়নের গতি ও অন্যান্য আলামত দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা সুস্পষ্ট শিরক।"

৪৭. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার লংঘন

(ক) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অসদাচরণ

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "যে সব স্ত্রী অবাধ্যতা প্রকাশ করবে বলে তোমরা আশংকা কর, তাদেরকে উপদেশ দাও, বিছানায় তাদের থেকে পৃথক হও, এবং মারধর কর। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করোনা।"

ইমাম ওয়াহেদী বলেন ঃ এখানে অবাধ্যতার অর্থ হলো স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আতা বলেন ঃ স্ত্রী স্বামীর প্রতি এ যাবত যে ধরনের আনুগত্য দেখিয়ে আসছিল তা পাল্টে যাওয়া এবং স্বামীকে বিনা ওযরে যৌন মিলনে বাধা দান এর পর্যায়ভুক্ত। "উপদেশ দাও" অর্থ হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর আদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়া। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ বিছানায় পৃথক হওয়ার অর্থ হলো, স্ত্রীর দিকে পিঠ দিয়ে শয়ন করা এবং কথা না বলা। শা'বী ও মুজাহিদের মতে, এর অর্থ বিছানা একেবারেই পৃথক করে ফেলা এবং স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শয়ন না করা। আর "মারধর কর" অর্থ মৃদু মারধর করা, যাতে

খুব বেশী ব্যথা না পায়। ইবনে আব্বাসের মতে খালি হাতে কিল থাপ্পড় ইত্যাদি এর বেশী নয়।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যখন কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে এবং সে সেই ডাকে সাড়া দেয়না, তখন ভোর হওয়া অবধি তার ওপর ফেরেশতারা অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।" (সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অপর হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায এবং কোন সৎকাজ কবুল হয়না; পালিয়ে যাওয়া গোলাম বা চাকর যতক্ষণ ফিরে না আসে, স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী, যতক্ষণ স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট না হয়, এবং মদ খেয়ে মাতাল হওয়া ব্যক্তি যতক্ষণ তার হুঁশ ফিরে না আসে।"

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন নারীকে সর্ব প্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হবে তার নামায ও স্বামী সম্পর্কে। রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ কোন মুমিন স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা এবং তার ঘরে অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া বৈধ নয়। (সহীহ্ আল বুখারী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ আমি যদি কাউকে কারো সামনে সিজদার আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে স্বামীর সামনে সিজদা করার আদেশ দিতাম। (তিরমিযী) একবার এক মহিলা রাসূলের (সা) নিকট স্বীয় স্বামীর কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ "তুমি তার তুলনায় কতটুকু মর্যদার অধিকারী তা ভেবে দেখ। সে তোমার বেহেশত ও দোজখ।" (নাসায়ী) রাসূল (সা) আবো বলেন ঃ "স্ত্রী সব সময়ই স্বামীর মুখাপেক্ষী। তথাপি যে স্ত্রী স্বামীর কৃতজ্ঞ নয়, আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না।" (নাসায়ী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "স্ত্রী যখন স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার গৃহ ত্যাগ করে, তখন সে ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তারপর অভিসম্পাত করতে থাকে।" (তাবরানী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ "স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে যে স্ত্রী মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী)

তবে স্বামীকে কোন হারাম কাজে সহযোগিতা করা স্ত্রীর পক্ষে বৈধ নয়, এবং অবৈধ কাজে সহযোগিতা না করায় স্বামী অসন্তুষ্ট হলেও তার জন্য সে গুনাহগার হবে না। বৈধ সীমার মধ্যে স্বামীর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজেকে এমন কোন কাজে নিয়োজিত করা বৈধ নয়, যার ফলে স্বামী তার সাহচর্য থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হয়। স্বামীর ধনসম্পদে বিনা অনুমতিতে হস্তক্ষেপ করা স্ত্রীর বৈধ নয়। নিজের অধিকারের ওপর স্বামীর অধিকারকে এবং নিজের আত্মীয়দের অধিকারের ওপর স্বামীর আত্মীয়দের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া স্ত্রীর পক্ষে অপরিহার্য। সব সময় পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা

সহকারে স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজের সৌন্দর্যের জন্য তার ওপর বড়াই করা এবং স্বামীর মধ্যে বিদঘুটে কিছু থাকলে তার জন্য তাকে দোষারোপ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

স্ত্রীর উচিত স্বামীর সামনে সর্বদা লজ্জাশীলা থাকা, তার সামনে চোখ নামিয়ে রাখা, তার আদেশের অনুগত থাকা, তার কথা মনোযোগের সাথে শোনা, তার কথা বলার সময় চুপ থাকা, তার গৃহে আগমনের সময় দরজায় এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানো, তার বাইরে যাওয়ার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া ও কিছুক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা, সে যা যা অপছন্দ করে তা থেকে দূরে থাকা, তার ঘুমানোর সময় তার কাছে উপস্থিত থাকা, তার অনুপস্থিতিতে তার গৃহ, সম্পত্তি ও নিজের সতিত্বকে আমানত হিসাবে সংরক্ষণ করা, নিয়মিত দাঁত মাজা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও তার কাছে নিজেকে সব সময় সুসজ্জিত ও সুবাসিত রাখা, তার অসাক্ষাতে তার কোন নিন্দা না করা। তার আত্মীয়স্বজনের যত্ন করা এবং তার ক্ষুদ্র উপকারকে বড় করে দেখা।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "স্ত্রী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক ঠিক মত পড়বে, রমযান মাসের রোযা ঠিকমত রাখবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে যে দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইবে, করতে পারবে।" (আহমাদ, তাবরানী)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "স্বামীর অনুগত স্ত্রীর জন্য পাখি, মাছ, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতারা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়। আর স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর জন্য আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির পক্ষ থেকে অভিসম্পাত আসে। যে স্ত্রী স্বামীর সামনে মুখ কালো করে থাকে, সে পুনরায় হাসিমুখ হয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন। যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাইরে যাবে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশতাদের অভিশাপ কুড়াতে থাকবে।"

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ চার রকমের নারী জান্নাতে এবং চার রকমের নারী জাহান্নামে যাবে ঃ আল্লাহর ও স্বামীর অনুগত সতী নারী, অধিক সন্তান উৎপাদনে সক্ষম, ধৈর্যশীলা ও অল্পে তুষ্টা নারী, লজ্জাশীলা নারী, যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতিত্ব ও স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করে এবং তার উপস্থিতিতে তার সাথে বাকসংযম করে এবং শিশু সন্তানসহ বিধবা হওয়ার পর যে নারী সন্তাদেরকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং তাদের ক্ষতির আশংকায় বিয়ে না করে তাদের লালন পালনে নিয়োজিত থাকে। আর যে চার রকমের নারী জাহান্নামী হবে তারা হচ্ছেঃ

(১) যে নারী স্বামীর প্রতি কটু বাক্য বর্ষণ ও ভর্ৎসনা করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতিত্ব রক্ষা করেনা, আর সে উপস্থিত থাকলে তাকে কটুবাক্য দ্বারা কষ্ট দেয় (২) যে নারী স্বামীর ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপায় এবং যা তার ক্ষমতার বাইরে, তা তাকে করতে বাধ্য করে। (৩) যে নারী পর পুরুষ থেকে নিজেকে ঢেকে রাখেনা (পর্দার বিধান মেনে চলে না) এবং সাজসজ্জা করে ও রূপের প্রদর্শনী করে বাইরে বের হয় (৪) যে নারীর পানাহার ও ঘুম ছাড়া আর কোন কিছুতেই আগ্রহ নেই এবং নামায আল্লাহ্ রাসূল ও স্বামীর আনুগত্য করতে চায়না। এসব দোষ যে নারীর রয়েছে, সে যখন স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বাইরে বের হয়, তখন সে অভিশাপ কুড়ায় ও জাহান্নামের যোগ্য হয়। কেবলমাত্র তওবা দ্বারা সে এই পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে পারে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ (মেরাজের রাতে) আমি জাহান্নাম পরিদর্শন করেছি। দেখেছি যে, সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা। কারণ তারা আল্লাহ, রাসূল ও স্বামীর আনুগত্য কম করে এবং "তাবাররুজ" করে। তাবাররুজ হলো, বাইরে চলাফেরার সময় সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরা, অধিক পরিমাণে সাজসজ্জা করা এবং অধিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করা, অন্য কথায় বেপর্দায় চলাফেরার নামই তাবাররুজ। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নারী পর্দায় থাকার জন্যই সৃষ্ট। সে যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে অভিনন্দন জানায়।

হাদীসে আছে ঃ নারীরা যতক্ষণ আপন গৃহে অবস্থান করে ততক্ষণই আল্লাহর চোখে সবচেয়ে মর্যাদাশীলা থাকে। হাদীসে আরো আছে যে, নারী আপন গৃহে অবস্থান, আল্লাহর ইবাদাত ও স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমে যতটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে, ততটা আর কোনভাবে করতে পারে না। একবার হযরত আলী (রা) স্বীয় স্ত্রী হযরত ফাতিমা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ নারীর মংগল কিসে? হযরত ফাতিমা বললেন ঃ 'বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং বেগানা পুরুষকে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার সুযোগ না দেয়ার মধ্যেই নারীর মংগল নিহিত।'

হযরত আলী (রা) বলতেন ঃ 'তোমাদের কি লজ্জা নেই, তোমাদের কি আত্মসম্মানবোধ নেই যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে বাইরে যেতে দাও, আর তারা পরপুরুষদের দিকে তাকায় এবং পরপুরুষেরাও তাদের দিকে তাকায়? আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাতে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত হাফসা (রা) রাসূল (সা) এর নিকট উপস্থিত ছিলো। এই সময় অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম এলেন। রাসূল (সা) তাঁর স্ত্রীদ্বয়কে বললেন ঃ

তোমরা তার কাছে থেকে পর্দায় চলে যাও। তাঁরা উভয়ে বললেন ঃ উনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতেও পাননা, চেনেনও না। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা দু'জনও অন্ধ নাকি? তোমরা কি তাকে দেখতে পাওনা?

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, পুরুষ ও নারী উভয়েই পরস্পরের প্রতি তাকানো থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সূরা নূরে বলেছেন ঃ "মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন নিজ নিজ দৃষ্টি সংযত রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। . . . আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন নিজ নিজ দৃষ্টি সংযত রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ একবার আমি ও ফাতিমা রাসূল (সা) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে কাঁদছেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার পিতামাতার প্রাণ উৎসর্গ হোক! আপনি কি জন্য কাঁদছেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ "হে আলী! মিরাজের রাত্রে আমি আমার উম্মাতের নারীদেরকে নানা রকমের আযাব ভোগ করতে দেখেছি। সেই কঠিন আযাবের কথা মনে করে কাঁদছি। আমি দেখেছি, এক মহিলাকে তার চুল দিয়ে জাহান্নামের আগুনের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম, তার জিহবা টেনে লম্বা করে তা দিয়ে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং তার গলায় গরম পানি ঢালা হচ্ছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম, তার দুই পা দুই স্তনের সাথে এবং দুই হাত কপালের চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম তার স্তনে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম, তার মাথা শুকরের মাথার মত। তার দেহ গাধার দেহের মত এবং তাকে হাজার হাজার রকমের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম, সে কুকুরের আকৃতি পেয়েছে। আগুন তার মুখ দিয়ে ঢুকছে এবং মলদ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে। আর ফেরেশতারা তার মাথায় লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে।

হযরত ফাতিমা উঠে দাঁড়ালেন এবং এইসব মহিলার এইসব আযাবের কারণ কি জানতে চাইলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ "হে ফাতিমা! যে মহিলাকে চুল দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সে পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজের মাথাকে ঢেকে রাখতোনা। যে মহিলাকে তার জিহ্বা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সে প্রতিবেশীকে কটুবাক্য দ্বারা কষ্ট দিত। স্তনে রশি দিয়ে বেঁধে যাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতিত্ব সংরক্ষণ করতোনা, অর্থাৎ ব্যভিচারীনী ছিল। আর যার দুই পা দুই স্তনের সাথে এবং দুই হাত কপালের চুলের সাথে বেঁধে

ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সে সহবাস ও ঋতুজনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করতোনা এবং নামায নিয়ে তামাশা করতো। যার মাথা শুকরের মত ও দেহ গাধার মত হয়ে গেছে, সে ছিল চোগলখোর ও মিথ্যাবাদী। আর যে কুকুরের আকারে রূপান্তরিত হয়েছে, সে ছিল হিংসুটে এবং দান করে খোঁটা দিত।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন নারী নিজের স্বামীকে কষ্ট দিলে জান্নাতের হুর উক্ত নারীকে অভিসম্পাত দেয়।

উল্লেখ আছে যে, পিতামাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকে দেখার জন্য এবং অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে এবং পর্দা সহকারে বাইরে যাওয়াতে কোন দোষ নেই।

(খ) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর অধিকার লংঘন ঃ

স্ত্রী যেমন স্বামীর আনুগত্য করতে ও তাকে সন্তুষ্ট রাখতে আদিষ্ট, তেমনি স্বামীও আদিষ্ট স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ ও বিনম্র ব্যবহার করতে, তার পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার ইত্যাদি প্রকাশ পেলে তাতে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে এবং স্ত্রীকে খোরপোশ ও সম্মানজনক জীবন যাপনের সুযোগ দিতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখো। মনে রেখো, তোমাদের স্ত্রীদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমনি তোমাদের ওপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, তাদের খোরপোশ দেবে। আর তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তাদের সতিত্ব ও শ্লীলতা রক্ষা করবে এবং তোমাদের কাছে যারা অবাঞ্ছিত তাদেরকে গৃহে প্রবেশ করতে দেবেনা। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার পরিবার পরিজনের সাথে অধিকতর সদ্ব্যবহারকারী।" কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, "সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে আপন পরিবারের সাথে সর্বাধিক বিনম্র আচরণকারী। রাসূল (সা) স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যধিক বিনম্র আচরণ করতেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করবে, সে হযরত আইয়ূব (আ) এর মত পুরস্কৃত হবে। আর যে স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করবে, সে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিমের ন্যায় পুরস্কৃত হবে।

এক হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত উমরের নিকট নিজের স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের

অভিযোগ পেশ করার জন্য উপস্থিত হলো। সে হযরত উমরের বাড়ীর ফটকে দাঁড়িয়ে তাঁর বাইরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। এই সময় শুনতে পেল, হযরত উমরের স্ত্রী তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করছেন। কিন্তু হযরত উমর তার কোন জবাব না দিয়ে নীরবে সহ্য করছেন। এটা শোনার পর লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো। সে ভাবলো, এমন দুর্দন্ড ও প্রতাপান্বিত খলিফার যখন এই অবস্থা, তখন আমি আর কোথাকার কে? ঠিক এই সময় হযরত উমর বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, লোকটি চলে যাচ্ছে। তিনি ডেকে বললেন ঃ তুমি কেন এসেছিলে আর কেনই বা দেখা না করে চলে যাচ্ছ? সে বললো ঃ আমীরুল মুমিনীন! আমার সাথে আমার স্ত্রী যে দুর্ব্যবহার করে ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু শুনতে পেলাম স্বয়ং আপনার স্ত্রীও তদ্রূপ। তাই ফিরে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম যে, আমীরুল মুমিনীনের অবস্থা যখন এরূপ, তখন আমি আর কোথাকার কে? হযরত উমর বললেন ঃ শোন, ভাই! আমার ওপর তার কিছু অধিকার আছে বলেই আমি তাকে সহ্য করলাম। দেখ, সে আমার খাবার রান্না করে, রুটি বানায়, কাপড় ধোয়, এবং আমার সন্তানদের দুধ খাওয়ায়। অথচ এসব কাজ তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে এসব কাজ করে দিয়ে সে আমার মনকে হারাম উপার্জন থেকে ফিরিয়ে রাখে। এ জন্যই আমি তাকে সহ্য করি। লোকটি বললোঃ আমীরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রীও তদ্রূপ। হযরত উমর বললেন ঃ "তাহলে তাকে সহ্য করতে থাক, ভাই। দুনিয়ার জীবনটা তো নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।"

কথিত আছে যে, একবার জনৈক নেককার ব্যক্তির এক নেককার দ্বীনী ভাই তার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি প্রতি বছর একবার বেড়াতে আসতেন। এসে দরজায় কড়া নাড়তেই তার স্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কে আপনি?" আগন্তুক বললেন ঃ "আমি আপনার স্বামীর দ্বীনী ভাই! তাকে দেখতে এসেছি।" স্ত্রী অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় বললো ঃ "সে জংগলে কাঠ কাটতে গেছে। আল্লাহ যেন ওকে নিরাপদে ফিরিয়ে না আনে। আল্লাহ যেন ওর অমুক করে, তমুক করে! ইত্যাদি ইত্যাদি . . . ।" এভাবে অনুপস্থিত স্বামীর বিরুদ্ধে সে প্রচন্ডভাবে নিন্দাবাদ করতে লাগলো। ইতিমধ্যে সহসা তার স্বামী এসে উপস্থিত হলেন। একটা সিংহের পিঠে করে বিরাট এক কাঠের বোঝা নিয়ে এবং নিজে তার ওপর আরোহণ করে পাহাড়েরর দিক থেকে ফিরে এলেন। তিনি তাঁর দ্বীনী ভাইকে সালাম করলেন এবং মোবারকবাদ জানালেন। অতঃপর তিনি গৃহের ভেতরে ঢুকে সিংহের পিঠ থেকে কাঠ নামালেন এবং সিংহকে বললেন ঃ যাও,

আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। অতঃপর তিনি তার দ্বীনী ভাইকেও ভেতরে এনে বসালেন। তার স্ত্রী তখনো তাকে বকা ঝকা করছিল। অথচ তার স্বামী ছিলেন নিরুত্তর। অতঃপর খাওয়া দাওয়া শেষে অতিথি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তিনি তার বন্ধুর মুখরা স্ত্রীর ব্যবহার ও তার বন্ধুর ধৈর্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। পরের বছর একই সময় তিনি আবার এলেন। তিনি কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে আওয়াজ এল ঃ দরজায় কে? আগন্তুক বললেন ঃ আমি আপনার স্বামীর দ্বীনী ভাই অমুক। তখন মোবারকবাদ বলে মহিলা দরজা খুলে দিল। সে আরো বললো ঃ "আপনি বসুন, আমার স্বামী ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই ফিরে আসবেন। আল্লাহ তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনুন। ইত্যাদি ইত্যাদি।" আগন্তুক তার সুমিষ্ট ব্যবহার ও কথাবার্তায় অবাক হয়ে গেলেন। একটু পরেই গৃহকর্তা কাঠের বোঝা নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু এবার কাঠের বোঝা সিংহের পিঠে করে নয় - নিজের পিঠে করে আনলেন। অতঃপর তারা অতিথিকে যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করলেন। বিদায় কালে তিনি তার বন্ধুকে বললেন ঃ "গত বছর যখন এসেছিলাম তখন আপনার স্ত্রীর কর্কশ ব্যবহার ও দুর্বিনীত ভাষণ শুনেছিলাম। তিনি সর্বদাই আপনার নিন্দা করছিলেন। আর আপনি সিংহের পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এ বছর দেখলাম আপনার স্ত্রীর সুমধুর ব্যবহার। অথচ আপনি বোঝা বয়ে এনেছেন নিজের পিঠে করে। ব্যাপারটা কি বলুন তো?" তিনি বললেন ঃ "হে ভাই! সেই কর্কশভাষিণী নারীর মৃত্যু হয়েছে। আমি তার ওপর ধৈর্য ধারণ করতাম। ফলে আল্লাহ সেই সিংহটিকে আমার বশীভূত করে দিয়েছিলেন। পরে আমি এই সদাচারীনী মহিলাকে বিয়ে করেছি। আমি তার সাথে সুখে আছি। কিন্তু সেই সিংহ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। তাই আমি নিজের ঘাড়ে করে কাঠ বহন করতে বাধ্য হয়েছি এই অনুগত সৎস্বভাবা স্ত্রীর সাথে আমার সুখময় জীবন যাপনের খাতিরে।

৪৮. প্রাণীর প্রতিকৃতি বা ছবি আঁকা, ছাপানো, খোদাই করা, টানানো ও সংরক্ষণ

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "যারা আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করবেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইকরামা বলেন ঃ যারা ছবি তৈরী করে তারাই আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয়। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যারা ছবি তৈরী করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে ঃ

"তোমরা যা বানিয়েছিলে, তাতে প্রাণ দাও।" (সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল (সা) এক সফর থেকে গৃহে ফিরলেন। তখন আমি আমার ঘরের দেয়ালের কুঠুরিকে এমন একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, যাতে কতকগুলো ছবি ছিল। পর্দাটি দেখা মাত্র রাসূল (সা) এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ "হে আয়িশা! যারা নিজের সৃষ্টিকে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তারাই কঠোরতম শাস্তি ভোগ করবে।" হযরত আয়িশা বলেন ঃ এরপর আমি সেই পর্দাটা কেটে দু'ভাগ করে ফেলি এবং তা দিয়ে দুটো বালিশ বানাই। (বুখারী-মুসলিম) রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "প্রত্যেক চিত্রকর দোজখবাসী হবে। তার প্রতিটি ছবির জন্য তাকে এক একটা প্রাণ দেয়া হবে এবং প্রত্যেকটা প্রাণ জাহান্নামের আগুনে আযাব ভোগ করবে।" (বুখারী-মুসলিম) রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন প্রাণীর প্রতিচ্ছবি বা ছবি তৈরী করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ প্রতিচ্ছবি বা ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করার নির্দেশ দেয়া হবে। কিন্তু তা সে কখনো পারবেনা।" (বুখারী)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করার ঔদ্ধত্য দেখায়, তার চেয়ে বড় অপরাধী আর কে আছে? সে একটা দানাই সৃষ্টি করুক না! একটা গমের দানা অথবা একটি কলাই সৃষ্টি করুক তো দেখি!" (বুখারী, মুসলিম)

তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন দোজখ থেকে একটি মাথা উঠে বলবে যে, তিন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। এই তিনজন হলো, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার প্রতিপন্নকারী, স্বৈরাচারী শাসক, এবং চিত্রকর।" বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত অপর হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে গৃহে কুকুর কিংবা প্রাণীর ছবি আছে, সেই গৃহে ফিরিশতারা প্রবেশ করেনা।" ইমাম খাত্তাবী বলেন যে, এ দ্বারা রহমত ও বরকতের ফিরিশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতারা সকল গৃহেই যেয়ে থাকে। আর কুকুর দ্বারা বুঝানো হয়েছে নিছক সখের বশে পালিত কুকুরকে। শিকার ধরা, পাহারা দেয়া ইত্যাদি কাজের জন্য কুকুরের প্রয়োজন হলে তাতে কোন বাধা নেই। আর ছবি বলতে বুঝানো হয়েছে যে কোন প্রাণীর ছবি বা প্রতিকৃতিকে, চাই তা যে জিনিসের ওপর যেভাবেই রক্ষিত থাকনা কেন। এ ধরনের সকল ছবি ও প্রতিকৃতিকে সাধ্যমত অপসারণ বা ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী

(রা) সকল ছবি বা প্রতিকৃতিকে ধ্বংস করার এবং সকল উঁচু কবরকে সমান করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৪৯. বিপদে, দুর্যোগে বা শোকাবহ ঘটনায় উচ্চস্বরে কান্নাকাটি, বুক কপাল চাপড়ানো, পোশাক ছিঁড়ে ফেলা, মাথা কামানো, চুল উপড়ানো এবং নিজের মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করা ইত্যাদি

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি (শোক দুঃখ প্রকাশার্থে) মুখ ও কপাল চাপড়ায়, পোশাক ছিঁড়ে ফেলে, এবং জাহেলী প্রথা অনুযায়ী দোয়া করে, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" ইতিপূর্বে আমরা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছি যে, রাসূল (সা) উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন, চুল কামানো ও চুল টেনে ছেঁড়া এবং কাপড় ছেঁড়ার মাধ্যমে শোক প্রকাশকারিনীকে অভিসম্পাত করেছেন। এ সকল কাজ সর্বসম্মতভাবে হারাম। অনুরূপভাবে মুখ কপাল চাপড়ানো, মুখ খামচানো এবং মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করে দোয়া করাও হারাম। হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) আমাদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছেন যে আমরা কখনো উচ্চৈস্বরে কেঁদে শোক প্রকাশ করবোনা। (বুখারী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "দুটি কাজ কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। কারো বংশ নিয়ে টিটকারি দেয়া এবং মৃত ব্যক্তির ওপর উচ্চৈস্বরে কান্নাকাটি করা।" (মুসলিম)

আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনকারিনী ও তার শ্রোতাদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। বুখারী, ইবনে মাজা ও নাসায়ীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) তীব্র যন্ত্রণায় অচেতন হয়ে পড়লে তাঁর এক আত্মীয়া মহিলা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যাকে অবাঞ্ছিত গণ্য করেছেন, আমিও তাকে অবাঞ্ছিত গণ্য করি। উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন, চুল ছেঁড়া, কাপড় ছেঁড়া ইত্যাদির মাধ্যমে শোক প্রকাশকে রাসূল (সা) অবাঞ্ছিত গণ্য করেছেন।

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ উচ্চৈস্বরে কাঁদার কারণে মৃত ব্যক্তি কবরে আযাব ভোগ করে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দুটি নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ও পাপজনক শব্দ থেকে আমাকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে ঃ একটি গানবাজনার শব্দ, অপরটি বিপদের সময় মুখ চাপড়ানো ও শয়তানের মত চিৎকার করার শব্দ। বর্ণিত আছে, যে হযরত ওমর (রা) এক পেশাদার ক্রন্দসীকে স্বহস্তে প্রহার করেন এবং বলেন ঃ আমি এই ক্রন্দসীকে প্রহার করছি। কেননা তাকে প্রহার করা নিষিদ্ধ নয়, সে তোমাদের দুঃখের

অংশীদার হয়ে কাঁদেনা, বরং তোমাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্য কাঁদে। সে তোমাদের মৃতদেরকে কবরে কষ্ট দেয় এবং জীবিতদের শোক যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়। কেননা সে ধৈর্য ধারণ করতে নিষেধ করে, অথচ আল্লাহ তার আদেশ দিয়েছেন, সে ব্যাকুলভাবে কাঁদতে উদ্বুদ্ধ করে, অথচ আল্লাহ তা করতে নিষেধ করেছেন।

আলেমগণ বলেছেন পেশাদার ভাড়াটে ক্রন্দসীদের ক্রন্দন এবং উচ্চৈস্বরে দিশাহারা হয়ে ক্রন্দন করা ছাড়া নিছক শোক বিহবল হয়ে মৃদুস্বরে আন্তরিকভাবে ক্রন্দন হারাম নয়। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) রুগ্ন সা'দ বিন উবাদাকে দেখতে গিয়ে কেঁদে দেন। তাঁর কান্না দেখে সমবেত সাহাবীগণও কাঁদেন। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন ঃ শুনে রাখ, আল্লাহ চোখের পানি ফেলা ও হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করার জন্য আযাব দেননা তিনি শুধু এই জিনিসটির জন্য শাস্তি দেন অথবা অনুগ্রহ করেন—এ কথা বলে জিহবার দিকে ইশারা করলেন। অপর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূল (সা) কেঁদে দিলে হযরত সা'দ জিজ্ঞাসা করলেন "হে আল্লাহর রাসূল! এ কী?" তিনি বললেন ঃ "এটা বান্দাদের হৃদয়ে আল্লাহর সৃষ্টি করা করুণা ও সহানুভূতি। আল্লাহ করুণা ও সহানুভূতিসম্পন্ন বান্দাদের প্রতিই করুণা বর্ষণ করেন।" সহীহ আল বুখারীতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) যখন তার মুমূর্ষ পুত্র ইবরাহীমের কাছে গেলেন, তখন রাসূল (সা) এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তা দেখে আবদুর রহমান বিন আওফ বললেন ঃ হে রাসূল! আপনিও কাঁদছেন! রাসূল (সা) বললেন ঃ এটা স্নেহ মমতার প্রকাশমাত্র। অতঃপর বললেন ঃ "চোখ অশ্রু বর্ষণ করে ও হৃদয় মর্মাহত হয়। কিন্তু আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট, তা ছাড়া আমরা আর কিছু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারিনা। হে ইবরাহীম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা ব্যথিত।"

এখানে উল্লেখ্য যে, বিপদ আপদে ও প্রিয়জনের বিচ্ছেদে মাত্রাতিরিক্ত কান্নাকাটিকে নিরুৎসাহিত করার কারণ এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) ধৈর্য ও আত্মসংযমের নির্দেশ দিয়েছেন এবং হতাশা ও অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামায দ্বারা শক্তি অর্জন কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।...... আর আমি অবশ্য অবশ্য তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, সম্পদহানি, প্রাণহানি ও শস্যহানি দ্বারা পরীক্ষা করবো। যারা ধৈর্য ধারণ করে, যারা বিপদে পতিত হয়ে বলে যে, আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো। তাদেরই

সুসংবাদ দিয়ে দাও।" (সূরা আল বাকারা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন-এর তাৎপর্য এই যে, তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন এবং লাঞ্ছিত করেন না। আর "যারা বিপদে পতিত হলে বলে যে, আমরা আল্লাহরই জন্য" এ কথার মর্ম এই যে, "আমরা আল্লাহর বান্দা, তাই তিনি আমাদের সাথে যা ইচ্ছা, তাই আচরণ করতে পারেন।"

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "মুমিন বান্দার ওপর যে বিপদই আসুক না কেন, এমন কি তার পায়ে যদি একটা কাঁটাও ফোটে, তবে তা দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ মুছে দেন।" (সহীহ মুসলিম) তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন বান্দার সন্তান মারা গেলে আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন তোমরা আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ সংহার করছিলে, তখন সে কী বলেছে? ফিরিশতারা বলেন ঃ "সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং তোমার কাছে তার ফিরে যাওয়ার কথা স্মরণ করেছে।" তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটা বাড়ী তৈরী কর এবং তার নাম রাখ "বাইতুল হাম্‌দ" (প্রশংসার বাড়ী)। এক হাদীসে কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ বলেন ঃ "যখন আমার বান্দার কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় এবং সে তাতে ধৈর্য ও সংযম অবলম্বন করে, তখন জান্নাত ছাড়া তাকে দেয়ার মত আর কোন প্রতিদান আমার কাছে থাকেনা।" (সহীহ আল বুখারী)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহর ফায়সালা অম্লান বদনে মেনে নেয়া আদম সন্তানের জন্য সৌভাগ্যজনক আর তাতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্টি হওয়া দুর্ভাগ্যজনক।" হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, মৃত্যুর ফিরিশতা মুমিনের প্রাণ সংহার করে বিদায় হওয়ার সময় যখন তার পরিবার পরিজন বুক চাপড়ে, চুল এলিয়ে এবং নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করে শোক প্রকাশ করতে আরম্ভ করে, তখন তা দেখে তিনি ক্ষণিকের জন্য বাড়ীর ফটকে দাঁড়ান এবং বলেন ঃ এত হাহুতাশ ও কান্নাকাটি কেন? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কারো আয়ু কমাইনি, কারো জীবিকা ছিনিয়ে নেইনি এবং কারো ওপর যুলুম করিনি। তোমাদের অভিযোগ ও অসন্তোষ যদি আমার বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তাহলে খোদার কসম, আমি আল্লাহর আদেশের অনুগত। আর যদি তোমাদের ক্ষোভ মৃত ব্যক্তির ওপর হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা কাফের হয়ে গেছ। আমাকে তো আরো বহুবার আসতে হবে এবং এক সময় তোমাদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবেনা। রাসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, লোকেরা যদি তার এ ভাষণ শুনতো এবং তাকে দেখতো, তাহলে তাদের মৃতের কথা ভুলে যেত এবং

নিজেদের জন্যই কেঁদে দিশেহারা হতো।

কারো বিপদের খবর শুনলে শোক বা সহানুভূতি প্রকাশ করা ছওয়াবের কাজ। তিরমিযী শরীফে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন বিপন্নের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে, তাহলে স্বয়ং ঐ বিপন্ন ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করলে যে ছওয়াব পায়, সেও তদ্রূপ ছওয়াব পাবে।" রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ সন্তানহারা মাতাকে সমবেদনা জ্ঞাপন ও সান্ত্বনা দান করলে আল্লাহ জান্নাতের মূল্যবান পোশাক পরাবেন।" (তিরমিযী)

উল্লেখ্য যে, শোক ও সমবেদনা প্রকাশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্তনা দান, ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান, তার দুঃখ, শোক ও বিপদের অনুভূতিকে হালকা করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাই এটি মুস্তাহাব। এটি সৎ কাজের আদেশ দান অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং সততা ও খোদাভীতির কাজে সহযোগিতার আওতাভুক্ত। সমবেদনা ও সান্ত্বনার সর্বোত্তম ভাষা রাসূল (সা) এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়। সহীহ আল বুখারী ও সহী মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর এক কন্যা রাসূল (সা) এর কাছে এই মর্মে খবর পাঠালো যে, তার এক পুত্র মৃত্যুর মুখোমুখি। রাসূল (সা) দূতকে বললেন ঃ "যাও, ওকে (কন্যাকে) বল যে, আল্লাহ যা নেন, তা তাঁরই জিনিস, আর যা দেন, তাও তাঁরই জিনিস। সব কিছুই বান্দার কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রয়েছে। তাকে বল সে যেন ধৈর্য ধারণ ও সংযম অবলম্বন করে।"

এক সাহাবীকে দরবারে অনুপস্থিত দেখে রাসূল (সা) তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে রাসূল! তার ছেলে মারা গেছে। রাসূল (সা) তার সাথে সাক্ষাত করে তার প্রতি সমবেদনা জানালেন। অতঃপর বললেন ঃ "শোনো, তোমার ছেলে সারা জীবন তোমরা কাছে থাকুক-এটা তোমার বেশী পসন্দনীয়, না সে তোমার আগে গিয়ে জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকুক এবং তুমি মারা গেলে সে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিক-এটা পসন্দনীয়? সাহাবী বললেন সে আমার আগে জান্নাতে গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দিক-এটাই পসন্দীয়। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তোমার জন্য সেটিই নির্ধারিত রইল। সাহাবী জিজাসা করলেন ঃ এটা কি শুধু আমার জন্য? রাসূল (সা) বললেন ঃ না, সকল মুসলমানের জন্য।" (আহমাদ, নাসায়ী)

হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূল (সা) জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে দেখলেন এক মহিলা একটি কবরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ হে আল্লাহর বাঁদী, আল্লাহকে ভয় কর ও ধৈর্য ধারণ কর।

মহিলা বললো ঃ ওহে আল্লাহর বান্দা, আমি এক সন্তানহারা জননী। সুতরাং আমি যা করছি তা আমার জন্য অশোভন কিছু নয়।" রাসূল (সা) আবার বললেন ঃ তুমি ধৈর্য ধারণ কর। মহিলা বললো ঃ "যথেষ্ট হয়েছে। তোমার কথা শুনেছি। এবার তুমি যাও।" রাসূল (সা) তার কাছ থেকে চলে গেলেন। জনৈক সাহাবী মহিলাকে দেখে বললেন ঃ এই ব্যক্তি তোমাকে কি বললো ঃ মহিলা সব কথা জানালো। সাহাবী বললেন ঃ তুমি জান ঐ ব্যক্তি কে? সে বললো ঃ না। সাহাবী বললো ঃ সর্বনাশ! উনিতো রাসূলুল্লাহ (সা)। মহিলা একথা শোনা মাত্র ছুটে গিয়ে রাসূল (সা) এর সাথে দেখা করলো এবং বললো ঃ হে রাসূল! আমি ধৈর্য ধারণ করবো। রাসূল (সা) বললেন ঃ "প্রথম আঘাতের সময়ই ধৈর্য ধারণ করা উচিত।" অর্থাৎ আকস্মিক বিপদ দেখা দেয়ার সময় ধৈর্য অবলম্বন করা উত্তম। নচেত পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিকভাবেই মন শান্ত হয়ে আসে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু তালহা নামক সাহাবীর একটি ছেলে মারা যায়। সে সময় তিনি বিদেশে ছিলেন এবং ছেলের মৃত্যুর কথা মোটেই জানতেন না। অতঃপর তিনি যখন বাড়ী এলেন, তার স্ত্রী পরিবারের সবাইকে আগে ভাগে বলে দিলেন যে, "ছেলের মৃত্যুর কথা তোমরা কেউ এর কাছে ফাঁস করোনা। যখন যা বলতে হয় আমিই বলবো।" অতঃপর তিনি আবু তালহার খাবার দাবারের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রে শোবার পর তাকে বললেন ঃ ওহে আবু তালহা, কেউ যদি কাউকে কোন জিনিস ধার হিসাবে দেয়, অতঃপর তা ফেরত চায়, তাহেল তা ফেরত দিতে অস্বীকার করা কি তার উচিৎ? তালহা বললেন ঃ না। তখন তার স্ত্রী সকল ঘটনা জানালেন এবং বললেন ঃ "তাহলে তোমার ছেলের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ কর।" এ কথা শুনে আবু তালহা রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি এত দেরীতে এটা আমাকে জানালে? অতঃপর তিনি রাসূল (সা) এর নিকট গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ "গত রাতে তোমাদের আচরণকে আল্লাহ অভিনন্দিত করেছেন।" হাদীসে আরো আছে যে, "ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত কোন জিনিস কাউকে দেয়া হয়নি।"

বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত উসমান (রা) কে ঘাতকরা আঘাত করে, তখন তার দাড়ির ওপর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকা অবস্থায় তিনি বলেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায্‌ যালেমীন। হে আল্লাহ! আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমার কাছে সাহায্য চাই এবং সকল বিষয়ে সাহায্য চাই, আর আমাকে তুমি যে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছ, তাতে আমি ধৈর্য চাই।"

জামে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ "যার দুটো অপ্রাপ্ত বয়স্ক

সন্তান মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "অপ্রাপ্ত বয়স্ক মৃত সন্তানেরা জান্নাতের সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াবে। কেয়ামতের মাঠে তারা তাদের পিতামাতাকে পেয়ে তাদেরকে জাপটে ধরবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ না করিয়ে ছাড়বেনা।"

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ) বলেন ঃ যৌবনে আমি মদে আসক্ত ছিলাম। এই সময় আমার দুবছর বয়স্কা একটি মেয়ে মারা যায়। মেয়েটিকে আমি খুবই ভালোবাসতাম। তাই তার মৃত্যুতে আমি এত ব্যথিত হই যে, মদ পান অনেকটা কমিয়ে দেই। একদিন ঘুমিয়ে আমি স্বপ্নে দেখি, কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে এবং আমি আমার কবর থেকে উঠেছি। সহসা দেখলাম বিরাটকায় একটি অজগর সাপ আমাকে তাড়া করছে। আমি তার ভয়ে ছুটে পালাতে লাগলাম। কিন্তু সাপটা তেড়ে আসতেই লাগলো। পথিমধ্যে সাদা কাপড় পরিহিত এক বৃদ্ধকে দেখে বললাম, "দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিন। একটা সাপ আমাকে তেড়ে আসছে।" তিনি বললেন ঃ "আমি দুর্বল। আর এই সাপ আমার চেয়ে সবল। তুমি ছুটে পালাতে থাক। আল্লাহ্ হয়তো তোমাকে রক্ষা করবেন।" আমি ছুটতে ছুটতে একটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে দেখলাম কতকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে। তাদের প্রত্যেকের মুখ চাঁদের মত উজ্জ্বল। দেখলাম, তাদের মধ্যে আমার মেয়েটিও রয়েছে। সে আমাকে দেখে নিচে নেমে এল এবং একটি প্রদীপ সাপের দিকে ছুঁড়ে মারলো। এতে সাপটি পালিয়ে গেল। এরপর আমার মেয়ে আমার কোলে এসে কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলো ঃ "সেই সময় কি এখনো আসেনি যখন মুমিনদের হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণে নিবিষ্ট হবে এবং তিনি যে সত্য বিধান নাযিল করেছেন তার প্রতি আকৃষ্ট হবে?" আমি বললাম ঃ ওহে কচি মেয়ে! তুমি আবার কুরআনও জান নাকি? সে বললোঃ আব্বু! আমরা তোমাদের চেয়েও বেশী জানি। আমি বললাম ঃ তোমার সাথীরা কারা এবং এখানে তোমরা কী কর? সে বললো ঃ আমরা এখানে সবাই মুসলমান বাবামার মৃত শিশু। কিয়ামত পর্যন্ত এখানে বাবামায়ের আগমনের অপেক্ষায় থাকবো। আমি বললাম ঃ ওহে আমার কচি মেয়ে! এই সাপটা আমার পিছু নিয়েছিল কেন জান? সে বললো ঃ আব্বু, ওতো তোমার অসৎ কাজ। তুমি ওকে নিজেই শক্তিশালী বানিয়েছ। আমি বললাম ঃ ঐ বৃদ্ধ লোকটি কে? সে বললো ঃ সে তো তোমার সৎ কাজ-যা তোমার অবহেলার কারণে দুর্বল হয়ে গেছে। তুমি তওবা কর। তাহলে নাজাত পাবে। এরপর আমার ঘুম ভেংগে যায় এবং আমি তৎক্ষণাৎ তওবা করি।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দার ওপর যখনই কোন বিপদ মুসিবত আসে, তখন তা হয় তাকে এমন কোন গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য আসে, যাকে আল্লাহ ঐ বিপদ ছাড়া আর কোন ভাবে ক্ষমা করবেন না বলে স্থির করেছেন, নচেৎ তাকে এমন কোন উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য আসে, যার জন্য আল্লাহ আর কোন বিকল্প রাখেননি।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদ মুসিবতে পড়ে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলবে এবং দোয়া করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে এই মুসিবতে আশ্রয় দাও এবং আমাকে এর চেয়ে ভালো বিকল্প দান কর, আল্লাহ তাকে উপযুক্ত পুরস্কার ও উত্তম বিকল্প দেবেন। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ "এরপর আমার স্বামী আবু সালমা মারা গেলে আমি অনুরূপ দোয়া করেছিলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) ন্যায় স্বামী দান করলেন।" (সহীহ মুসলিম)

বিচারপতি শুরাইহ (রাহ) বলতেন ঃ আমি কোন বিপদে পড়লে চারবার আল্লাহর প্রশংসা করি। প্রথমবার এই জন্য যে, বিপদটা আরো মারাত্মক হতে পারতো কিন্তু হয়নি। দ্বিতীয়বার যখন আল্লাহ আমাকে সহ্য করার তওফীক দেন। তৃতীয়বার যখন আমাকে "ইন্নালিল্লাহ . . ." পড়ার সুযোগ দেন। এবং চতুর্থবার যখন দেখি যে বিপদটা আমার ইসলাম থেকে পদস্খলনের আকারে হয়নি।

পক্ষান্তরে কেউ যদি বিপদাপদে অস্থির হয়, নিজের মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করে, চুল ও কাপড় ছেঁড়ে, মুখে ও বুকে থাপ্পড় ও খামচি মারে এবং প্রবল জোরে চিৎকার করে কাঁদে বা ভাড়াটে দিয়ে কাঁদায়, তবে তার ওপর আল্লাহ অবশ্যই অসন্তুষ্ট হবেন। অভিসম্পাত করবেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তার নেক আমল নষ্ট করে দেবেন। কেননা এসব তৎপরতা তাকদীর তথা আল্লাহর ফায়সালাকে অবিশ্বাস করার শামিল। বিশেষ করে নিজের মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করা এক ধরনের আত্মহত্যার চেষ্টা বটে।

৫০. বিদ্রোহ, ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা

আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ "শুধুমাত্র তাঁদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যারা মানুষের ওপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে বেড়ায়। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে।" (সূরা আশ্‌শূরা)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা আমার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছেন

যে, তোমরা বিনয়ী হও, যাতে একজন অপরজনের ওপর আগ্রাসন না চালায় ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করে।" (সহীহ মুসলিম, সুনানু আবীদাউদ ও সুনানু ইবনে মাজা)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন : "বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যের মত এমন অপরাধ আর নাই যা আখিরাতের আযাব ছাড়াও দুনিয়াতেও আযাব অনিবার্য করে তোলে।" (জামে' তিরমিযী ও সুনানু ইবনু মাজাহ)

এই অপরাধের সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেয়েছিল কারূন। সে ছিল হযরত মূসা (আ) এর আপন চাচাতো ভাই এবং ফিরাওনের অন্যতম উপদেষ্টা। তার বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাকে তার সমস্ত সহায় সম্পদসহ জ্যান্ত মাটিতে পুতে ফেলেন। এই ঘটনার বিবরণ সূরা আল কাসাসে নিম্নরূপ দেয়া হয়েছে ঃ

"নিশ্চয় কারূন মূসার গোত্রের লোক ছিল। সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলো। আমি তাকে এমন ধনভান্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার গোত্র তাকে বলেছিল যে, দম্ভ করোনা, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তাদ্বারা আখিরাতের বাসস্থান খুঁজে নাও। তবে দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য অংশ ভুলনা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। সে বললো ঃ এ সম্পদ তো আমি নিজের জ্ঞানের সাহায্যে অর্জন করেছি। সে কি জানতোনা যে, আল্লাহ তার পূর্বে তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও ধনশালী বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? আর অপরাধীদেরকে তো তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা। (কেননা তাদের আমলনামায় সবই লেখা থাকবে।) কারূন জাঁকজমক সহকারে আপন সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। তখন যারা পার্থিব জীবনের জন্য লালায়িত ছিল। তারা বলতে লাগলো ঃ আহা কারূনকে যেরূপ সম্পদ দেয়া হয়েছে, অদ্রূপ আমাদেরকেও যদি দেয়া হতো! সে সত্যই খুব ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, তারা বললো ধিক, তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম। ধৈর্যশীল ব্যতীত আর কেউ তা পাবেনা। অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে মাটির নিচে পুতে ফেললাম। আল্লাহর শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে-এমন কোন দল তার পক্ষে ছিলনা এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলনা। আগের দিন যারা কারূনের মত হবার অভিলাষ পোষণ করেছিল, তারা (কারূনের পরিণতি দেখে)

বলতে লাগলো, আসলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জীবিকা বাড়িয়ে দেন, যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। আল্লাহ্ আমাদের ওপর সদয় না হলে আমাদেরকেও তিনি মাটির নিচে পুতে দিতেন। আসলে কাফেররা সফলকাম হয়না।"

ইমাম ইবনুল জাওসী বলেন ঃ কারূন কিভাবে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ্ প্রকাশ করেছিল, সে সম্পর্কে একাধিক উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের মতে, সে জালিয়াতির মাধ্যমে জনৈকা দুশ্চরিত্রা মহিলাকে হযরত মূসার (আ) এর বিরুদ্ধে এই মর্মে দুর্নাম রটাতে প্ররোচিত করে যে, তিনি তার সাথে ব্যভিচার করেছেন। হযরত মূসা (আ) ঐ মহিলাকে শপথপূর্বক সত্য কথা বলতে বাধ্য করলে সে ফাঁস করে দেয় যে, কারূনের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে এবং সেই তাকে এই অপবাদ রটাতে প্ররোচিত করেছে। যুহহাকের ও কাতাদার মতে, কারূন আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করে কুফরীতে লিপ্ত হয়। মাওয়ার্দীর মতে, সে ফেরাউনের দরবারে চাকুরী করতো এবং সেই খুঁটির জোরে আপন গোত্র বনী ইসরাইলের ওপর নির্যাতন চালাতো।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ) এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বদদোয়া করলে আল্লাহ্ বলেন ঃ হে মূসা! আমি মাটিকে নির্দেশ দিয়েছি তোমার আদেশ মানতে। তুমি তাকে যা ইচ্ছা আদেশ দাও। মূসা (আ) আদেশ দিলেন ঃ হে মাটি, কারূনকে গ্রাস কর। তৎক্ষণাৎ কারুনের খাট মাটিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে কারূন মূসা (আ) এর দয়া ভিক্ষা করলো। কিন্তু মূসা (আ) পুনরায় মাটিকে আদেশ দিলেন ঃ ওকে গ্রাস কর। এবার তার পা মাটির নিচে তলিয়ে গেল। এভাবে তিনি বারবার আদেশ দিতে দিতে কারূন সম্পূর্ণরূপে মাটির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

(পবিত্র আল কুরআনে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে কারূনের বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যের যে দিকগুলো প্রকাশ পেয়েছে, তো হলো ঃ (১) ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর সাথে যোগসাজশ করে মুসলমানদের ও স্বজাতির স্বার্থের ক্ষতি সাধন (২) নিজের অর্জিত সম্পদকে আল্লাহর অনুগ্রহের দান মনে করার পরিবর্তে নিজের জ্ঞানের ফল ভেবে বাহাদুরী প্রদর্শন (৩) নিজ সম্পদে সমাজের দরিদ্র জনগণের যে অধিকার রয়েছে, তা উপলব্ধি না করা ও দিতে অস্বীকার করা, উপরন্তু জনগণকে নিজের বিত্তবৈভবের জৌলুস দেখিয়ে বেড়ানো, যাতে বঞ্চিতদের মানসিক যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায় এবং তাদের বঞ্চনার অনুভূতি আরো তীব্রতর হয়। (ঘ) কার্পণ্য লাগামহীন পুঁজিবাদ, দাম্ভিক সুলভ ও একচেটিয়া ভোগবাদী মানসিকতা। — অনুবাদক)

৫১. দুর্বল শ্রেণী, দাসদাসী বা চাকর-চাকরাণী ও জীবজন্তুর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তার সাথে কাউকে শরীক করোনা, এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, আরো সদ্ব্যবহার কর আত্মীয়স্বজনদের সাথে, এতীমদের সাথে, দরিদ্রদের সাথে, আত্মীয় প্রতিবেশীরর সাথে, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে, সফরসংগীর সাথে, পথিকের সাথে এবং দাসদাসীর সাথে। আল্লাহ দাম্ভিক ও গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।" (সূরা আন নিসা)

রাসূল (সা) তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তেও তাকিদ দিয়েছেন যে, "নামায ও অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার সৌভাগ্যের উৎস আর তাদের সাথে দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্যের উৎস।" (মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবুদাউদ)

হযরত আবু মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি একজন ভৃত্যকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছিলাম। এই সময় আমার পশ্চাতে একটা শব্দ শুনলাম ঃ "জেনে রেখ, হে আবু মাসউদ, আল্লাহ তায়ালাই তোমাকে এই ভৃত্যের ওপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন।" আমি বললাম ঃ হে রাসূলুল্লাহ! আমি আর কখনো দাসদাসী ও চাকর চাকরানীকে প্রহার করবোনা। আমি ওকে স্বাধীন করে দিলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ "এই কাজটি না করলে আগুন তোমাকে কিয়ামতের দিন ভস্মীভূত করে দিত।" (সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যারা দুনিয়াতে মানুষকে নির্যাতন করে, আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন। জামে' তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদে আছে যে, "রাসূলকে (সা) জিজ্ঞাসা করা হলো, অধীনস্থদেরকে কতবার ক্ষমা করবো। রাসূল (সা) বললেন ঃ প্রতিদিন ৭০ বার।"

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) তাঁর এক ভৃত্যকে ডাকলেন। সে অনেক দেরীতে এল। তখন রাসূল (সা) নিজের হাতের মেসওয়াক দেখিয়ে বললেন, "কিয়ামতের দিন বদলা পাওয়ার ভয় না থাকলে তোমাকে এই মেসওয়াক দিয়ে পিটাতাম।"

এক হাদীসে আছে যে, এক মহিলা রাসূল (সা) কে এসে বললো ঃ হে রাসূল! আমি নিজের বাঁদীকে "ব্যভিচারিনী" বলে গাল দিয়েছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি ব্যভিচারের কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখেছ? মহিলা বললো ঃ না। রাসূল

(সা) বললেন ঃ "সাবধান, এই মেয়েটি কিয়ামতের দিন তোমার কাছ থেকে বদলা নেবে।" মহিলা তৎক্ষণাত তার বাঁদীর কাছে গেল এবং তাকে একটা লাঠি দিয়ে বললো ঃ আমাকে মারো। বাঁদীটি রাযী হলোনা। তখন ঐ মহিলা তাকে স্বাধীন করে দিল। তারপর সে রাসূল (সা) এর কাছে এসে বাঁদীকে স্বাধীন করার খবর জানালেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ "আশা করা যায়, তোমার গুনাহ মাফ হবে।"

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে যে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে তার অধোস্তনের ওপর কোন মিথ্যা অপবাধ আরোপ করবে, সে কিয়ামতের দিন অপবাদের জন্য নির্ধারিত বেত্রদন্ড ভোগ করবে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "চাকর চাকরানী বা দাসদাসীকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্ত্র দিতে হবে এবং তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব তার ওপর চাপানো যাবেনা। নিতান্তই যদি চাপাতে হয়, তবে তার সাথে নিজে কাজ করতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিওনা। তিনি তোমাদেরকে তাদের মালিক বানিয়েছেন, যদি চাইতেন তবে তাদেরকে তোমাদের মালিক বানাতে পারতেন।" (সহীহ মুসলিম, তাবরানী)

অধীনস্থ মানুষ বা পশুকে ক্ষুধায় কষ্ট দেয়া এবং সন্তান ও পিতামাতাকে বিচ্ছিন্ন করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের কবীরা গুনাহ। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মা ও সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে তার প্রিয়জন থেকে কিয়ামতের দিন বিচ্ছিন্ন করবেন। (জামে' তিরমিযী)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "মানুষের নিজের অধীনস্থ মানুষ বা পশুকে ক্ষুধায় কষ্ট দেয়ার মত বড় গুনাহ আর হতে পারেনা।" (সহীহ মুসলিম)

অনুরূপভাবে পালিত জীবজন্তুকে সজোরে প্রহার করা, সব সময় খাঁচায় আবদ্ধ রাখা, যথাসময়ে খাবার না দেয়া অথবা তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করা জায়েয নয়। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে অনাহারে মেরে ফেলার কারণে একমহিলা আযাব ভোগ করবে।" বলাবাহুল্য যে, এ কথা সকল প্রাণীর বেলায়ই প্রযোজ্য। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) কোন জীবজন্তুকে তার স্বাভাবিক কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে এবং তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজে খাটাতে নিষেধ করেছেন। কোন জন্তুকে যবাই করতে হলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে যবাই করতে বলেছেন এবং যে জন্তুকে হত্যা করতে হবে, তাকে বন্দী না রেখে প্রথম সুযোগেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর প্রভৃতি কষ্টদায়ক জন্তুকে পুড়িয়ে হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (সা) কোন

জীবজন্তুকে নিছক চিত্তবিনোদন অথবা সখের বশে এবং কোন উপকারিতা ছাড়া হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

দাসদাসীকে মুক্তি দেয়া খুবই সওয়াবের কাজ। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসদাসীকে মুক্তি দেবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

৫২. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া

সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূল (সা) বললেনঃ "সে মুমীন নয়। সে মুমীন নয়।" সবাই জিজ্ঞাসা করলোঃ হে রাসূল! কে? রাসূল (সা) বললেন, "যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টকর কাজ থেকে নিরাপদ নয়।" প্রতিবেশী তিন রকমঃ প্রথম মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী। এ ধরনের প্রতিবেশী তিনটি অধিকার পায়। একটি আত্মীয় হিসাবে, একটি মুসলমান হিসাবে এবং একটি প্রতিবেশী হিসাবে। দ্বিতীয় মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী। এই প্রতিবেশী দুইটি অধিকার পাবেঃ একটি প্রতিবেশী হিসাবে ও একটি মুসলমান হিসাবে। তৃতীয় অমুসলিম প্রতিবেশী। এ ধরনের প্রতিবেশী স্রেফ প্রতিবেশীত্বের অধিকার পাবে।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে আহার করে এবং তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, সে মুসলমান নয়। রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ জিবরীল আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত সতর্ক করে যে, কখনো কখনো ভাবি, প্রতিবেশীকে হয়তো আমার উত্তরাধিকারী বানানো হবে। (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজা)

রাসূল (সা) আরো বলেছেনঃ দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন ধনী প্রতিবেশীকে জাপটে ধরে বলবেঃ 'হে প্রভুঃ আমার এই ভাইকে তুমি সচ্ছল বানিয়েছিলে এবং সে আমার নিকটেই থাকতো, কিন্তু আমি ভুখা থাকতাম আর সে পেট পুরে খেত। ওকে জিজ্ঞাসা কর, কেন আমার ওপর দরজা বন্ধ করে রাখতো এবং আমাকে বঞ্চিত করতো।" রাসূল (সা) বলেনঃ তিনটি গুনাহ্ সবচেয়ে ভয়াবহঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা, সন্তানকে অভাবের ভয়ে হত্যা করা এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করা। "(সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, জামে তিরমিজী)

হযরত ইবনে উমরের একজন ইহুদী প্রতিবেশী ছিল। যখনই তার বাড়িতে ছাগল যবাই হতো, বলতেন, আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে কিছু গোশ্ত দিয়ে এস।" (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজী)

প্রতিবেশীর উচিত অপর প্রতিবেশীর কষ্টদায়ক আচরণ যতদূর সম্ভব সহ্য করা। এমনকি সে যদি অমুসলিম হয় তবুও। কেননা এটাও তার প্রতি উপকার ও অনুগ্রহের অনুর্ভুক্ত। একবার এক ব্যাক্তি রাসূল (সা) এর কাছে এসে বললোঃ হে রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজ বলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারবো। রাসূল (সা) বললেনঃ পরোপকারী হও। সে বললোঃ "আমি কিভাবে বুঝবো পরোপকারী হয়েছি কিনা? রাসূল (সা) বললেনঃ তোমার প্রতিবেশীর কাছে জিজ্ঞাসা কর সে যদি বলে যে, তুমি পরোপকারী, তাহলে তুমি পরোপকারী। আর সে যদি বলে যে, তুমি পরের অনিষ্টকারী, তাহলে তুমি অনিষ্টকারী।" (বায়হাকী)

অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেনঃ প্রতিবেশীর অধিকার এই যে, সে যখন সাহায্য চাইবে তাকে সাহায্য করতে হবে, সে যখন ঋণ চাইবে তাকে ঋণ দিতে হবে। যখন সে কোন কিছুর মুখাপেক্ষী হয়, তাকে তা দিতে হবে, যখন সে রুগ্ন হয় তাকে দেখতে যেতে হবে, যখন সে কল্যাণ লাভ করে তখন তাকে অভিনন্দন জানাতে হবে, যখন সে বিপদে পড়ে তখন তাকে সমবেদনা জানাতে হবে, যখন সে মারা যায়, তার জানাযা পড়তে ও তাকে সমাহিত করতে কবরের কাছে যেতে হবে, তার অনুমতি ছাড়া উঁচু বাড়ি বানিয়ে বাতাস বন্ধ করা যাবেনা। ডেগচিতে যে খাদ্য সামগ্রী রাখা হয়, তার ঘ্রাণ যদি সে পায়, তবে তা থেকে তাকে কিছু দিতে হবে, ফল কিনলে তাকে হাদিয়া পাঠাতে হবে, নচেত তার খোসা বাইরে ফেলা যাবেনা, যাতে সে দেখতে না পায়।"

রাসূল (সা) বলেন, প্রতিবেশী একজন নারীর শ্লীলতা হানি করা অন্য দশজন নারীর শ্লীলতা হানি করার সমান। অনুরূপ একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি করা অন্য জায়গায় দশজনের বাড়ীতে চুরি করার সমান।

প্রতিবেশীর প্রতি সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া খুবই মহৎ কাজ—যদিও সে বিরোধী হয়। কথিত আছে যে, হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তাসতারী (রহ) এর একজন অগ্নি উপাসক প্রতিবেশী ছিল। প্রতিবেশীর গৃহ থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ ময়লা আবর্জনা তার অলক্ষ্যে হযরত সাহলের ঘরে এসে পড়তো। কিন্তু তিনি সে জন্য প্রতিবেশীর কাছে কোন অভিযোগ করতেন না। দিনের বেলা আবর্জনা জমা করে ঢেকে রাখতেন এবং রাত্রে বাইরে ফেলে দিতেন। একদিন সাহলের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। তিনি তার প্রতিবেশীকে ডেকে আবর্জনার স্তূপ দেখিয়ে বললেন, "আমার মৃত্যু ঘনিয়ে না আসলে আপনাকে এটা দেখাতাম না। আমার আশংকা যে, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারের আর কেউ আমার মত

সহনশীলতা দেখাতে পারবেনা। তাই আপনাকে দেখালাম। আপনি যা ভালো মনে হয় করুন।" প্রতিবেশী অগ্নি উপাসকের বিস্ময়ের অবধি রইলনা। সে বললো, "আপনি এত দীর্ঘকাল ব্যাপী এই বিরক্তিকর ব্যাপারটা সহ্য করে আসছেন। অথচ টু শব্দটি করেননি। আর আমি কিনা এখনো নিজের কুফরীর ওপর বহাল আছি।" এই বলে সে সাহলের হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। আর সাহলও তৎক্ষণাত ইন্তিকাল করলেন।

৫৩. মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা, গালি দেয়া ও তাদের পরস্পরের মধ্যে গোলযোগ বিভেদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "হে মুমীনগণ! তোমরা একদল আর এক দলকে উপহাস করোনা। কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারীদের চেয়ে ভালোও হতে পারে। তোমরা এক দল মহিলা আর এক দল মহিলাকে উপহাস করোনা। কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারীদের চেয়ে ভালোও হতে পারে। আর তোমরা পরস্পরের দুর্নাম ও কুৎসা রটিওনা এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকনা। খারাপ নামে ডাকা ঈমানের পর খুবই জঘন্য কাজ, যারা এ কাজ থেকে বিরত হয়না তারাই যালিম।" (সূরা আল হুজরাত)

আল্লাহ আরো বলেছেনঃ "একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়িওনা এবং অসাক্ষাতে নিন্দা করোনা।" সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বিকৃত হবে সেই ব্যক্তি, যার অশালীন ও অশ্রাব্য কথাবার্তা শোনার ভয়ে জনগণ তার সংগ ত্যাগ করে।

রাসূল (সা) আরো বলেছেন : হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে সংকীর্ণতা দূর করে দিয়েছেন। তবে যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাই এর মানসম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তার কথা ভিন্ন। সে সংকীর্ণতার শিকার হবে।"

সহীহ মুসলিম ও সুনানে তিরমিযীতে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে অপর মুসলমানের জান, মাল ও সম্ভ্রমের ক্ষতি করা হারাম।" সহীহ মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। কেউ কারো ওপর যুলুম করেনা, কেউ কাউকে অপমান করেনা এবং ঘৃণা করেনা। কোন মুসলমানের পক্ষে এর চেয়ে খারাপ কাজ আর কিছু হতে পারেনা, যে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ মুসলমানকে গালি

দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ বাধানো কুফরী।

হাকেম ইবনে হাব্বান, আহমাদ ও বায়যার বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলকে (সা) বলা হলো যে, "অমুক মহিলা রাত জেগে নামায পড়ে এবং দিনের পর দিন রোযা রাখে, কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী লোকজনকে কটু কথা দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূল (সা) বললেনঃ তার কোন ভালাই হবে না। সে জাহান্নামে যাবে।" হাদীসে আরো আছে যে, "তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের শুধু গুণাবলী বর্ণনা কর এবং দোষ বর্ণনা থেকে বিরত থাক। কেননা সে তো তার কর্মফলের জায়গায় পৌঁছে গেছে।" (হাকেম) রাসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কাউকে "কাফের" অথবা "আল্লাহর দুশমন" বলে আখ্যায়িত করে অথচ আসলে সে তা নয়, তার আরোপিত উক্ত আখ্যা তার কাছেই ফিরে আসবে।" অর্থাৎ সে নিজেই কাফের ও আল্লাহর দুশমন হয়ে যাবে। (সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম) সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "মিরাজের রাত্রে আমি একদল লোক দেখেছি, যাদের হাতে তামার নখ ছিল এবং তা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমন্ডল খামচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ হে জিবরীল, এরা কারা? তিনি বললেনঃ "যারা মানুষের নিন্দা ও কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো এবং তাদের মানসম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো।"

বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য ও গোলযোগ সৃষ্টি এবং জীবজন্তুর মধ্যে লড়াই বাধানো ভয়ংকর কবীরা গুনাহ। রাসূল (সা) বলেনঃ "শয়তান এখন আর এ আশা করেনা যে, আরব উপদ্বীপের মুসলমানরা তাকে পূজা করবে। তবে তাদের মধ্যে বিভেদ অনৈক্য ও কোন্দল সৃষ্টির আশা সে এখনও পোষণ করে।" এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুই ব্যক্তি বা দুই দলের মধ্যে যে গন্ডগোল ও কলহ সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে কষ্টদায়ক ও উস্কানীমূলক কথার আদান প্রদান করে, সে শয়তানের দলভূক্ত চোগলখোর ও নিকৃষ্টতম মানুষ। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, চাকর ও মনিবের মধ্যে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্টকারীও শয়তানের দলভুক্ত চোগলখোর। চাই তা যতই ভালো কাজের মোড়কে করা হোকনা কেন। রাসূল (সা) বলেছেনঃ "সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ও চাকর মনিবের মধ্যে বিভেদ ও কোন্দল বাধায়।" (সুনানে আবু দাউদ) অনুরূপভাবে আমোদ প্রমোদের উপকরণ হিসাবে মোরগ লড়াই, কুকুর লড়াই, ষাঁড় লড়াই ইত্যাদি অনুষ্ঠিত করতে রাসূল (সা) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। (একই কারণে মুষ্ঠিযুদ্ধ এবং দৈহিক ক্ষতি ও আর্থিক অপচয়ের ঝুঁকিপূর্ণ যাবতীয় খেলা ও প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। —অনুবাদক)

পক্ষান্তরে দুই পক্ষের বিবাদ মীমাংসা করে দিয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা অত্যন্ত মহৎ কাজ। এরূপ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গোপন শলাপরামর্শ করতেও ক্ষতি নেই। নচেৎ গোপন শলাপরামর্শ সন্দেহ সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে। সূরা আন নিসার এক আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "তাদের বহু গোপন সলাপরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে ব্যক্তি সদকা, সৎকাজ কিংবা জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্দেশ্যে এটা করে তার কথা স্বতন্ত্র। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এরূপ কাজ করে তাকে আমি বিরাট প্রতিদান দেব।" রাসূল (সা) মানুষের বিবাদ মীমাংসা, কোন্দল নিরসন, ঐক্য সংহতকরণ ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠকরণে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি হযরত আবু আইয়ূব আনসারীকে বলেছিলেনঃ তোমাকে লাল উটের পাল অপেক্ষা ভালো এমন সদকার সন্ধান দেব কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, হে রাসূল। রাসূল (সা) বললেনঃ মানুষের মধ্যে যখন পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তখন তা শুধরে দেবে, এবং তারা যখন পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদেরকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর করে দেবে।"

পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করা এত বড় মহৎ কাজ যে, এ জন্য রাসূল (সা) প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলারও অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ আল বুখারীতে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে মানুষের সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করে, ফলে সে যা বলে তার ফলাফল ভালো হয়ে থাকে।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত উম্মে কুলসুম বলেছেনঃ যুদ্ধ, পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরানো এবং স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ও স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে কিছু বলা—এই তিনটি ক্ষেত্রেই শুধু রাসূল (সা) মিথ্যার অনুমতি দিয়েছেন।

সহীহ আল বুখারীতে আছে যে, রাসূল (সা) বনু আমরের মধ্যে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছে শুনে সাহাবীদের একটি দল নিয়ে সেখানে চলে যান এবং উত্তেজনা প্রশমিত করেন। রাসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দু'জনের গোলমাল মিটিয়ে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার সকল কাজ বিশুদ্ধ করে দেবেন, তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে একটি গোলাম মুক্ত করার সওয়াব দেবেন এবং তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

৫৪. সৎ ও খোদাভীরু বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "যারা মুমিন নরনারীদেরকে তারা যা করেনি, তাই প্রচার করে কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ রটায় এবং সুস্পষ্ট গুনাহর কাজ করে।" (সূরা আল আহযাব) "তোমরা অনুগত মুমিনদের প্রতি যত্নশীল থাক।" (সূরা আল-হিজর) হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "আল্লাহ

তায়ালা বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুকে কষ্ট দেয়, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছি।" অপর এক হাদীসে আছে যে, একবার সালমান ফারসী, সুহাইব ও বিলাল (রা) এই তিন সাহাবী এক জায়গায় বসেছিলেন। এই সময়ে তাদের কাছে আবু সুফিয়ান এল। তাকে দেখে তাঁরা বললেনঃ "আল্লাহর তরবারীগুলো আল্লাহর শত্রুর কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়নি।" সেখানে উপস্থিত হযরত আবু বকর (রা) এ কথা শুনে বললেনঃ "কুরাইশ বংশের প্রবীণ নেতা সম্পর্কে তোমরা এই মন্তব্য করলে?" অতঃপর তিনি রাসূল (সা) এর কাছে এসে তাকে পুরো ব্যাপারটা জানালেন। রাসূল (সা) বললেন, "হে আবু বকর! তুমি সম্ভবত ঐ তিন সাহাবীর মনে ক্রোধের সঞ্চার করেছ এবং আল্লাহকেও ক্রুদ্ধ করেছ।" (অর্থাৎ তুমি ভালো করনি) হযরত আবু বকর তৎক্ষণাত ঐ তিন সাহাবীর নিকট গেলেন এবং বললেনঃ "আমার কথায় কি তোমরা রাগ করেছ ভাইয়েরা?" তারা বললেনঃ "না, ভাই, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।"

উল্লেখ্য যে, রাসূল (সা) এর প্রতি সর্বপ্রথম যারা ঈমান এনেছিল, তারা দরিদ্র শ্রেণীর লোক ছিল। শুধু তাঁর প্রতি নয়, সকল নবীর প্রতিই সর্ব প্রথম দরিদ্র লোকেরাই ঈমান এনেছিল। রাসূল (সা) প্রায় সময়ই তাঁর এই সব দরিদ্র সাহাবী যথা সালমান, সুহাইব, বিলাল, আম্মার প্রমুখের কাছে বসতেন। মুশরিকরা ইহুদী আলেমদের কাছ থেকে জানতে পারলো যে, নবী রাসূলদের আলামতই এই যে, তাদের প্রথম অনুসারী দরিদ্র লোকদের মধ্য থেকেই হয়ে থাকে। তাই তারা দরিদ্রদেরকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য কৌশল তৈরী করলো। মুশরিকদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাসূল (সা) এর কাছে এসে বললোঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার চারপাশ থেকে গরীবদেরকে সরিয়ে দাও। কেননা ওদের সাথে বসতে আমাদের ঘৃণা করে। ওদেরকে সরিয়ে দিলে সমাজের শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তোমার ওপর ঈমান আনবে। এর জবাবে আল্লাহ নাযিল করলেনঃ "যারা তাদের প্রতিপালককে খুশী করার জন্য সকাল বিকাল তাকে ডাকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিওনা।" (আল-আনয়াম)

মুশরিকদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পর তারা বললোঃ "হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে যদি তুমি তাড়াতে না চাও, তাহলে আমাদের জন্য একদিন এবং ওদের জন্য একদিন নির্দ্ধারণ কর। এর জবাবে আল্লাহ নাযিল করলেনঃ

"যারা তাদের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সকাল সন্ধ্যা তাকে ডাকে, তুমি ধৈর্য ধারণ করে তাদের সাথে থাকো, দুনিয়ার জাকজমকের আকাংখায়

তোমার নজরে তারা যেন উপেক্ষিত না হয়।" (সূরা আল কাহ্ফ)

এরপর রাসূল (সা) দরিদ্র সাহাবীদের প্রতি অধিকতর যত্নশীল হন এবং তাদেরকে অধিকতর গুরুত্ব ও মর্যাদা দেন। সেই থেকে এটা ইসলামের চিরস্থায়ী নীতি হয়ে দাঁড়ায় যে, মর্যাদা ও ভক্তি শ্রদ্ধার মাপকাঠি হবে ঈমান, সৎকর্মশীলতা, তাকওয়া ও খোদাভীতি — পার্থিব জাঁকজমক, শান শওকত, ধনসম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি নয়। যারা তাকওয়া ও খোদাভীতিতে অগ্রসর ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী, তারা দরিদ্র হলেও তাদেরকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও উপেক্ষা করা যাবেনা এবং কোনভাবেই তাদেরকে কষ্ট দেয়া যাবেনা।

৫৫. দাম্ভিকতা ও আভিজাত্য প্রদর্শনার্থে টাখনুর নিচ পর্যন্ত পোশাক পরা

সহীহ আল বুখারীতে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "টাখনুর নিচে পর্যন্ত যে পোশাক পরবে সে জাহান্নামে যাবে।" মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "যার পোশাক অহংকারবশত টাখনুর নিচে গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।" সুনানে আবু দাউদে আছে যে, এক ব্যক্তি টাখনুর নিচে গড়ানো পোশাক পরে নামাজ পড়ছিল। এই সময় রাসূল (সা) তাকে বললেনঃ যাও ওযু করে এস। সে ওযু করে এলে আবার বললেনঃ যাও ওযু করে এস। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলোঃ হে রাসূল! আপনি ওকে ওযু করতে বললেন কেন? রাসূল (সা) চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বললেনঃ সে টাখনুর নিচে গড়ানো পোশাক পরে নামায পড়ছিল। এ ধরনের নামায আল্লাহ কবুল করেন না।

সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) যখন বললেনঃ যার পোশাক অহংকারবশে টাখনুর নিচে গড়ায়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না, তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেনঃ হে রাসূল, আমার পাজামা আমি শক্ত করে না বাঁধলে ঢিল হয়ে গড়িয়ে পড়ে। রাসূল (সা) বললেনঃ "যারা অহংকার বশে এ কাজ করে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।"

[উল্লেখ্য যে এই সম্পর্কিত বেশী কিছু হাদীসে "দাম্ভিকতা ও আভিজাত্য প্রদর্শণার্থে" কথাগুলো নেই। — অনুবাদক]

৫৬. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেনঃ "যে

ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম ব্যবহার করবে, সে আখিরাতে রেশম ব্যবহার করতে পারবেনা।" সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে যে, স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার আমার উম্মাতের পুরুষদের ওপর হারাম করা হয়েছে।" সামরিক ও বেসামরিক উভয় প্রকারের লোকদের বেলায় এটা প্রযোজ্য।

সহীহ্ আল বুখারীতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে, রেশমী পোশাক পরিধান করতে ও রেশমী বিছানায় বসতে নিষেধ করেছেন।

যে ব্যক্তি পুরুষের রেশম ব্যবহার করাকে হালাল মনে করে অথবা অন্য কোন হারামকে হালাল মনে করে সে কাফের। শুধুমাত্র রোগগ্রস্ত ব্যক্তি (ডাক্তারের মতে অনিবার্য হলে) এটা ব্যবহার করতে পারে। আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকরাও প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে। নিছক সখ ও সৌন্দর্যের জন্য পুরুষের পক্ষে রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা সর্বসম্মত ভাবে হারাম। অনুরূপভাবে যে বস্ত্রের অধিকাংশ সূতো রেশমী তাও পুরুষের ব্যবহার করা হারাম। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখে তা খুলে ফেললেন এবং বললেনঃ "তোমাদের এই ব্যক্তির নিজ হাতে জাহান্নামের আগুন পরার সখ হয়েছে।" অনুরূপভাবে স্বর্ণ ও রেশমের নক্‌শা এবং এমব্রয়ডারীও পুরুষের জন্য হারাম। তবে শিশুদের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করানো সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ অধিকাংশ ইমামের মতে পুরুষ শিশুদের জন্যও এটা হারাম।

৫৭. বৈধ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া ও বৈধ আনুগত্যের বন্ধন একতরফাভাবে ছিন্ন করা

ইসলামী শরীয়তে তিন ধরনের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বৈধ এবং যে ব্যক্তি এর কোন একটির অধীন হবে, তার পক্ষে একতরফাভাবে উক্ত কর্তৃত্বের আনুগত্য পরিত্যাগ করা ও সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রথমতঃ যখন প্রচলিত রীতিপ্রথা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণে কেউ কারো দাসদাসীতে পরিণত হয়, তখন উক্ত মনিব তার দাসদাসী বা ভৃত্যের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন না চালালে সেই মনিবকে একতরফাভাবে পরিত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া অবৈধ। তবে অত্যাচারী মনিবকে ছেড়ে পালালে তা বৈধ হবে এবং হিজরতে পরিগণিত হবে। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব। স্বামী যতক্ষণ স্ত্রীর ভরন পোষণ চালাবে এবং আইন সম্মত সকল দাম্পত্য অধিকার প্রদান করতে থাকবে, ততক্ষণ স্বামীর আনুগত্য পরিত্যাগ করা, সম্পর্ক ছিন্ন করা ও অবাধ্য হওয়া স্ত্রীর পক্ষে অবৈধ। (৪৭তম

কবীরা গুনাহ দ্রষ্টব্য) তৃতীয়তঃ এমন কোন নেতা বা দলের আনুগত্য, যে নেতা বা দল শরীয়ত সম্মত উপায়ে নির্দেশ প্রদান করে। এ ধরনের নেতা বা দলের আনুগত্য পরিত্যাগ করা ও সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। এই তিন ধরনের কর্তৃত্বের আনুগত্য সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করা যাচ্ছে।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন দাসদাসী বা ভৃত্য যখন পালিয়ে যায়, তখন সে ফিরে না আসা পর্যন্ত, যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য, সে স্বামীর অনুগত না হওয়া পর্যন্ত এবং মদ খেয়ে মাতাল হওয়া ব্যক্তি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদের নামায ও অন্য কোন সৎকর্ম কবুল হয়না।" (সহীহ মুসলিম, তাবরানী, সহীহ ইবনে খুযায়মা) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির পরিণামের জন্য কেউ দায়ী নয় ঃ (অর্থাৎ তারা নিজেরাই দায়ী) যে ব্যক্তি আপন জামায়াত বা সংগঠন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ও নেতার অবাধ্য হয়, যে ভৃত্য মনিবকে ছেড়ে পালিয়ে যায় ও অবাধ্য অবস্থায় মারা যায় এবং স্বামী কর্তৃক যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা সত্ত্বেও যে স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে বেপর্দা চলাফেরা করে ও অনৈসলামিক পন্থায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়ায়। (সহীহ ইবনে হাববান, তাবরানী ও হাকেম)

৫৮. আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে জন্তু যবাই করা

সূরা আল আনয়ামে আল্লাহ বলেন ঃ "যে জন্তুকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করা হয়নি, তা খেয়োনা, এটা গুরুতর পাপ। ....." হযরত ইবনে আব্বাস, কালবী, আতা প্রমুখ ইমাম এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেছেন যে, এ দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কাফির ও মুশরিকদের যবাই করা জন্তুকে বুঝানো হয়েছে। নচেৎ মুসলমানদের যবাই করা জন্তু সর্ব সম্মতভাবে হালাল, চাই তাতে আল্লাহর নাম নেয়া হোক বা না হোক। তাবরানী বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে রাসূল! আমাদের কেউ যদি যবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তা হলে কি হবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ "প্রত্যেক মুসলমানের মুখে আল্লাহর নাম থাকে।

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক ও সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, কিছু মুসলমান বললো ঃ হে রাসূল, লোকেরা আমাদেরকে গোশ্ত দিতে আসে। কিন্তু আমরা জানি না, ঐ সব জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করা হয়েছে কিনা। রাসূল বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর নাম নাও এবং খাও।"

৫৯. জেনেশুনে নিজেকে পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয়া

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের

পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, তার জন্য জান্নাত হারাম। সহীহ্ আল বুখারীর অপর হাদীসে এরূপ ব্যক্তিকে কাফির বলা হয়েছে এবং অভিশাপ ও লা'নত বর্ষণ করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং সে কাফির। যে ব্যক্তি নিজে যা নয় তাই দাবী করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার উচিত জাহান্নামে নিজের বাসস্থান গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি কাউকে কাফির বা আল্লাহর দুশমন বলে অভিহিত করে, অথচ আসলে সে তা নয়, তার উক্তি তার ওপরই প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ সে নিজেই কাফির ও আল্লাহর দুশমনে পরিণত হবে।

৬০. জেনেশুনে অন্যায়ের পক্ষে তর্ক, ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ মানুষের মধ্যে অনেকে এমন আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে, এবং তার অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। অথচ সে কট্টর দুশমন।"

ইমাম গাযযালী (রহ) বলেছেন ঃ ইসলামী শরীয়তে তর্ক তিন প্রকারের এবং তিনটিই নিন্দনীয়। একটি হচ্ছে "মিরা"। এর অর্থ হলো, কারো কথায় নিছক ভাষাগত খুঁত ধরে আপত্তি জানানো। এর উদ্দেশ্য বক্তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও নিজেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা ছাড়া আর কিছু হয়না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে "জিদাল"। এর অর্থ হলো, মতের বিভিন্নতা প্রকাশ করা এবং নিজের মতকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা। আর তৃতীয়টি হলো "খুসূমাত"। এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অর্থ বা অন্য কোন ধরনের স্বার্থ উদ্ধার। এটি কখনো গায়ে পড়ে বাধানো হয়। আবার কখনো অপরের কথার সূত্র ধরে করা হয়। প্রথমটি অর্থাৎ "মিরা" কখনো প্রথমে গায়ে পড়ে করা হয় না, অন্য কোন বক্তব্যের ছুঁতো ধরেই করা হয়। আর শেষের দুটি প্রথমেও করা হয়। পরেও করা হয়। তবে তিনটিরই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অসৎ ও অন্যায়।

ইমাম নবাবী বলেন ঃ তর্ক দু'রকমই হতে পারে ঃ অন্যায়ের পক্ষে অথবা ন্যায়ের পক্ষে। আল্লাহ বলেছেন ঃ "তোমরা আহলে কিতাবের সাথে সুন্দরতম উপায় ব্যতীত তর্ক করোনা।" "আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে তর্ক করা কাফিরদের ছাড়া আর কারো কাজ নয়।" তর্কের উদ্দেশ্য যদি হয় সত্যকে জানা ও প্রতিষ্ঠিত করা তবে তা প্রশংসনীয়; আর সত্যকে প্রতিহত করার জন্য তর্ক করা এবং অজানা বিষয়ে তর্ক করা নিন্দনীয়। এই ব্যাখ্যার আলোকেই কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত

তর্ক সংক্রান্ত উক্তিগুলোকে বুঝতে হবে।

ন্যায়সংগত দাবীর পক্ষেও যদি তর্ক করা হয়, তবে তা যদি মিথ্যাচার, কষ্টদায়ক কথাবার্তা ও অশালীন কথাবার্তার রূপ ধারণ করে, তাহলে তাও নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এক নাগাড়ে তর্ক চালিয়ে যাওয়া গুনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (তিরমিযী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি অজানা বিষয়ে তর্ক করে, সে ঐ তর্ক পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট থাকবেন।" (তিরমিযী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখনই বিপথগামী হয়, তখন সে ঝগড়াটে স্বভাবের হয়ে যায়। (তিরমিযী) রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "তোমাদের সম্পর্কে আমি তিনটে জিনিসের সবচেয়ে বেশী ভয় করি ঃ যাদের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে তাদের পদস্খলন। মুসলিম নামধারী মুনাফিক কর্তৃক কুরআন নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া। এবং দুনিয়ার লোভ-যা তোমাদের মধ্যে খুনোখুনীর প্ররোচনা দেবে।" (তাবরানী)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কুরআন নিয়ে তর্ক করা কুফরী।" (আবু দাউদ)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের মতের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তর্ক থেকে বিরত হয়, তার বাসস্থান জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে হবে। আর যে নিজের মতের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই তর্ক পরিহার করে, তাকে জান্নাতের সাধারণ জায়গায় বাসস্থান দেয়া হবে।"

৬১. উদ্বৃত্ত পানি অন্যকে না দেয়া

আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ "তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের পানি যদি ভূগর্ভে শুকিয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে প্রবহমান পানি দেবে?" (সূরা আল মুল্‌ক)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

"তোমরা উদ্বৃত্ত পানি দানে কুণ্ঠিত হয়োনা, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ফসল দানে কুণ্ঠিত না হন।" মুসনাদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার উদ্বৃত্ত পানি ও উদ্বৃত্ত ঘাস দিতে অস্বীকার করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আপন অনুগ্রহ দিতে অস্বীকার করবেন।"

সহীহ মুসলিম ও সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে ঃ যে ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি আছে, কিন্তু পথিককে তা দেয়না, যে ব্যক্তি

নিছক দুনিয়ার স্বার্থের জন্য কোন নেতার আনুগত্যের অংগীকার করে, নেতা যদি তাকে তার স্বার্থ দেয় তবে সে অংগীকার বজায় রাখে, নচেত ভংগ করে, আর যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে চড়া দামে বিক্রি করার জন্য কসম খেয়ে বলে যে, এটা আমি এত দামে কিনেছি, অথচ আসলে সে সেই দামে কেনেনি, আর ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে।" সহীহ আল বুখারী প্রথম ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছে এইভাবে ঃ "যে ব্যক্তি তার উদ্বৃত্ত পানি অন্য কাউকে দেয় না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি যে জিনিস নিজের হাতে তৈরী করোনি, তার উদ্বৃত্ত অংশ যেমন কাউকে দাওনি, তেমনি আমি আজ আমার অনুগ্রহ তোমাকে দেবনা।"

৬২. মাপে ও ওজনে কম দেয়া

আল্লাহ্ বলেন ঃ "যারা ওজনে ও মাপে কম দেয়, তাদের জন্য সর্বনাশ। যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে আনার সময় ঠিকমত আনে, আর মেপে দেয়ার সময় কম দেয়।" ইমাম সুদী বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন হিযরত করেন তখন সেখানে আবু জুহায়না নামক একজন ব্যবসায়ী ছিল। তার দুটো পাল্লা ছিল। একটা দিয়ে নিজের জিনিস মেপে নিত, অপরটি দিয়ে অন্যের জিনিস মেপে দিত। তার প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "পাঁচটি জিনিসের ফলে পাঁচটি জিনিস অনিবার্য ঃ কোন জাতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আল্লাহ্ তার ওপর তার শত্রুকে চাপিয়ে দেবেন। কোন জাতি আল্লাহর বিধান ছাড়া মনগড়া বিধান দ্বারা দেশ শাসন করলে তাদর মধ্যে দারিদ্র ছড়িয়ে পড়বে, কোন জাতিতে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে তাদের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি মাবে, মাপে ও ওজনে কম দিলে ফসল কম হবে ও দুর্ভিক্ষ হবে, আর যাকাত দেয়া বন্ধ করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে।"

লক্ষণীয় যে, মাপে কম দেয়া ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে তিল তিল করে অলক্ষ্যে চুরি করে এবং হারাম উপার্জন করে।

৬৩. আল্লাহর আযাব ও গযব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া

আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ "তাদেরকে যে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল, তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম (অর্থাৎ প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির দুয়ার খুলে দিলাম) অতপর তারা যখন তাদেরকে দেয়া সম্পদের জন্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল, তখন আমি আকস্মিকভাবে তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা চরম হতাশায় নিমজ্জিত হলো। অতঃপর যালিমদের মূলোৎপাটন করা হলো।" এখানে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করার অর্থ

হলো, তারা টের পায়না এমনভাবে পাকড়াও করা। ইমাম হাসান বসরী বলেন ঃ আল্লাহ্ কাউকে অঢেল সম্পদ দেয়ায় সে যদি মনে করে যে, তাকে পরীক্ষা করা হবে না, তাহলে সেটা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। আবার কাউকে চরম দৈন্যদশায় নিক্ষেপ করা হলে সে যদি মনে করে যে, তাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং তার দিকে কোন দৃষ্টি দেয়া হচ্ছেনা, তবে সেও ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যখন দেখতে পাও যে, আল্লাহ্ কোন বান্দাকে সে যা পছন্দ করে তা দিয়ে যাচ্ছেন, অথচ সে আল্লাহর নাফরমানী অব্যাহত রেখেছে, তখন বুঝতে হবে যে, তাকে সময় দেয়া হচ্ছে এবং তার ওপর আযাব নাযিল হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।" অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন।

বর্ণিত আছে যে, ফিরিশতাদের দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন ইবলীস আল্লাহর কোপানলের শিকার হলো, তখন জিবরীল ও মিকাইল কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে যে কাঁদছো? তারা বললেন ঃ হে প্রভু, আমরা তোমার পরীক্ষার ভয়ে ভীত। আল্লাহ্ বললেন ঃ "এভাবেই থাক। আমার পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়োনা।" জামে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এই দোয়াটি খুব ঘন ঘন পড়তেন ঃ "হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়কে তোমার দীনের ওপর স্থির রাখো।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ হে রাসূল, আমাদের ঈমান নিয়ে কি আপনি শংকা বোধ করেন? রাসূল (সা) বললেনঃ "হৃদয়গুলো আল্লাহর দুই আংগুলের ভেতরে রয়েছে, তিনি যখন যেভাবে চান ওগুলোকে ঘোরান।"

সহীহ্ আল বুখারীতে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত কাজ করতে করতে এমন অবস্থায় পৌছে যায় যে, তার মধ্যে ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। ঠিক এই মুহূর্তে তার ওপর ভাগ্যের লিখন কার্যকর হয় এবং সে জাহান্নামীর মত কাজ করে জাহান্নামে চলে যায়। অনুরূপ সে জাহান্নামবাসীদের মত কাজ করতে করতে জাহান্নামের কাছাকাছি পৌছে যায়। ঠিক এই সময় তার ওপর তার ভাগ্যের লিখন কার্যকর হয় এবং সে জান্নাতের কাজ করে জান্নাতবাসী হয়। মানুষের শেষ কাজগুলো দ্বারাই তার পরিণাম নির্ধারিত হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র আল কুরআনে বালয়াম বাউরার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ ও শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার পরও তার ঈমান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে রবসীসা নামক দরবেশ কাফির হয়ে মরেছেন। সুতরাং প্রত্যেকের নিজ ঈমান সম্পর্কে সাবধান হওয়া উচিত এবং এই দোয়া বেশী করে পড়া

উচিতঃ "রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিন লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।" "হে আমাদের রব! একবার যখন আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন, তখন আমাদের মনকে আর বক্র করে দেবেননা, আর আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মস্ত বড় দাতা।"

হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) প্রায়ই এই দোয়া করতেন ঃ "হে হৃদয় পরিবর্তনকারী, আপনি আমার হৃদয়কে আনুগত্যের ওপর অবিচল রাখুন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে রাসূল! আপনি তো এই দোয়াটা খুব ঘন ঘন করেন। আপনি কি ভয় পান? তিনি বললেন ঃ হে আয়িশা, বান্দাদের মন যখন আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে এবং তিনি যেভাবে চান, তা ঘুরান, তখন আমি নিশ্চিন্ত থাকি কিভাবে? সুতরাং হিদায়াত যখন আল্লাহর কাছ থেকেই আসে, তাঁর ইচ্ছার ওপরই যখন সৎ পথে অবিচল থাকা নির্ভরশীল, মানুষের শেষ ফল যখন অজানা এবং ইচ্ছার দৃঢ়তা যখন অনিশ্চিত, তখন নিজের ঈমান, সৎকর্ম ও নামায রোযা নিয়ে গর্বিত হওয়া অনুচিত। মনে রাখতে হবে, ঈমান ও নেক আমল বান্দার উপার্জিত হলেও তার ক্ষমতা, প্রেরণা ও সুযোগ আল্লাহই দিয়ে থাকেন। এ প্রসংগে নিম্নের কথাগুলো সব সময় মনে রাখতে হবেঃ

(১) দুনিয়ার কোন সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে অহংকারী হওয়া, নিজের চেয়ে ক্ষুদ্র ও বঞ্চিতদেরকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করার কারণে যেমন আল্লাহ উক্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারেন এবং কারূণ প্রমুখের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেনও তেমনি ঈমান, নেক আমল তথা আখিরাতের সম্পদের জন্যও অহংকারী হওয়া ও অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকদেরকে ঘৃণা করা, হেয় করা ও হিংসা করার কারণে উক্ত নেক আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে এবং ঈমানও ছিনতাই হয়ে যেতে পারে। যেমন ইবলীসের এবং বরসীসা ও বালয়াম বাউরার হয়েছিল। সুতরাং নিজের ঈমান, খোদাভীতি ও সততার জন্য প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানানো ও তার স্থায়িত্বের জন্য দোয়া করা কর্তব্য।

(২) হিংসা বিদ্বেষ, রিয়া ও নিয়তের গোলমালের কারণে ঈমান ও নেক আমল বাতিল হয়ে যায়। রাসূল (সা) বলেছেনঃ হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে গ্রাস করে, যেভাবে আগুন শুকনো কাঠকে গ্রাস করে। সুতরাং এই সব জিনিস এসে নিজের বহু কষ্টের অর্জিত অমূল্য সম্পদ ঈমান ও আমল যেন নষ্ট করে না দেয়, সে জন্য মনকে সব সময় পাহারা দেয়া উচিত এবং আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত।

৬৪. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "বল, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের জীবনকে হেলায় নষ্ট করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে থাকেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।" (সূরা আয যুমার) "কাফিররা ছাড়া কেউ আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়না।" (সূরা ইউসুফ)

এক হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন আরশের দিক থেকে জনৈক আহবানকারী উচ্চস্বরে বলতে থাকবে "অমুক কোথায়? অমুক কোথায়?" "এই ডাক যে ব্যক্তি শুনবে, সে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকবে। আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ "তোমাকেই ডাকা হয়েছে। তুমি এস, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার নিকট নিজেকে পেশ কর।" এই সময় আল্লাহর বান্দারা সকলে ভয়ে চক্ষু বিস্ফরিত করে আরশের দিকে তাকাবে। আর যার নাম ধরে ডাকা হয়েছে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তখন আল্লাহ নিজের নূর দিয়ে তাকে অন্য সকলের দৃষ্টির আড়াল করে ফেলবেন। তারপর তাকে বলবেন ঃ "হে আমার বান্দা! তুমিকি জানতে না যে, আমি পৃথিবীতে তোমার যাবতীয় কার্যকলাপ দেখতাম? সে বলবে ঃ "হাঁ, আমার মনিব। আমি তা জানতাম।" আল্লাহ বলবেন ঃ "হে আমার বান্দা! তুমি কি শোননি যে, আমার অবাধ্য বান্দাকে আমি কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকি? সে বলবে! হাঁ, শুনেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ আমার অনুগত বান্দার জন্য আমার কত পুরস্কার রয়েছে, তা কি শোননি? সে বলবে ঃ হাঁ, শুনেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ হে আমার বান্দা, তুমি কি আমার নাফরমানী করেছ? সে বলবে! হাঁ কখনো কখনো করেছি।" আল্লাহ বলবেন ঃ আজ আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমার ধারণা এই যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বলবেন ঃ হে আমার বান্দা! তুমি কি নিশ্চিন্ত ছিলে যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব? সে বলবেঃ "হাঁ, কেননা আপনি আমাকে গুনাহের কাজ করতে দেখেছিলেন, কিন্তু আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন।" আল্লাহ বলবেন ঃ তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, এবং তোমার ধারণা সত্য প্রমাণিত করলাম। এই নাও, তোমার আমলনামা ডান হাতে নাও। এতে তোমার যে সৎকাজ আছে তা আমি কবুল করে নিয়েছি। আর যত খারাপ কাজ আছে তা মাফ করে দিয়েছি। আমি মহানুভব ও দয়ালু।

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূল (সাঃ) এর কাছে কিছু সংখ্যক বন্দীকে আনা হলো। দেখলেন, বন্দীদের মধ্য থেকে এক মহিলা স্বীয় শিশু সন্তানকে দেখেই তাকে কোলে তুলে নিল এবং দুধ খাওয়াতে

লাগলো। রাসূল (সা) সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা স্বীয় সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে/ সাহাবীগণ বললেনঃ না। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ এই মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়ালু, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও বেশী দয়ালু।"

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমার প্রতি আমার বান্দা যেমন ধারণা করে আমি তেমনি। সে যেখানে আমাকে স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সাথে থাকি। আল্লাহ তার গুনাহগার বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে এবং হতাশায় সে যখন মৃত্যুর মুখোমুখী, তখন সেই উটকে ফিরে পেয়েছে। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত এগোয়, আমি তার দিকে দুই হাত এগোই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে যাই।"

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "মুমিন যদি জানতো আল্লাহর কাছে পাপের কি শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে, তাহলে তাঁর জান্নাতের প্রত্যাশা কেউ করতোনা। আর সে যদি জানতো আল্লাহর কাছে কত দয়া ও করুণা রয়েছে, তাহলে তাঁর জান্নাত থেকে কেউ নিরাশ হতোনা।"

শুধু আখিরাতের মুক্তির ব্যাপারেই নয়, দুনিয়ার সুখশান্তির ব্যাপারেও হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ সব রকমের হতাশাই নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা হতাশা মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। গুনাহগারকে আরো গুনাহগার হতে প্ররোচিত করে এবং বিপদ মুসিবত ও অভাব পীড়িত ব্যক্তিকে আত্মহত্যা, মৃত্যু কামনা ও অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনের মত পাপকাজে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ যত দুরবস্থায়ই পতিত হোকনা কেন, আল্লার রহমতের আশার ওপর নির্ভর করে ধৈর্য সহকারে বৈধ পন্থায় সব রকমের পরিস্থিতি মোকাবিলা করা কর্তব্য।[১]

---

১. আলোচ্য ৬৪তম কবীরা গুনাহ মূল গ্রন্থে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। এর প্রথম হাদীসটি ব্যতীত আর কিছুই সেখানে ছিলনা। এমনকি শিরোনামও ছিলনা। কেবল প্রথম হাদীসটির বিষয়বস্তুর আলোকে ৬৪তম কবীরা গুনাহর শিরোনাম, বাদবাকী আয়াত, হাদীসসমূহ সংযোজিত করে অনুবাদক কর্তৃক পূর্ণতা দান করা হয়েছে।

৬৫. বিনা ওযরে জামায়াত ত্যাগ করা ও একাকী নামায পড়া

সহীহ মুসলিম ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) জামায়াত ত্যাগে অভ্যস্ত একদল লোক সম্পর্কে বলেছেন ঃ "আমার ইচ্ছা হয়, অন্য কাউকে নামায পড়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করে জামায়াত ত্যাগকারীদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে আসি।" সহীহ মুসলিমের আর একটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যারা জামায়াত ত্যাগে অভ্যস্ত, তাদের এই অভ্যাস ত্যাগ করতেই হবে, নচেত আল্লাহ তাদের হৃদয়ে অবশ্যই মোহর মেরে দেবেন এবং তারা অবশ্যই শিথিল হয়ে যাবে।"

সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অবজ্ঞার মনোভাব নিয়ে তিনটি জুময়া ত্যাগ করবে, আল্লাহ তার হৃদয়ে সিল মেরে দেবেন। রাসূল (সা) আরো বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি বিনা ওযরে ও কোন ক্ষতির আশংকা ব্যতীতই জুময়ার নামায ত্যাগ করে, তাকে এমন এক খাতায় মুনাফিক লেখা হয়, যে খাতা থেকে কিছুই মোছা হয়নি এবং কোন কিছুই রদবদল করা হয়না।"

সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ওপর জুময়ার নামায পড়া অবশ্য কর্তব্য"

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং কোন ওযর ছাড়াই জামায়াতে যাওয়া থেকে বিরত থাকলো, তার (ঘরের মধ্যে পড়া) নামায কবুল হবে না।"

৬৬. ওসিয়তের মাধ্যমে কোন উত্তরাধিকারীর ক্ষতি সাধন

জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন পুরুষ ও স্ত্রী ষাট বছর ব্যাপী আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করে অতঃপর মৃত্যুর সম্মুখীন হয় এবং ওসিয়তের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি সাধন করে। এর ফলে জাহান্নাম তার জন্য অনিবার্য হয়ে যায়।"

সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কারো উত্তরাধিকার হরণ করে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জান্নাতের উত্তরাধিকার হরণ করবেন।"

জামে তিরমিযীতে আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের জন্য তার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছেন। সুতরাং কোন উত্তরাধিকারীর জন্য ওসিয়ত করা চলবেনা।"

৬৭. ধোকাবাজি, হস্তচাতুরী ও ষড়যন্ত্র করা

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ "খারাপ ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীকেই চারদিক থেকে ঘেরাও করে।" রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "ষড়যন্ত্রকারী ও ধোকাবাজের স্থান জাহান্নামে।" রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন ধোকাবাজ, কৃপণ ও খোঁটাদানকারী জান্নাতে যাবেনা।"

পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ধোকাবাজিকে মুনাফিকদের স্বভাব বলে অভিহিত করেছেন ঃ "তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহকে ও মুমিনদেরকে ধোকা দিয়ে থাকে।"

সহীহ মুসলিমের হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কারো ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের ব্যাপারে ধোকা দেয় সে জাহান্নামী।"

(পণ্য দ্রব্যের নকল, ভেজাল, মুদ্রা, সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট ও অন্যান্য দলীল জাল করা এবং ভিন্ন পেশার লোকের পোশাক পরে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক অসদুদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করাও প্রতারণা ও জালিয়াতীর অন্তর্ভুক্ত। -অনুবাদক)

৬৮. কৃপণতা, অপচয় ও অপব্যয় তথা অবৈধ ও বিশৃংখল ব্যয়

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ "তোমার হাত কাঁধের সাথে বেঁধে রেখনা এবং তা পুরোপুরিভাবে ছড়িয়েও দিওনা।" অর্থাৎ কৃপণতাও করোনা, অপচয় অপব্যয়ও করোনা। আল্লাহ আরো বলেন ঃ "অপব্যয় করোনা। অপব্যায়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাইল)

রাসূল (সা) বলেন ঃ "কৃপণ কখনো জান্নাতে যাবেনা।" আল্লাহ বলেন ঃ "যারা আল্লাহর দেয়া সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে না করে যে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য ভালো। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। যে জিনিস নিয়ে তারা কার্পণ্য করে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।" আল্লাহ আরো বলেন ঃ "যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ধার দেয়না তাদের জন্য ধ্বংস।" (সূরা মাউন)

এক কথায়, সম্পদ উপার্জনে যেমন শরীয়তের বিধান মেনে চলতে হবে, তেমনি তা ব্যয়েও শরীয়তের বিধান অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ও শরীয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রে ব্যয় না করা বা কম ব্যয় করা (কৃপণতা), প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা (অপব্যয়) এবং অর্থ নষ্ট করা (অপচয়) এ সবই অবৈধ ও বিশৃংখল ব্যয়ের আওতাভুক্ত এবং কবীরা গুনাহ। বিলাসিতাও এক ধরনের অপব্যয়।

৬৯. মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় শত্রুর নিকট ফাঁস করা

বিশিষ্ট সাহাবী বদরযোদ্ধা হাতিব ইবনে আবি বালতায়া মক্কায় অবস্থানরত নিজের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার খাতিরে রাসূল (সা) এর মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। সময়মত ওহীর মাধ্যমে এ বিষয়টি জানতে পেরে রাসূল (সা) ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়ায় তার চিঠি মক্কা পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। হযরত উমর এ ঘটনার নায়ক উক্ত সাহাবীকে মুনাফিক আখ্যায়িত করে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (সা) অনুমিত দেননি। তিনি হাতিবের ওযর ও ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে এ কাজটি যে অন্যায় ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র বদরযোদ্ধা হওয়ার কারণে তিনি ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। এমন কাজ অন্য কারো বেলায় ক্ষমার যোগ্য হবেনা।

৭০. কোন সাহাবীকে গালি দেয়া

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসে ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, "আল্লাহ বলেন ঃ (হাদীসে কুদসী) "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুসুলভ আচরণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছি। রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিওনা। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও সে কোন সাহাবীর সমান বা অর্ধেক মর্যাদারও অধিকারী হতে পারবেনা। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার তিরোধানের পর তাদেরকে গালি দেয়ার লক্ষ্য বানিওনা। তাদেরকে যে ভালোবাসবে, সে আমার ভালো বাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ভালোবাসবে। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। তাদেরকে যে কষ্ট দেবে, সে আমাকে কষ্ট দেবে। আর আমাকে যে কষ্ট দেবে, সে আল্লাহকে কষ্ট দেবে। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেবে, তাকে তিনি অচিরে পাকড়াও করবেন।" (জামে তিরমিযী)

সাহাবায়ে কেরামের গুরুত্ব ও মর্যাদার মূল কারণ এই যে, তারা রাসূল (সা) এর কাছে সরাসরি ঈমান এনেছেন, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, আর তাঁর সাথে জিহাদ এবং দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন। তাঁরাই এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ও

প্রথম প্রজন্ম। তাঁরা না থাকলে আমরা আল কুরআন, আল হাদীস ও শরীয়তের কিছুই পেতামনা। কাজেই তাদেরকে গালি দেয়া ও তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ স্বয়ং আল্লাহ, রাসূল ও দীনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার নামান্তর।

সকল সাহাবীর মধ্যে দশজন সাহাবী হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। এরা আশারায়ে মুবাশ্‌শারা। অর্থাৎ জীবিত থাকতেই তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আবার চার খলিফা শ্রেষ্ঠতম। তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা আমার নীতি আকড়ে ধর, আর আমার পর হেদায়াত প্রাপ্ত খলিফাগণের নীতি অনুসরণ কর। তাদেরকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ কর এবং নতুন উদ্ভাবিত শরীয়ত বহির্ভূত নীতি প্রত্যাখ্যান কর।"

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতভেদ হয়েছে। সে সব বিষয় নিয়ে কিছু সমস্যায় পড়তে হয় বটে। তবে এ ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করাই নিরাপদ। একান্তই যদি মতামত ব্যক্ত করা অপরিহার্য হয় তাহলে অধিকাংশ সাহাবীর মতের পক্ষে ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতির পক্ষে মত দিতে হবে। আর আল কুরআন ও সুন্নাহর মতকে সর্বোচ্চে স্থান দিতে হবে। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বী সাহাবীদের ব্যাপারে কোন বিরূপ মন্তব্য করা কখনো বৈধ হবেনা। তাদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা যাবেনা। সামগ্রিকভাবে তাদের সম্পর্কে আমাদের সেই আকীদাই পোষণ করতে হবে যা আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। সেটি হলো, "আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট।" সুতরাং তাঁরা উম্মাতের সকল মতভেদের উর্দ্ধে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এমনকি তাদের মধ্যে উষ্ট্র যুদ্ধ ও সিফফীন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই সন্দেহাতীতভাবে জান্নাতী। আমাদের তাদের কার্যকলাপ নিয়ে মাথা ঘামানোর পরিবর্তে নিজেদের পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামানো কর্তব্য।

উপসংহার

(অনুবাদকের সংযোজন)

মহান আল্লাহর দরবারে হাজারো শুকরিয়া জানাই যে, তিনি ইমাম যাহাবীর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল কাবায়ির" এর ন্যায় একটি অতি জরুরী ও মহোপকারী গ্রন্থের অনুবাদ করার তাওফীক এই অধমকে দান করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি যে সব "কবীরা গুনাহ" সংগ্রহ করেছেন, খুব সম্ভব তার প্রায় সব কটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল দলমত ও মাযহাবের নিকট সর্বসম্মতভাবে কবীরা গুনাহ। এ ধরনের সর্বসম্মত ও মৌলিক কবীরা গুনাহর তালিকা তৈরী করতে গিয়েই তাঁকে সম্ভবতঃ তালিকাটি ৭০ এর মধ্যে সীমিত রাখতে হয়েছে। নচেত এ তালিকা আরো দীর্ঘ হতে পারতো।

আলোচ্য ৭০টি ব্যতীত আরো কিছু কবীরা গুনাহ আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুতর বিবেচিত হওয়ায় অত্র উপসংহারে কুরআন ও হাদীসের সংক্ষিপ্ত দলীল প্রমাণ সহকারে তুলে ধরছি। আশা করি সর্ব শ্রেণীর পাঠক এ দ্বারা উপকৃত হবেন।

আরো ৩৫টি গুরুতর কবীরা গুনাহ

১। ইসলামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তথা গুলু ফিদ্দীন ও ইকরাহ ফিদ্দীন'

ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা অমূলক জোর জবরদস্তিকে ইসলামী পরিভাষায় 'গুলু ফিদ্দীন' বা 'ইকরাহ ফিদ্দীন' বলা হয়। এটি সর্বসম্মতভাবে হারাম ও কবীরা গুনাহ। মূল আল কুরআন ও হাদীসে যে জিনিসকে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়াকেই বাড়াবাড়ি বলা যায়। যেমন কোন নফল বা মুস্তাহাব কাজকে ফরয বা ওয়াজিবের ন্যায় বাধ্যতামূল মনে করতঃ অন্যদেরকে তা পালনে বাধ্য করা, জোরজবরদস্তি করা ও পালন না করলে শাস্তি দেয়া বা তিরস্কার করা বাড়াবাড়ির শামিল। অনুরূপভাবে মাকরূহকে হারাম গণ্য করতঃ অন্যদেরকে তা বর্জন করতে বাধ্য করাও বাড়াবাড়ির পর্যায়ভুক্ত।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে বাধা দান, তাদের ধর্মীয় সামাজিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, তাদের দেবদেবীকে গালি দেয়া বা তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করাও বাড়াবাড়ির পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "হে আহলে কিতাব! তোমরা ধর্মে বাড়াবাড়ি

করোনা।" (সূরা আল মায়েদা) তিনি আরো বলেছেন ঃ "ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই।" (সূরা আল বাকারা) অন্যত্র বলেছেন ঃ "হে মুমিনগণ! যে সব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তাকে হারাম করোনা এবং সীমা অতিক্রম করোনা। আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পসন্দ করেন না।" (সূরা আল মায়েদা) অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করে তাদেরকে গালি দিওনা। তাহলে মূর্খতাবশতঃ তারাও আল্লাহকে গালি দেবে।" (সূরা আল আনয়াম) রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি শান্তিপ্রিয় অমুসলিম নাগরিকের ক্ষতি সাধন করবে, কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবো।"

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, নিজে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সকল ফরয আদায় করার পর বেশী করে নফল ইবাদাত করা ও অন্যদেরকে উপদেশ দিয়ে তা করতে আগ্রহী করে তোলা দোষণীয় নয়। অনুরূপভাবে, অমুসলিমদের কাছে ইসলাম প্রচার করায় তার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়না। আর ফরয ও ওয়াজিব তরককারী ও হারাম কাজ করতে অভ্যস্ত মুসলমানকে ফরয ও ওয়াজিব পালনে ও হারাম কাজ বর্জনে বাধ্য করা বাড়াবাড়ি নয়। তবে শরীয়ত সম্মত ও আইনানুগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কারো এরূপ বলপ্রয়োগের অধিকার নেই। বস্তুতঃ বলপ্রয়োগ ও বাড়াবাড়ি দ্বারা প্রকৃত পক্ষে মানুষের মনকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন লাভ হয়না।

২। ইসলামের ব্যাপারে শৈথিল্য ও সীমাতিরিক্ত নমনীয়তা

এটি প্রথমোক্ত বাড়াবাড়ির ঠিক বিপরীত। ইসলামী পরিভাষায় একে "মুদাহানাত্ ফিদ্দীন" বলা হয়। বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত খোদাদ্রোহী শক্তির মানসিক গোলামীর কারণে এক শ্রেণীর দুর্বল মুসলমান এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই রোগের আলামত বা লক্ষণ তিনটি ঃ (১) ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাকে নফল বা মুস্তাহাবের ন্যায় ইচ্ছাধীন মনে করা ও পালনে গড়িমসি করা এবং হারাম কাজকে মাকরূহ বা মুবাহের ন্যায় বিবেচনা করা, আর তা বর্জনে শৈথিল্য প্রদর্শন করা। (২) প্রকাশ্য পাপাচার ও কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে এবং মুনাফিকদের সাথে আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করা ও সহযোগিতা করা। (৩) অমুসলিমদের সাথে আন্তরিক প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ "যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, তাদেরকে তুমি কখনো আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য লোকদের সাথে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতে দেখবেনা, যদিও ঐ অবাধ্য লোকেরা তাদের পিতামাতা, সন্তান-সন্তুতি, কিংবা আত্মীয়স্বজন হয়।" (সূরা মুজাদালা)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব।"

আল্লাহ্ বলেন ঃ "সেই সকল মুনাফিককে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও, যারা মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে।" (সূরা আন নিসা)

আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করোনা। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তা করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।"

অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন এবং তাদের চালচলন, রীতিনীতি ও আইনকানুন অনুসরণ করাও হারাম। (প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লোক দেখানো বন্ধুত্ব করা দোষের নয়।)

৩। বিদয়াতে লিপ্ত হওয়া

ইসলাম বহির্ভূত কোন আকীদা বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, আইনকানুন প্রভৃতিকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত মনে করা, অনুসরণ করা, চালু করা ও সওয়াবের কাজ মনে করা বিদয়াত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইসলামের ভেতরে কোন নতুন জিনিস সংযোজন করবে, সে প্রত্যাখ্যাত হবে।"

আল্লাহ্ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান অনুসারে ফায়সালা করেনা সে কাফের সে যালেম . . . সে ফাসেক।" (সূরা আল মায়েদা)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "বিদয়াতকারীর তওবা ও দোয়া বিদয়াত ত্যাগ না করা পর্যন্ত কবুল হয়না।"

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণার্থে যুগোপযোগী কোন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করা বিদয়াত নয়, যেমন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া, আধুনিক অস্ত্র ও কৌশল প্রয়োগে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, বিনা অস্ত্রে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক যুদ্ধ করা ইত্যাদি। তবে এরূপ ক্ষেত্রে শরীয়তের মূল নীতির অনুসরণ করা জরুরী।

৪। গীবত

গীবত একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ্। পবিত্র আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "তোমরা পরস্পরের গীবত (অসাক্ষাতে নিন্দা সমালোচনা) করোনা। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাই-এর গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করবে! নিশ্চয়ই তোমরা এটা অপছন্দ করবে।" (সূরা আল হুজুরাত)

এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমরা কি জান, গীবত কি? সাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার মুসলমান ভাই এর অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে পছন্দ করেনা। সাহাবীগণ বললেন ঃ হে রাসূল, আমি যা বলি তা যদি ঐ ভাই এর মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান থাকে তাহলেও? রাসূল (সা) বললেন ঃ হাঁ, যা তার মধ্যে আছে তা বললে তুমি গীবত করলে। আর যা নেই তা বললে তুমি অপবাদ আরোপ করলো (যা আরো বড় গুনাহ)।

অপর হাদীসে আছে ঃ হযরত আয়িশাহ (রা) হযরত সাফিয়ার অপেক্ষাকৃত বেঁটে আকৃতির প্রতি ইংগিত করলে রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ "তুমি যা বললে তা সমুদ্রে মিশিয়ে দিলে তার সেই রাশি রাশি পানিও কলুষিত হয়ে যেত।"

তবে ছয়টি ক্ষেত্রে গীবত বৈধ। যথা ঃ (১) মযলুম কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা, (২) অব্যাহতভাবে কবীরা গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তি যাতে গোটা সমাজকে খারাপ কাজে জড়িত করে ফেলতে না পারে, সে জন্য জনমত গঠন করতঃ অপরাপর প্রতিরোধের পরিবেশ সৃষ্টি করা, (৩) মুফতীর নিকট ফতোয়া চাওয়ার সময় ঘটনার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে কারো দোষ বলা, (৪) সাধারণ মুসলমানদেরকে কোন ছদ্মবেশী ক্ষতিকর লোকের কবল থেকে রক্ষা করা যথা ভন্ডপীর, অযোগ্য ও ফাসেক আলেম বা ইমাম, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী, বিয়ে, শরীকী ব্যবসা বা অন্য কোন ব্যাপারে কাউকে ক্ষতিকর লোকের হাত থেকে বাঁচার জন্য পরামর্শ দান এবং অসৎ ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি ভোট পেয়ে যাতে নির্বাচিত হতে না পারে, সে জন্য তার অপকর্মের ফিরিস্তি প্রকাশ করা, (৫) ক্ষমতাসীন অত্যাচারী শাসকের পতন ঘটানোর জন্য জনমত গঠন করা, (৬) কারো অনিচ্ছাকৃত দোষক্রটি যদি তার পরিচয়ের অংশ হয়ে যায়, যেমন অন্ধ, খোঁড়া, বধির ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে দোষক্রটি আলোচনা করলে গীবত হবেনা

৫। মুসলমানদের মতামত গ্রহণ ও পরামর্শ ছাড়া জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল করা ও শাসন পরিচালনা করা, কারচুপি ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা, নিজে পদপ্রার্থী হওয়া, পদপ্রার্থীকে নিয়োগ দান

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ছয় ব্যক্তিকে আমি অভিশাপ দিয়েছি, আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন এবং প্রত্যেক নবী অভিশাপ দিয়েছেন। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবে

নতুন কিছু সংযোজন করে, (২) যে ব্যক্তি অদৃষ্টকে অস্বীকার করে, (৩) যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ওপর জোরপূর্বক ক্ষমতাসীন হয় এবং আল্লাহ্ যাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাদেরকে অপদস্ত করে, আর যাদেরকে আল্লাহ্ অপমানিত করেছেন তাদেরকে সম্মানিত করে, (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত জিনিসকে বৈধ গণ্য করে, (৫) যে ব্যক্তি আমার বংশধরকে অপমানিত করে এবং (৬) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে বর্জন করে। (তাবরানী)
রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থী হয়, সে ঐ পদের অযোগ্য।"
আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ "তুমি শাসন কার্যে মুসলমানদের সাথে পরামর্শ কর।" (সূরা আলে ইমরান)

৬। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎ কাজের আদেশ না দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ না করা বা বাধা না দেয়া, সৎ কাজে সহযোগিতা না করা বা বাধা দেয়া, অসৎ কাজে সহযোগিতা করা বা অত্যাচারীকে সমর্থন করা

সূরা আল মায়েদায় আল্লাহ্ বলেন ঃ "বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইবন মারিয়ামের মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর কারণ, এই যে, তারা নাফরমানী করতো, সীমা অতিক্রম করতো এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতোনা।"
সূরা আল মায়েদার অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ "সৎ কাজ ও খোদাভীরুতায় সহযোগিতা কর, গুনাহ ও বাড়াবাড়িতে সহযোগিতা করোনা।"
রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি ঃ তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, নচেত অচিরেই তোমাদের সকলের ওপর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা দোয়া করলেও তা কবুল হবেনা।" (তিরমিযী)
রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "লোকেরা যখন কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখে কিন্তু বাধা দেয়না। তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর সর্বব্যাপী আযাব নাযিল করেন।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)
রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ কোন খারাপ কাজ হতে দেখলে তাকে শক্তি দিয়ে বাধা দেয়া উচিত, তা না পারলে মুখ দিয়ে নিষেধ করা উচিত, তা না পারলে মনে মনে তা প্রতিরোধের চিন্তা করা বা ঘৃণা করা উচিত। আর এই শেষের পন্থাটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"

৭। নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া

রাসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারো নামাযের সামনে দিয়ে যায়, সে যদি জানতো এর কী পরিণাম, তাহলে সে সামনে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে চল্লিশ দিন দাঁড়িয়ে থাকা অগ্রগণ্য মনে করতো।"

৮। পরিবেশকে নোংরা ও দূষিত করা

হযরত জাবির (রা) বলেন যে, "রাসূল (সা) বদ্ধ জলাশয়ে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "মানুষের চলাচলের পথে ও গাছের ছায়ার নিচে, বিশেষতঃ ফলবান গাছের নিচে যে ব্যক্তি পেশাব পায়খানা করে, তার সম্পর্কে সাবধান থাকো।"

৯। ইসলামী হুদুদ বা দন্ডবিধি প্রয়োগের বিরুদ্ধে তদবীর, সুপারিশ বা অন্য কোন পন্থায় বাধা দান ও দন্ডবিধি প্রয়োগে বৈষম্য করা

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী যে মহিলা চুরি করে ধরা পড়েছিল, কুরাইশরা তার (হাত কাটার) ব্যাপারটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, এ ব্যাপারে রাসূল (সা) এর কাছে সুপারিশ করতে কাকে পাঠানো যায়? সবাই বললো, রাসূলের প্রিয়তম ব্যক্তি উসামা বিন যায়েদ ছাড়া আর কাউকে দিয়ে কাজ হবেনা। অগত্যা উসামা সুপারিশ করতে গেল। রাসূল (সা) বললেন ঃ "তুমি আল্লাহর নির্দ্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছ?" অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে শুরু করলেন। বললেন ঃ "তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, কোন অভিজাত ব্যক্তি অপরাধ করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর কোন দুর্বল লোক অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম, আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি তার হাতও কেটে দিতাম। অতঃপর উক্ত মহিলার হাত কেটে দেয়া হলো।" (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

১০। কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ বা সম্পর্ক ছিন্ন রাখা

আবু আইয়ুব আনসারী বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান ভাই-এর সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম। তবে দুই জনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দিয়ে সম্পর্ক পুনর্বহাল করবে, সেই ব্যক্তিই উত্তম।" (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

১১। আমীরের অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী নেতার আনুগত্য না করা ও কোন ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করা

আল্লাহ বলেন ঃ "হে মুমিনগণ, আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার নেতার আনুগত্য কর।" (সূরা আন নিসা)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নেতার আদেশ - তা পছন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ কোন গুনাহর কাজের আদেশ না হয়, ততক্ষণ মেনে চলা। গুনাহর কাজের আদেশ দেয়া হলে তা মানা যাবেনা।" (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে মারা যাবে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।"

উল্লেখ্য যে, রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় ইসলামী জামায়াত মাত্র একটাই ছিল, যার নেতা স্বয়ং রাসূল (সা) ছিলেন। পরবর্তীকালে ৪টি বৈশিষ্টের অধিকারী যে কোন সংগঠন ইসলামী জামায়াত বলে গণ্য হবে ঃ

(১) আল কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
(২) আল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে স্পষ্ট কোন হেদায়াত পাওয়া যায় না এমন ক্ষেত্রে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ চলবে।
(৩) দলের লক্ষ্য হবে দেশে পূর্ণাংগ ইসলাম প্রতিষ্ঠা।
(৪) দলে নেতা ও কর্মীদের পারস্পরিক সমালোচনার ব্যবস্থা থাকবে।

উল্লেখ্য যে, সরকারের যে সব আদেশ ও আইন শরীয়ত বিরোধী নয়, তাও অমান্য করা জায়েজ নেই।

১২। গান, বাজনা ও নাচ

মিহি ও করুণ সুরের যাবতীয় বাজনা বাজানো ও শোনা হারাম ও কবীরা গুনাহ। গান যদি নিষিদ্ধ কাজে উদ্বুদ্ধকারী বক্তব্য সম্বলিত হয়, নারী কণ্ঠে গাওয়া হয় এবং নিষিদ্ধ বাদ্য সহকারে গাওয়া হয় তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। পবিত্র আল কুরআনের সূরা লুকমানে যে 'লাহওয়ালহাদীস' এর নিন্দা করা হয়েছে, সে প্রসংগে হযরত ইবনে মাসউদ জোর দিয়ে বলেছেন যে, তার অর্থ গান। রাসূল (সা) বলেছেন, গায়ক-গায়িকাদের উপার্জিত অর্থ হালাল নয়। (তিরমিযী) একই কারণে অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজে তথা ব্যভিচারে প্ররোচিত করে বিধায় নৃত্যও হারাম। এ সব অনুষ্ঠান দেখা, শুনা ও আয়োজন করা কবীরা গুনাহ।

অনুরূপভাবে অশ্লীল ও হারাম কাজে উদ্বুদ্ধকারী গল্পগুজব, নাটক উপন্যাস ও খেলাধুলা ইত্যাদিও হারাম। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য দুনিয়ায় এসেছি।

উল্লেখ্য যে, অশ্লীল বিষয়সম্বলিত নয়, এমন গান পুরুষকণ্ঠে বাদ্য ছাড়া গাওয়া হলে গুনাহ হবেনা।

১৩। পর্দার বিধান লংঘন ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ছতর তথা শরীরের আবরণীয় অংশ উন্মোচন করা

সমাজ থেকে ব্যভিচারের সম্ভাবনা দূর করার জন্য ইসলামে পর্দার বিধান নাযিল করা হয়েছে এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই বিধান লংঘন করা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাজাত করে। . . . মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন দৃষ্টি সংযত রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং তাদের রূপসৌন্দর্য ভিন্ন পুরুষের সামনে প্রকাশ না করে।"

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন পরস্ত্রীর প্রতি কু-দৃষ্টি দেবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সীসা ঢালা হবে।"
রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "কোন বেগানা পুরুষ ও স্ত্রী নিভৃতে সাক্ষাত করলে সেখানে শয়তান হয় তাদের তৃতীয় সংগী।"
আল্লাহ বলেন ঃ "যারা মুমিনের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো পছন্দ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"
সুতরাং পর্দা লংঘনে প্ররোচনাকারী ও অশ্লীলতার বিস্তার সহায়ক যে কোন কাজ, কথা, লেখা, ছবি, নাটক, উপন্যাস বা সিনেমা সবই হারাম ও কবিরা গুনাহ।

১৪। খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশী গোলাজাত করে রাখা ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে খুশী হওয়া

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশী গোলাজাত করে রাখবে, সে উক্ত খাদ্য সদকা করে দিলেও তার গোলাজাত করার গুনাহ মাফ হবেনা।"
তবে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ মুকাবিলার জন্য সরকারী উদ্যোগে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য মওজুদ করা জায়েয।

১৫। পাওনা পরিশোধে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও গড়িমসি করা ও পাওনাদারকে হয়রানী করা বা মজুরী না দেয়া

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "ধনী ব্যক্তি কর্তৃক পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করা যুলুমের শামিল।" (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "শ্রমিকের মজুরী তার ঘাম শুকাবার আগে পরিশোধ করে দাও।"

১৬। হিংসা করা ও মানুষের অকল্যাণ কামনা করা

কারো ইহকালীন বা পরকালীন, বৈষয়িক বা নৈতিক - যে কোন ধরনের সম্পদের ধ্বংস বা ক্ষয়ক্ষতি কামনা করা, এবং তার উন্নতি ও সুখসমৃদ্ধিতে কষ্ট পাওয়ার নামই হিংসা।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা আগুন যেভাবে শুকনো কাঠকে জ্বালিয়ে দেয়, হিংসা ঠিক সেভাবে কৃত সৎকাজকে ধ্বংস করে দেয়।"

১৭। মুসলমানদের মধ্যে ভাষা, বর্ণ, বংশ ও আঞ্চলিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদ, বৈষম্য ও অনৈক্য সৃষ্টি করা, একে অপরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, বিদ্রুপ করা ও তিরস্কার করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "হে মুমিনগণ, তোমাদের এক গোষ্ঠী কর্তৃক অপর গোষ্ঠীকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা উচিত নয়। তারা অচিরেই তাদের চেয়ে ভালো হয়ে যেতে পারে। . . . একে অপরকে তিরস্কার করোনা এবং খারাপ উপাধিতে ভূষিত করোনা। ঈমানের পর গালিগালাজ ভীষণ গুনাহ।"

আল্লাহ আরো বলেন ঃ "তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর এবং ছিন্নভিন্ন হয়োনা।" (আলে ইমরান)

রাসূল (সা) বলেন ঃ "এক ব্যক্তি বলেছিল, আল্লাহর কসম আল্লাহ অমুককে কখনো মাফ করবেন না। তখন আল্লাহ বললেন, আমি ক্ষমা করবোনা এ কথা বলার তুমি কে? আমি তাকে ক্ষমা করেছি এবং তোমার সৎ কাজ বাতিল করে দিয়েছি।" (সহীহ মুসলিম)

১৮। কোন মুসলমানের বিপদে খুশী হওয়া

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমার মুসলমান ভাই-এর বিপদে খুশী হয়োনা। তাহলে আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত করবেন এবং তোমাকে বিপদে আক্রান্ত করবেন। (তিরমিযী)

১৯। শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং বড়দের সাথে বেয়াদবী করা

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করেনা ও বড়দেরকে সম্মান করেনা, সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।"

তবে নামায ও সদাচার শেখানোর জন্য ছোটদেরকে শাসন করা অবশ্য কর্তব্য।

২০। বিনা ওযরে ভিক্ষা করা, পরের সেবা ও সাহায্য চাওয়া, পরের মুখাপেক্ষী হওয়া ও ঋণ করা

হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেন, আমি তিনবার রাসূল (সা) এর কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। প্রতিবারই তিনি সাহায্য দিলেন এবং বললেন ঃ "হে হাকীম, শোন! এই সকল সম্পদ খুবই লোভনীয় ও মজাদার। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তার জন্য কল্যাণকর নয়। মনে রেখ, ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার পর আমি আর কারো কাছে কিছু চাইবনা। অতঃপর হযরত আবু বকর ও উমর তাকে সাহায্য করতে চাইলেও হাকীম তা গ্রহণ করেননি।" (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন তার মুখে গোশ্‌ত থাকবেনা।

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ আল্লাহ যাকে দুনিয়াতে আযাবে নিক্ষেপ করতে চান, তাকে ঋণগ্রস্ত করেন।

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিশ্চয়তা দেবে যে সে কোন মানুষের কাছে কিছু চাইবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।" (আবু দাউদ)

২১। কাউকে তার পূর্বে কৃত গুনাহ লোক সমক্ষে ফাঁস করে দিয়ে লজ্জা দেয়া এবং বিনা অনুমতিতে কারো গোপনীয়তা ফাঁস করা

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে তার এমন কোন গুনাহ ফাঁস করে লজ্জা দেবে যা সে পরিত্যাগ ও তওবা করেছে। সেই ব্যক্তি ঐ গুনাহে লিপ্ত না হয়ে মৃত্যু বরণ করবেনা।"

২২। কোন মুসলমান সম্পর্কে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ করা

আল্লাহ বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! বেশী ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা কিছু কিছু ধারণা পোষণ গুনাহ।" (সূরা আল হুজরাত)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার।" (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "মুমিনদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ কর।"

উল্লেখ্য যে, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন খারাপ ধারণা পোষণই অবৈধ। কোন সংগত

কারণে স্বতস্ফূর্তভাবে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হলে তাতে গুনাহ হবেনা। কিন্তু বিনা প্রমাণে তার ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ নেয়া জায়েজ নয়।

২৩। মসজিদের অবমাননা

মসজিদকে সাধারণ ভবনে পরিণত করা, থুথু ফেলা ও অপবিত্র করা, বেচাকেনা ও হারানো জিনিসের বিজ্ঞাপন দেয়া, উচ্চৈস্বরে কথা বলা ও ঝগড়া করা, মসজিদে ইসলামী কার্যকলাপ চালাতে বাধা দেয়া, মসজিদকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা এবং কাফের বা ফাসেক লোককে মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা। আল্লাহ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণে বাধা দেয় এবং মসজিদকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, তার চেয়ে যালিম আর কে?" (সূরা আল বাকারাহ)

আমর ইবনে শা'ব বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) মসজিদে বেচাকেনা ও হারানো জিনিসের বিজ্ঞাপন দিতে নিষেধ করেছেন।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (কাঁচা) পেয়াজ বা রসুন খাবে, সে যেন মসজিদের কাছেও না আসে।

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ এবং তার কাফফারা হলো তা সরিয়ে ফেলা।

তবে মসজিদে শিক্ষাদান, বিচার অনুষ্ঠান পরামর্শ করা ও আলাপ আলোচনা দোষণীয় নয়। ঋতুবতী মহিলা এবং গোছল করা ফরয বা ওয়াজিব এমন অপবিত্র পুরুষের মসজিদে প্রবেশ করা অবৈধ।

২৪। অজানা বিষয়ে কথা বলা, গুজব রটানো, বিনা তদন্তে গুজবে বিশ্বাস করা ও জানা বিষয় গোপন করা

আল্লাহ বলেন ঃ "তুমি যা জাননা তার অনুসরণ করোনা।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য সে যা শোনে তাই প্রচার করে বেড়ানোই যথেষ্ট।" (সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি জনগণের প্রয়োজনীয় কোন জ্ঞান রাখে অথচ তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

২৫। পরিবারের প্রতি শরীয়তসম্মত আচরণ না করা, সুবিচার না করা এবং বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান অমান্য করা

একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রত্যেকের প্রতি সমান আচরণ না করা, সবার প্রতি সুবিচার করতে পারবে কিনা নিশ্চিত না হয়ে একাধিক বিয়ে করা, স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দেয়া, ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেয়া, ইদ্দতকালে বাড়ী থেকে বের করে

দেয়া। স্ত্রীকে ঝুলন্ত রেখে দেয়া অর্থাৎ তালাকও না দেয়া এবং স্বাভাবিক সম্পর্কও না রাখা, সন্তানদের কাউকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা কমবেশী দেয়া, জীবিতবস্থায় সন্তানদের প্রতি লেনদেনে বৈষম্য করা বিশেষতঃ মেয়েদের প্রতি, স্ত্রীকে যৌতুক এনে দেয়ার জন্য চাপ দেয়া, স্ত্রীকে মোহরানা না দেয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েকে বিনা ওযরে বিয়ে না দেয়া, বিনা ওযরে চিরকুমার থাকা। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ বিয়ে আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অবজ্ঞা করবে সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট ভালো, সে আল্লাহর নিকটও ভালো।"

২৬। জেনেশুনে কোন পাপিষ্ঠ ও ইসলামবিরোধী ব্যক্তির সংসর্গে বাস করা, তাকে ভোট দেয়া, প্রশংসা করা ও আনুগত্য করা, সততা ছাড়া অন্য কিছুকে নেতৃত্বের মাপকাঠি মেনে নেয়া

আল্লাহ বলেন ঃ "যাকে আমি আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি ও যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসারী, তার আনুগত্য করোনা।" (সূরা আল কাহাফ)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন ফাসিকের যখন প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং আরশ কেঁপে উঠে।"

আল্লাহ বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাধিক খোদাভীরু, সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত।"

২৭। ইসলামের তথা আল কুরআন ও হাদীসের অত্যাবশ্যকীয় ও ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন না করা

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর ওপর ফরয।"

২৮। নিষিদ্ধ সময়ে ও নিষিদ্ধ অবস্থায় ইবাদাত করা

দুই ঈদ, ও আইয়ামে তাশরীকে (১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জ) রোযা রাখা, ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়া, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া, পায়খানা ও পেশাবখানায় থাকা অবস্থায় ও মলমূত্র ত্যাগ করার সময়ে কোরআন পাঠ করা বা দোয়া পাঠ ও জিকির করা ইত্যাদি। বহু সংখ্যক হাদীসে এ কাজগুলিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২৯। স্বাস্থ্যগত কারণ ও প্রবল জীবনাশংকা ব্যতীত নিছক অভাবের ভয়ে ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত, বন্ধ্যাকরণ প্রভৃতি উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা

আল্লাহ বলেন ঃ "অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যাকরোনা।" (বনী ইসরাইল)

৩০। বিনা ওযরে জুময়ার নামায না পড়া ও জুময়ার নিয়ম লংঘন করা

ইমামের খুতবা দেয়ার সময় কথাবলা, নামায পড়া বা দোয়াদরুদ পড়া, মসজিদে বিলম্বে এসে যারা আগে এসেছে তাদেরকে ডিংগিয়ে আগে যাওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! জুময়ার দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর স্মরণের জন্য দ্রুত চলে যাও এবং কাজ কারবার বন্ধ কর।" (সূরা জুময়া)

রসূল (সা) বলেছেন ঃ "ইমাম মিম্বরে আরোহণ করার পর কোন নামায বা কথাবার্তা বলবেনা।"

৩১। কোরআন ও হাদীসের অবমাননা, অবজ্ঞা ও অবহেলা করা, না জেনে অপব্যাখ্যা করা, অপবিত্রাবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা, কোরআন তেলাওয়াতের সময় শ্রবণ না করা, বা শ্রবণ করতে বাধা দেয়া, কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান গোপন করা তথা বিতরণে বিনা ওযরে বিরত থাকা, বা বাধা দেয়া, বিশুদ্ধ হাদীস অস্বীকার ও অমান্য করা, ইসলাম বিরোধী কাজ বিস্‌মিল্লাহ্ বা কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা শুরু করা ইত্যাদি

আল্লাহ্ বলেন ঃ "যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তা শ্রবণ কর ও নীরব থাক। হয়তো তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করা হবে।" (আরাফ)

"আমার আয়াত তেলাওয়াত করা হলে কাফেরদের মুখে তুমি বিরক্তির চিহ্ন দেখতে পাবে।" (সূরা হাজ্জ)

৩২। সমাজে ফেতনা তথা গোমরাহী ছড়ানো, মানুষ সৎ কাজে নিরুৎসাহিত হয় বা বাধা পায় এবং অসৎকাজে প্ররোচিত বা বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা

আল্লাহ্ বলেন : "সেইসব যালেমের ওপর আল্লাহর অভিশাপ, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" (সূরা আরাফ)

৩৩। বিনা ওযরে ফেৎরা না দেয়া ও কোরবানী না করা

রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে কোরবানী দেয় না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।"

৩৪। বিনা ওযরে সালামের জবাব না দেয়া ও কোন কাফেরকে প্রথম সালাম করা

আল্লাহ্ বলেন ঃ "যখন তোমাদেরকে কেউ দোয়া করে, তখন তার চেয়ে উত্তম দোয়া কর অথবা তদ্রুপ দোয়া কর।" (সূরা নিছা) সালামও একটি দোয়া। তাই এর জবাব দেয়া জরুরী।

৩৫। উপযুক্ত পুরুষ থাকতে কোন নারীর হাতে পুরুষদের অথবা নারী ও পুরুষ উভয়ের নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার অর্পণ করা

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যখন নারীর হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ করা হবে তখন তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই উত্তম হবে।"

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।" (সূরা নিসা)

কবীরা গুনাহ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ্ সকল গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

বস্তুতঃ একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে সকল গুনাহ্ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। তবে এ জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে ঃ

(১) আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া, (২) ভবিষ্যতে আর ঐ গুনাহ্ না করার ওয়াদা করা, (৩) অবিলম্বে উক্ত গুনাহ্ একেবারেই ত্যাগ করা, (৪) গুনাহর সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দান। এই চারটি শর্ত পালন পূর্বক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।